মানুষের রঙ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা ছোটোগল্পের সংকলন

বিরাম মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড
বাইশ স্ট্র্যাণ্ড রোড। কলকাতা-এক

প্রথম প্রকাশ

শ্রাবণ ১৩৬৯, জুলাই ১৯৬২

প্রকাশক

শ্রী রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড

২২ স্ট্র্যাণ্ড রোড

কলকাতা ১

মুদ্রক

শ্রী গোপালচন্দ্র রায়

নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদশিল্পী

শ্রী পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম

ছয় টাকা পঞ্চাশ নয় পয়সা

ভূমিকা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে দুটি বিভাগ স্ব-উপার্জনে সক্ষম ও সচ্ছল তা হ'লো কবিতা ও ছোটোগল্প। উৎকর্ষের যাচাইয়ে অন্তত এই দুটি বিভাগ যে বর্তমান বিদেশী সাহিত্যের আসরে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য, একথা গর্বের সঙ্গেই উচ্চারণ করা যায়।

মাথা-গুন্‌তিতে কবিতা-প্রেমিকের সংখ্যা সব দেশেই সব যুগেই কাহিনী-লোভীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু বালক-বৃদ্ধ পুরুষ-নারী নির্বিশেষে কাহিনীলোভী ক্ষুধার্তরা দলে-দলে ছড়িয়ে আছে মনুষ্য-সংসারের সর্বত্র। আর, যেহেতু, এই ক্ষুধা মেটাবার পক্ষে কথাসাহিত্যই অনিঃশেষ অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার, সেই হেতু অসংখ্যের আগ্রহ-ঔৎসুক্যের উপর তার অফুরন্ত আধিপত্য, এবং সে-কারণেই হয়তো সহজ সফলতার সমৃদ্ধি। কবিতার মতো বাংলা ছোটোগল্পের ভাণ্ডারও সবিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছে সেই সর্বগ্রাসী-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের হাতে। এই শিল্প-শিশুর জনক যিনি, তিনিই অভ্রান্ত পথনির্দেশে সর্বগুণান্বিত সাবালকত্বে পৌঁছে দিয়েছেন তাকে। বাংলা ছোটোগল্পের ইদানীন্তন পরিণতি রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল ঐশ্বর্যময় উত্তরাধিকার।

'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' প্রভৃতি প্রথম পর্যায়ের গল্পের রচয়িতা এবং 'দুরাশা', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতির শিল্পস্রষ্টা যে একই রবীন্দ্রনাথ নন, সময়ের ব্যবধানে শিল্পী-মানসের ক্রম-বিবর্তন তা সহজেই বুঝিয়ে দেয়। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের জগৎ ততদিনে ব্যাপ্তি পেয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যক্ষতায়, মানব-সম্পর্কের বৃহত্তর পরিধিতে। মোহিনী পদ্মা, শিলাইদহের আকাশ-প্রান্তর ও পল্লী-প্রতিবেশের শান্ত সবুজ রেখাচিত্রের পাশাপাশি চণ্ডীমণ্ডপ-শাসিত সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন করুণার পাত্র-পাত্রীদের প্রতিকারহীন দৈনন্দিনতার অন্তরালে ধনধান্যেপুষ্পেভরা কোনো বসুন্ধরার অস্তিত্ব আবিষ্কার না ক'রেও সেই আবিল তীর্থসলিলে অবগাহন করেছেন সংবেদনশীল রবীন্দ্রনাথ। এই সময় ও সমাজের মর্মস্থল থেকে মানবতার যে ভাষা ও শিল্পসংকেত উদ্ধার করলেন তিনি, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের আরও জটিল আরও ধারালো সমস্যা-জিজ্ঞাসায় দ্রুত তার চেহারা পালটাতে লাগলো।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে নির্ভরতা ও নিরাপত্তার আশ্বাস একটু-একটু ক'রে যখন

প্রায় শূন্যে বিলীন, সেই তিরিশের যুগে পরাধীন দেশের নিগৃহীত সত্তা যেন কোনো অন্তিম তাগিদে স্পষ্টতর মীমাংসার মুখাপেক্ষী হ'য়ে অস্থির দিন গুনছে। শহর ও শহরতলিতে তখন শিল্প-বাণিজ্যের বিশ্বকর্মা কিছুটা ব্যস্ত-তৎপর, শতচ্ছিন্ন ময়লা কাঁথার নিচে পাড়াগাঁ-ও আর ঘুমিয়ে নেই। কিন্তু কোথায়, কার মধ্যস্থতায় সেই মীমাংসা? কবি, সাহিত্যিকের হাতে কি কোনো উপশম আছে?

তিরিশের যুগের প্রারম্ভে পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এক নিদারুণ আর্থিক মন্দা শুরু হয়েছিলো এবং তার প্রচণ্ড ঢেউ ভারতের অর্থনৈতিক সংকট ও বেকারসমস্যাকে আরও তীব্রভাবে অসহনীয় ক'রে তুললো। এবং এই আবর্তময় পটভূমিতে গান্ধীজীর দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে দেশব্যাপী একটি সর্বাত্মক বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়েছে। কী শহরে, কী মফস্বলে, কী গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্রই জনচিত্তে অনিশ্চয়তার অধীর উদ্বেগ। আর এই অনিশ্চয়তা ও অসহনীয়তার অভিঘাতে অনিবার্য ভাবেই বাংলা সাহিত্যে গভীর নৈরাশ্যবোধের আর্তি ধ্বনিত হ'লো।

বিপর্যয়ের মধ্যেও অভ্রষ্ট অক্ষুণ্ণ রইলো স্থিতপ্রজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সংযম। সমূহ ক্ষতি ও বিনাশের আসন্নতায় দেশ-কাল-নিরপেক্ষ মানুষের সার্বিক বিকাশ ও কল্যাণবুদ্ধির উপর তখনো অটুট আস্থাশীল তিনি। কিন্তু তাঁর পরবর্তী নবীন সাহিত্যিকরা ধ্বংসোন্মুখ সমাজের যাবতীয় অভিজ্ঞতার নিরুপায় অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ সম্পর্কে সন্দিহান হ'য়ে উঠেছেন। ক্ষীণতম মোহ যখন আর অবশিষ্ট রইলো না, শক্তিমান এই-সব নবীনদের কাব্যে, কথাসাহিত্যে পুরনো চিন্তাধারার প্রতিবিম্ব মুছে ফেলে ভাঙনের কোরাস বেজে উঠেছে উচ্চকিত স্বরে।

কিন্তু সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বোধহয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাতেই, রবীন্দ্রনাথের চিরসহনশীলতায় বহ্নিমান বিস্ববিয়সের যে যুগসঞ্চিত বিক্ষোভ ঘুমিয়ে ছিলো তা অগ্নিঅক্ষরে উদ্‌গীর্ণ হ'লো মিস র‍্যাথ্‌বোন-এর উক্তির সমুচিত উত্তরে, 'সভ্যতার সংকট' ইত্যাদি মননশীল রচনায়। আর, আশ্চর্য, এই মননশীলতার শেষ স্বর্ণরশ্মি বিচ্ছুরিত হ'লো তাঁর 'ল্যাবরেটরি' গল্পে। বাংলা ছোটোগল্পের এই দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ এক অদ্বিতীয় দীপ্তিতে যুগসন্ধির সাহিত্যকে চিরস্মরণীয়ের মহিমা দিয়ে গেলেন।

সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপসংহার এবং তার

শ্মশানধূমে আচ্ছন্ন স্বাধীন ভারতের চেহারা দেখতে হয়নি রবীন্দ্রনাথকে। উপনিষদের অমৃত পরিবেশন করেছেন যিনি, কাজ নেই আর তাঁর হাত থেকে কাল-সমীক্ষক শ্মশান-কাব্য প্রত্যাশা ক'রে। এই সভ্যতায় তৃতীয় রবীন্দ্রনাথ অনভিপ্রেত।

পঞ্চাশের মহামন্বন্তর, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার নারকীয়তা, দেশবিভাগের দুরপনেয় লজ্জা নীলকণ্ঠের মতো দ্রুত হজম ক'রে দু-হাত বাড়িয়ে আমরা যে-স্বাধীনতাকে গ্রহণ করলাম তার স্বাদও কি তৃপ্তিকর? না। আহার্য আশ্রয় চিকিৎসার অভাবে মৃতপ্রায় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর অস্থিচূর্ণে গণতন্ত্রের জমি কখনো সারালো হয় না। ছিন্নমূল মানুষের হাহাকার, জোড়া-তালি দেওয়া মধ্যবিত্তের সংসার, ক্রমবর্ধমান বেকারসমস্যা, শ্রমিকের অনিরাপত্তা, আপিসে বিপণিতে হোটেলে কারখানায় চাকরিপ্রার্থী মেয়েদের ভিড়—সর্বত্রই হতাশার আবহাওয়া, অনিকেত মনোভাব। আর এই হতাশাসঞ্জাত ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতা গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে অপ্রতিহত এগিয়ে চলেছে। সব চেয়ে মর্মান্তিক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সমাজের সর্বস্তরে সমস্ত মানবিক সম্পর্ক নিঃসংকোচ পণ্যময়তায় পর্যবসিত হ'লো। এমনকি দাম্পত্য-প্রেমও ভেজালশূন্য নয়।

কে এর প্রতিকার করবে, সাহিত্যের দায়িত্ব এখানে কতটুকু? হ্যাঁ, সাহিত্যই পারে মজ্জমান সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে, নিশ্চেতন মানুষের জ্ঞানময় সত্তার উদ্বোধন সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এ-পর্যন্ত ইতিহাসের অস্থির তরঙ্গ পেরিয়ে আর-এক যুগসন্ধির ভাঙাগড়ায় আধুনিক গল্পসাহিত্য কী পরিমাণ শিল্প-সমৃদ্ধি লাভ করেছে তার পরিচয়-সন্ধানেই এই সংকলনের পরিকল্পনা। এই গ্রন্থে সংকলিত বাইশজন প্রবীণ ও নবীন লেখকের বাইশটি গল্প নতুন বিষয় নতুন প্রকরণ নতুন মূল্যনির্ণয়ের যোগ্য নমুনা কি না তা বিচার ক'রে দেখবেন সহৃদয় পাঠকবৃন্দ। সবিনয়ে স্বীকার করি, এমন আরও কৃতী গল্পলেখক আছেন যাঁদের রচনা অন্তর্ভুক্ত হ'লে এই সংকলন পূর্ণাঙ্গ হ'তে পারতো, কিন্তু সংক্ষিপ্ত কলেবরের জন্য তা সম্ভব হয় নি।

এই গ্রন্থে তাঁদের গল্প প্রকাশের অনুমতি দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট লেখকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সম্পাদনার কাজে সহযোগিতা করেছেন সম্বোধি

পাবলিকেশানস-এর শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অনুজপ্রতিম শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থভুক্ত লেখক-পরিচিতিটি মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। এঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কলকাতা
১৬. ৭. ৬২

বিরাম মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

জ টা য়ু

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

. . . .

অস্বাভাবিক মৃত্যু হলেই পুলিস এসে লাশ নিয়ে জেলার সদরে চালান দেয়। সে লাশ যায় জেলার বড় হাসপাতালে, সেখানে সিবিল-সার্জেনের তত্ত্বাবধানে লাশ কেটে পরীক্ষা করে দেখা হয়, মৃত্যু সঠিক কিসে বা কি কারণে ঘটেছে। সাপে কাটা, জলে ডোবা, গাছ থেকে পড়া, কি গাছ চাপা পড়া—এই সব ধরনের মৃত্যুতে ইউনিয়ন-বোর্ড-প্রেসিডেণ্টরা নিঃসন্দেহ হয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে সৎকারের হুকুম দিতে পারেন, কিন্তু গলায় দড়ি থেকে খুন-খারাপি পর্যন্ত ওতে তাঁদের হাত নেই। সে লাশ চালান দিতেই হবে। কারণ কে বলতে পারে, বিষ খাইয়ে মেরে শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয় নি! অস্ত্রাঘাতেও বোঝা যায়, আঘাতটা পরে করেছে, না নিজে করেছে, অর্থাৎ খুন না আত্মহত্যা, সেটা ডাক্তারেরা অস্ত্রাঘাতের ধরন দেখে বুঝতে পারেন।

কাজেই দুটো লাশই চালান দিলেন দারোগা।

জটে পাগলা এবং কালী বা কালা গুণ্ডার লাশ।

জটে পাগলার পাঁজরায় একটা গভীর ক্ষত-চিহ্ন। কাঁধে হাতে আরও তিন-চারটে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, তবে বুকের আঘাতটাতেই তার মৃত্যু ঘটেছে এতে কারুর সন্দেহ রইল না। কালা গুণ্ডার বড় ছোরাটাও রক্তমাখা অবস্থায় তার হাতের কাছে পড়েও ছিল। সুতরাং কালা গুণ্ডাই তাকে খুন করে থাকবে। কালা গুণ্ডা একটা অসুর, কালা গুণ্ডা একটা রাক্ষস, একটা দৈত্য, যা বল সে তাই। তার পক্ষে একটা প্রৌঢ় পাগলকে খুন করা কি এমন ব্যাপার! খসখসে কালো রঙ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তেমনি দাড়ি-গোঁফ, থ্যাবড়া নাক, ঠোঁটের উপর বেরিয়ে-পড়া দুটো বড় বড় দাঁতওয়ালা ছ ফুট লম্বা কালা গুণ্ডা—এ অঞ্চলে ত্রাস বলে পরিগণিত ছিল। মায়েরা দুষ্ট ছেলেকে ভয় দেখাত—ওই কালা গুণ্ডা আসছে! কালা গুণ্ডা না-হয় জটে পাগলাকে খুন করলে; কিন্তু কালাকে কে মারলে? কালার গলায় একটা গভীর ক্ষত-চিহ্ন। এক পাশে চারটে, এক পাশে পাঁচটা আঙুল গভীরভাবে যেন ঢুকে গিয়েছিল। কেউ যেন নখ দিয়ে ওর গলাটা ছিঁড়ে দিতে চেয়েছিল। সে কি জটে পাগলা? হয়তো সে-ই। আর কে হবে? জটের আঙুলে বড় বড় নখ প্রায়

আধ ইঞ্চি লম্বা। নখে এবং আঙুলে রক্তও লেগে রয়েছে। তবুও বিশ্বাস হয় না।

কি করে হবে?

মনে পড়ছে যে, ১৯৪৭ সালে কালা গুণ্ডা প্রথম দিন এ অঞ্চলে পা দিয়েই ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। তার হাতে সেদিন ছিল চিমটে। চিমটে ঘুরিয়ে 'চে—ৎ চ—ণ্ডী—' চীৎকার করে ভাসতোড়ের এনতাজ মিয়ার বুকের কাছে চিমটেটা নিয়ে গিয়ে বলেছিল—জিভ বের কর্ মা, খেয়ে নে রক্ত! আশেপাশের লোক অনেক কষ্টে তাকে নিরস্ত করেছিল। এনতাজ মিয়া হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে বলেছিল—আমার ভুল হয়েছে। না না, সে আপনি নয়।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই। সেদিন হঠাৎ কালার আবির্ভাব হল। পরনে গেরুয়া বহির্বাস, ঘাড়ে ফেরতা দিয়ে বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষ, তার ওপর একটা হলদে ব্যাগ, কাঁধে ঝোলা, হাতের চিমটে হাতের লোহার বালার সঙ্গে ঠুকে শব্দ তুলে এসে হাঁকলে—আরে শুনো হিন্দু, ব্রাহ্মণ আর চণ্ডাল—সব জাত শুনো, প্রভু বিশ্বনাথকে হুকুমত। লে আও চন্দা! চাঁদা আনো! চাঁদা!

—চাঁদা!

—হাঁ! চাঁ-দা—। হিন্দুকে বাঁচানেকে লিয়ে চন্দা। বাবা বিশ্বনাথকে হুকুমত। হিন্দুকে ধরম যাচ্ছে। পাঁচ হাজার—দশ হাজার কলকাত্তা, নোয়াখালি, জেনানীর হিন্দুর ইজ্জত, ধরম বচানোকে লিয়ে চান্দা! আড়াই শও রূপেয়া লে আও।

ঠিক এই সময়েই সাউগা ভাসতোড়ের এনতাজ মিয়া ওই পথ ধরেই যাচ্ছিল বায়েনপাড়। এনতাজ চামড়ার ব্যবসা করে, দু-তিনটে জেলা ঘুরে চামড়া কিনে চালান দেয়—গতিবিধি তার সর্বত্র। সে কালাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আরে, তুমি না সেই ফকির!

—হ্যাঁ, হম সন্ন্যাসী ফকির।

—না না, মুসলমান ফকির! মুরশিদাবাদের শেখের পাড়াতে সেদিন—মুসলমানদের বাঁচাতে হবে পয়গম্বরের হুকুমত, কায়েদে আজমের ফরমন নিয়ে এসেছ তুমি—বলে চাঁদা তুলছিলে না? আর আজ এখানে এসেও হিন্দুকে বাঁচাতে হবে বলে—

সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে উঠল কালা গোঁসাই। তখনও তার গুণ্ডা খেতাব আবিষ্কৃত হয় নি। সে হুঙ্কারে আশেপাশের লোকজন চমকে উঠল।

—কেয়া রে বিধর্মী ! আমি মুসলমানের জন্য চাঁদা তুলি ? আমি মুসলমান ?

গলার রুদ্রাক্ষের মালাটা দেখিয়ে, চিমটেটা ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছিল। —আ—আ! হে মহাদেব, বম্ বৈদ্যনাথ। কালী কালী মহাকালী—ভদ্রকালী কপালিনী অসুরনাশিনী! জিভ বের কর মা—খাও রক্ত, নাচ মা দিগম্বরী—হা—

সে এনতাজের মাথায় চিমটে বসায় আর কি ! লোকজন ছুটে পালিয়েছিল, এনতাজও পালিয়েছিল তাদের সঙ্গে। কিন্তু কালা গোঁসাই তাতে মানে নি। শেষে এনতাজ বলেছিল—আমার ভুল হয়েছে গোঁসাই। না না, সে তুমি নও।

গড়গড় করে গায়ত্রী মন্ত্র বলে গিয়ে কালা গোঁসাই বলেছিল—আমি মুসলমান ? ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং। আমি মুসলমান ? জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। আমি মুসলমান ? খুন করব তোকে।

—আমি মাফ চাচ্ছি, আমার ভুল হয়েছে।

—হ্যাঁ। মাফ তুমকো নেহি করতা, লেকিন—একটা সত্যি কথা বলেছিস—তাতেই তোকে মাফ কর দিয়া। শুনো বেওকুফ হিন্দুলোক, গিধ্বর বুরবক ভেড়ীকে জাত, শুনো। কেয়া বোলা ইয়ে শেখ। মুসলমানরা চাঁদা তুলছে। ফকির এসে চাঁদা তুলে ঘুরছে। পল্টন তৈয়ার করেগা। হাঁ, হিন্দু ভেড়ী লোক, সমঝ লেও। সোহি বাত—বিশ্বনাথজী সেই কথা বলে আমাকে পাঠিয়েছেন। বদ্রীনাথ আস্থানের ওপারে মহাবীরজীর আশ্রম, হনুমানজী বলেছেন আমাকে —যাও, চন্দা উঠাও। পল্টন তৈয়ার করো। যে হিন্দু চন্দা নেহি দেগা, উ বরবাদ জায়েগা। ঘরে আগুন লাগবে, সাঁপে কাটবে। মাথামে বজ্রঘাত হোবে। হাঁ। লে আও চন্দা ! আঢ়াই শও রুপেয়া—ইয়ে গাঁওকে চন্দা !

এর পর চাঁদা না দিয়ে উপায় কি ? চাঁদা এসেছিল, কিন্তু আড়াই শো নয়—পঞ্চাশ টাকা কয়েক আনা ! কালা গোঁসাই বলেছিল—আচ্ছা, কিস্তিতে শোধ নেব।

শুধু ওই গাঁয়েই নয়, আশপাশ সকল হিন্দু-গাঁয়েই চাঁদা তুলেছিল। সঙ্গে জনকয়েক চ্যালাও জুটেছিল—ঘোঁতনা হাজরা, লাট্টু চৌধুরী, গণ্ডার ঘোষ, তাদের সঙ্গে গাইয়ে গাঁজাল জগা পর্যন্ত।

ভারতবর্ষ তখন সদ্য সদ্য ভাগ হয়েছে এবং স্বাধীন হয়েছে। নানা দিকে নানান গোলযোগ ! ওদিকে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে অনবরত লোক আসছে। হৈ-হল্লা করছে। পুলিসের প্রতাপ কমেছে। তবুও একদিন এই সব খবর পেয়ে দারোগা এসে হাজির হল।

জিজ্ঞাসা করলে—কি নাম?

—হম হ্যায় কালা গোঁসাহী।

—কালা গোঁসাহী?

—হাঁ হাঁ। ভৈরব। কালভৈরব।

—বাড়ি কোথায়?

—বাড়ি তো কৈলাস। আস্তানা কাশী।

—এই সব কি বলে বেড়াচ্ছ? আর লোকজনের কাছে চাঁদা আদায় করছ কেন?

—বিশ্বনাথ প্রভু, মহাবীরজী, কালভৈরবের হুকুম।

—ও সব চলবে না। চালান দেব আমি।

হা-হা করে হেসে উঠেছিল কালা গোঁসাই।—আরে! চালান দেগা? বাঁধে গা? কি দিয়ে বাঁধবে? হাতকড়ি? হা—হা—হা—হা! থু—থু—

দারোগার আর সহ্য হয় নি। বলেছিল—লাগাও হাতকড়ি।

হাত বাড়িয়ে কালা গোঁসাই বলেছিল—লাগাও।

কনস্টেবলটা ভয়ে ভয়েই হাতকড়ি লাগিয়েছিল। লাগাবার পরেই কালা গোঁসাই 'জয় কালী' বলে চেঁচিয়ে উঠে বন্দী হাত দুটোয় একটা ঝটকা দিয়ে কী যে করলে লোকে ঠাওর পেল না; কিন্তু পর-মুহূর্তেই দেখলে, এক হাতের একটা হাতকড়ার বাঁধন খুলে গেছে; হাতকড়াটা ঝুলছে এক হাতে। মোট কথা, কালা গোঁসাহীকে বাঁধা যায় নি। কিন্তু হাতকড়া খুললেই পুলিসের হাত থেকে খোলা পাওয়া যায় না। পুলিস তাকে ওখানকার সব থেকে বড় গ্রাম নবগ্রামে ধরে নিয়ে গেল। স্থির করলে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ-প্রচারের অপরাধে চালান দেবে। কিন্তু হাঙ্গামা-হুজ্জুত অনেক, সাক্ষী-সাবুদ চাই, সকল লোকের সমর্থন চাই। এই সব ভেবে-চিন্তেই দারোগা তাকে ছেড়ে দিলে। তবে বলে দিলে—দেখ, এ সব কথা আর বোলো না। সাজা হয়ে যাবে। এবার আমি ছেড়ে দিলাম। এর পর আর ছাড়ব না।

কালা গোঁসাই বললে—ঠিক হ্যায় রে বাবা। যাও, তুমি নিদ্ যাও।

বলেই সে রাস্তায় নেমে এসে হাঁকলে—বোম্ মহাদেও টন্ গণেশ, ভেজো সত্তুমুন সমেত।—চেৎচণ্ডী!

এবং নবগ্রামেই সে একটা গাছতলায় তার চিমটেটা পুঁতে তার সামনে বসে গেল। দিন দুয়েক ধ্যানস্থ হয়ে বসে থেকে হঠাৎ তিন দিনের দিন চীৎকার

করে উঠল—যজ্ঞ, যজ্ঞ হবে। শান্তিযজ্ঞ। হাঁ। দেশের বিলকুল অশান্তি দূর হয়ে যাবে। শান্তিযজ্ঞ। হিংসা দূর হবে। অন্নকষ্ট দূরে যাবে। হিন্দুস্থান পাকিস্তানমে শান্তি আয়েগা। উঠাও চন্দা!

আর কিন্তু চাঁদা উঠল না। তখন কালা গোঁসাই শিব স্থাপন করলে এবং ধুনি জ্বাললে। চ্যালা জনকয়েক আগেই জুটেছিল—ঘোঁতনা হাজরা, লাট্টু চৌধুরী, গণ্ডার ঘোষ; এদের সঙ্গে নবগ্রাম থেকে জুটে গেল বাসের ক্লীনার ইস্কাপন, গাঁজাল গাইয়ে ভোলা, উদাসী গোবিন্দে, রাইস মিলের ফিটার বিলাইতিরাম এবং আরও জনকতক। তার মধ্যে ছিঁচকে চোর হাবলা ছিল এবং দুজন গুলিখোরও ছিল, তাদের মধ্যে একজন মুসলমান। আর জুটেছিল পরম বায়েন। পরম বায়েন গ্রামের দেবস্থলে ঢাক বাজাত, পাকী মদের ভক্ত ছিল সে। পরম সকাল-সন্ধ্যা দু বেলা কালী গোঁসাইয়ের শিবতলায় ঢাক বাজাতে শুরু করলে। দিন কয়েক পরেই বেগুনি-ফুলুরির দোকানদারনী রামদুলারী এসে গড় করে বললে—মহাদেওজীর স্বপন মিলেছে তার, সাধু মহারাজের বড় কষ্ট হচ্ছে, একটা চালা বানিয়ে দিতে হবে আর ধুলোমাটিতে বসে থাকতে মহাদেও পর্‌ভুর বড় গা ঘিনঘিন করছে—একটি বেদী বাঁধিয়ে দিতে হবে। এখন সাধু মহারাজের হুকুম চাই।

কালী গোঁসাই বললে—ভাগ ভাগ যা। নেহি মাংতা। তু তো পাপিনী হ্যায়।

ছোটখাটো মাথায়, মুখে বসন্তের দাগ—রামদুলারীকে লোকে পাপিনীই বলত। রামদুলারীর নাকি বাচ্চা চোরের দল আছে। দশ-বারোটা ভিখারী ছেলে—তারা ঘাট থেকে বাসন তুলে আনে, দুপুরবেলা বাড়ি ঢুকে শুকুতে-দেওয়া কাপড় নিয়ে আসে, ফাঁক পেলে ঘরে ঢুকে ফুলদানিটা, কলমটা, এটা-ওটা নিয়ে আসে। রামদুলারী সত্যিই দুষ্ট লোক।

রামদুলারী গোঁসাইয়ের পা জড়িয়ে ধরলে—হুকুম দাও সাধুজী মহারাজ! রামদুলারীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

ভক্তদের অনুরোধে গোঁসাই সম্মতি দিলে। বেশ চমৎকার একটি স্থান তৈরী হয়ে গেল আটটি পাকা থাম গেঁথে তার উপর খড়ের চাল দিয়ে—একদিকে চার হাত লম্বা, দু হাত চওড়া, এক হাত উঁচু সিমেন্ট দিয়ে মাজা বেদীর উপর ত্রিশূল পুঁতে, তারই গায়ে লম্বাটে শিবঠাকুরকে বসানো হল। খুব ঘটা করে ঢাক বাজাল পরম বায়েন। পুজো হল। একটা পাঁঠা এনে বলি দিলে ঘোঁতনা

হাজরা। লোকজন জমল অনেক। তার মধ্যে থেকে হঠাৎ টেঁপী ঠাকরুন তারস্বরে বললে—সর্ রে, সর্ রে। অ রে অ মুখপোড়ারা, সর্ না রে! দেখি! বাবা উঠলেন। দেখি!

নবগ্রামের টেঁপী বা টঁ্যাপা ঠাকরুন দেবভক্তি এবং পুণ্যের জন্য বিখ্যাত। নবগ্রামের কোন দেবতা বলতে পারে না যে, টঁ্যাপা ঠাকরুনের আগে কেউ তাকে কোনদিন প্রণাম করেছে বা তার থেকে জোরে মাথা ঠুকে প্রণাম করেছে। টঁ্যাপা ঠাকরুন প্রণাম করলে ঠক-ঠক শব্দ ওঠে। কপালের ঠিক মাঝখানে একটা টাকার আকারের গোল কালচে রঙের আব আছে। সেটা ওই প্রণাম করে করেই সৃষ্টি হয়েছে।

সরে গেল লোকজন; টঁ্যাপা ঠাকরুন খুঁট খুলে একটা পয়সা ফেলে দিয়ে প্রণাম করে বললে—তা বেশ হল। একটি নূতন বাবা হলেন। তা বাবার নামটি কি গোঁসাই? অ্যাঁ? বাবাকে পুজোর ফলটাই বা কি?

কালা গোঁসাই বললে—আমি কালী গোঁসাই, শিব তা হলে কালিকেশ্বর।

—চমৎকার নাম। কালিকেশ্বর। বেশ নাম। তা ফলটা বল?

—ফল আবার কি? ফল পুণ্য, ফল ধর্ম।

—উঁহু। শুধু পুণ্যি ধর্ম—সে তো ঘরে বসেই হয় গো। তার নেগে এতটা পথ হাঁটলাম কেন? ওই দেখ, মনসাতলায় গরল ভাল হয়, ওই তোমার কলেরা হলে রক্ষেকালী রক্ষে করেন। তার পরেতে তোমার ষণ্ডেশ্বর বাবার পুষ্পে গো-মড়ক ভাল হয়। কি বলে, এলোকেশী মায়ের মহিমায় টাকপড়া বন্ধ হয়। তা তোমার শিবের একটা মহিমে তো চাই বাবা!

—হাঁ। উ মহিমা বাবা মহাদেও নিজসে দেখাইয়ে দিলেন গো! শুধাও তো রামদুলারীকে। চুরির পাপ খণ্ডন করে মা। কোই চোরি কিয়া—বাস্, সওয়া পাঁচ আনা আঁধিয়ারামে রাখ দিয়ো বাবাকে আস্তানামে—বাস্, বিলকুল পাপ খণ্ডন হোগা।

—তা বেশ, তা বেশ। তা ওর সঙ্গে আর একটি মহিমে কর বাবার। এই দেখ, এই গরমের সময় সারা গায়ে ঘামাচির জ্বালায় মরি। চুরির পাপ ক্ষয়ের দক্ষিণে সওয়া পাঁচ আনা, তা ঘামাচিতে তখন পাঁচ পয়সাই ঢের। তা পাঁচ পয়সা আমি দেব, বাবা যদি আমায় ঘামাচি নিবারণ করে। ঘামাচি ধর সবারই হয়। তুমি তোমার শিবকে বল—ওই মহিমাটি ধরুন উনি।

কালী গোঁসাই সঙ্গে সঙ্গে একমুঠো ধুনির ছাই তুলে টঁ্যাপা ঠাকরুনের

হাতে দিয়ে বলেছিল—একটু হলুদের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে গায়ে মেখো। বাস্। দেখো বাবার মহিমা।

ওই ঘামাচির মহিমাতেই কালী গোঁসাইয়ের শিবস্থান জমে উঠেছিল। দিনের বেলা ঘামাচি-পীড়িত মেয়ে-পুরুষের ভিড় জমে যেত। রাত্রেও জমত। সে ওই রামদুলারী যে পাপমোক্ষণ-ফল প্রাপ্ত হয়েছে, সেই ফলের প্রত্যাশীরা এসে জমত। সে আনাগোনা জমজমাট রাত্রিকালে অর্থাৎ অন্ধকারে লোক-চক্ষুর অগোচরে। মাঝরাত্রে বা শেষরাত্রে তারা এসে ওই সওয়া পাঁচ আনা হিসাবে পয়সা রেখে যেত। এই পয়সার পরিমাণ যত বেশী হতে লাগল, ততই যে অঞ্চলটায় চুরি বাড়ল সে কথা বলাই বাহুল্য। ওদিকে কালী গোঁসাইয়েরও চেহারা বের হতে লাগল। লোককে গালিগালাজ অপমান, ক্রমে চড়-চাপড়-ঘুষি, গলা টিপে ধরে শাসানো—নিত্যকারের ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। থানার দারোগা আবার চঞ্চল হল। একদিন এসে হাজির হল কালা গোঁসাইয়ের ওখানে। সঙ্গে আর-একটি ভদ্রলোক। লোকটিকে দেখেই গোঁসাই প্রায় ক্ষেপে লাফ দিয়ে উঠল। কিন্তু তার আগেই ভদ্রলোক এবং দারোগা দুজনেই দুটো পিস্তল বের করে ধরলেন—খবরদার!

কালা গোঁসাই কুৎসিত ভাষায় গাল পাড়তে লাগল। সে শোনা যায় না, কানে আঙুল দিতে হয়। কিন্তু গোঁসাইয়ের সে বাছ-বিচার নেই। গ্রাহ্যও নেই। এমন কি পুলিসের গুঁতোও দু-দশটা পড়ল, তবুও গ্রাহ্য করল না।

—আরে, আমি হলাম নেপাল গুণ্ডা। ওই গুঁতায় আমার কি হবে? শালা, দেখ্ রে, হামারা শির কেতনা ডাণ্ডা খায়া—দেখ্। দেখ্ রে বে পিঠ, ছোরাকে দাগ। খুলনেতে একবার শড়কি চালাইছিল—জানুতে বইসা ফিনিক মাইরা খুন ছুটল—অ্যাই এত্যানি ঠাই ই-ফোঁড় উ-ফোঁড়! দাগ রইছে। ক ঘা রুলের গুঁতায় কি অইব রে হালা!

লোকের সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু এতখানি না। ওই আগন্তুক ভদ্রলোকটি সি. আই. ডি. ইন্স্পেক্টর। খবর পেয়ে এখানে এসেছেন। এসে দেখেন, কালা গোঁসাই—কলকাতার বিখ্যাত নেপাল গুণ্ডা, ওকে গুণ্ডা-আইনে প্রথম কলকাতা থেকে, পরে বাংলাদেশ থেকেই বের করে দেওয়া হয়। বেহারে গিয়ে নেপাল হয় কালা গুণ্ডা। সেখান থেকে যায় পূর্ববঙ্গে, সেখানে নাম নিয়েছিল—কাল্লু সর্দার। রাহাজানি, নৌকায় ডাকাতি, মেয়েছেলে চুরি—অনেক করেছে

সেখানে। দেশ ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে এসেছে। এ অঞ্চলে এসে হয়েছে কালী গোঁসাই বা কালা গোঁসাই।

দারোগার সঙ্গের ভদ্রলোকটি কলকাতার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের লোক। এখানকার দারোগা কালা গোঁসাইয়ের বিবরণ কলকাতায় পাঠিয়েছিল। লিখেছিল—এই সাধুপুরুষের আবির্ভাবে এখানে চুরি-ডাকাতি বেড়েছে, সুতরাং সাধুর অতীত সাধনার বিবরণ যা-কিছু তাঁদের জানা থাকে তবে সেটা জানালে তাঁর সুবিধে হয়। তাঁর আকার-প্রকার জানবার জন্যে গোঁসাইয়ের একখানা ফোটোগ্রাফও তিনি পাঠিয়েছিলেন। সেই পেয়েই ওই ভদ্রলোক হাজির হয়েছিলেন।

যাই হোক, কালা গোঁসাই গ্রেপ্তার হয়ে চালান হল। কিন্তু মাস কয়েক পরেই আবার—কালী কলকাত্তাওয়ালী—হাতমে ভোজালি—লড়ে হালি হালি—বম্ শঙ্কর—বম্ শঙ্কর—বলে ফিরে এসে ফের বসে গেল আপনার ঠাকুরতলায়।

বললে—কেয়া করেগা পুলিস? আমি হলাম মা কালীর ছেলে, বাবা শিবের বেটা, আমার কি করবে? মা-বাবাতে স্বপ্ন দিলে—ছেড়ে দে। বাপ বাপ বলে ছেড়ে দিলে। আরে মুই কি আপনা লেগ্যা কিছু করছি, যা করছি ধর্মের লেগ্যা—দশের লেগ্যা করছি। কালা গোঁসাইকে পাপ ছুঁতে পারে না। হাঁ। বোম্ শঙ্কর—বো—ম্। এবং এর পর থেকে গোঁসাই শুধু গোঁসাই থাকল না; গোঁসাই-বাবা হয়ে উঠল। বিক্রম-পরাক্রম শতগুণে বেড়ে গেল।

রাস্তায় ভিড় জমে আছে, গোঁসাইয়ের হাঁক উঠল—বোম্ শঙ্কর! হরণ করো পাপ! শীতল করো তাপ! ঘামাচি বিলকুল ভালা করো বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ভিড় দু দিকে সরে গেল। রাস্তা হয়ে গেল গোঁসাইয়ের জন্য। কেউ নড়তে দেরি করলে গোঁসাই তার মাথায় মারলে গাঁট্টা, বললে—কেয়া রে অধর্মী!

গোঁসাই হাটে গেল; সেখানে গিয়েই মারলে হাঁক—কালী কলকাত্তা-ওয়ালী, হাতমে ভোজালি—লড়ে হালি হালি। ঘামাচি-মারণ পাপ-হরণ বাবা কালিকেশ্বর শিবের জন্যে বেটী রান্না চড়িয়ে বসে আছে বাবা সব। দেও তোলা। আন সবজি।

কারও ডালা থেকে বেগুন, কারও ডালা থেকে মুলো, কারও কাছ থেকে কুমড়ো, কারও কাছ থেকে লাউ আলু কপি নিলে টেনে তুলে এবং সঙ্গের চেলার ঝুড়িটায় চাপিয়ে আর বার-দুই হাঁক দিয়ে চলে এল।

একদিন একজন গোঁসাইয়ের হাতে ধরা লাউটা কাড়তে গিয়ে বলেছিল—না, ওটা আমি দোব না। ওরে বাবা রে—আমি মরে যাব। না—না।

বাস্, সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইয়ের হাতের চিমটে উঠে গেল। অবশ্য লোকটার মাথায় মেরে মাথা ফাটিয়ে জেল যাবার মত বেকুব গোঁসাই নয়—সে চিমটে চালালে তার লাউয়ের গাদার উপর। দুম্-দাম্।—লাউগুলি একেবারে কেটে কেটে ছেতরে গেল।

এতেও বার-কয়েক ধরা পড়তে হয়েছে কালা গোঁসাইকে। কিন্তু কোনটাতেই দণ্ড হয় নি। কালা গোঁসাইয়ের ডাণ্ডার ভয়ে কেউ সাক্ষী দিতে রাজী হয় নি। যারা পুলিসের ভয়ে আদালতে গিয়েছে, তারা সেখানে গিয়ে সব গোলমাল করে দিয়েছে।

এই হল কালা গোঁসাই।

না। হল না। কালা গোঁসাইয়ের শক্তি এবং সাহসের কথা না বললে হবে না। কালা গোঁসাই লাঠি মেরে একটা ক্ষ্যাপা মহিষের শিঙ ভেঙে দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করেছে। একটা কুকুর পাগল হয়ে দশ-বারোটা লোককে কামড়েছিল, সেটা কালা গোঁসাইকে পথে পেয়ে তাড়া করেছিল; গোঁসাইয়ের হাতে এক লোটা ছাড়া আর কিছু ছিল না। গোঁসাই সেই লোটার এক ঘায়েই পাগলা কুকুরটার মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেলেছিল।

এই হল কালা গোঁসাই।

এই কালা গোঁসাইকে কি জটে পাগলা মেরে ফেলেছে? এ কি হতে পারে?

জটে পাগলা প্রায় জন্মপাগল। ইদানীং একেবারেই পাগল হয়ে গিয়েছিল। শিবু কর্মকারের ছেলে; শিবুর অবস্থা খুব ভাল নয়, তবে মোটা ভাত, মোটা কাপড় আছে। কিন্তু জটে বাড়িতেই থাকত না। ঘুরে বেড়াত এখান-সেখান করে। বিশ-বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত সে বাড়িতে থেকেছে, সে সময় পর্যন্ত বাপের সঙ্গে কামারশালায় খেটেছে। বড় সাঁড়াশি দিয়ে বাপ ধরত জলন্ত লোহা, সে পিটত তার উপর হাতুড়ি। বড় হাতুড়ি। শেষ পর্যন্ত গোরুর গাড়ির চাকার হাল বসাতে সে ধরত সাঁড়াশি আর চাষীরা মারত হাম্বর। কাজটা সহজ বলে ওইটেই ওর বাপ ওকে ছেড়ে দিয়েছিল। সকলে বলত—পাগলা কিন্তু জোয়ান হবে ভাল। তাই হয়েওছিল। বিশ-বাইশ বছর বয়সে জটে একেবারে লোহার মানুষ হয়ে উঠল। তারপরই জটের মাথার গোলমাল বাড়ল। গোলমাল বাড়ল বাবুদের থিয়েটার দেখে। 'সীতাহরণ' পালা দেখে

কেঁদে একেবারে সারা। সীতা সেজেছিল কলকাতার একটি ছেলে। যেমন তাকে মানিয়েছিল, তেমনি সে পার্ট করেছিল। রাম সেজেছিল এই গ্রামেরই শিবনাথ। সেও পার্ট করেছিল ভাল। রাত্রে অভিনয় দেখে জটে আর বাড়ি ফেরে নি, বাকি রাতটা ওই ফাঁকা আসরেই বসে কেঁদেছিল। সকালবেলাতেই বোঝা গেল, ওর মাথার গোলমাল বেড়েছে। সাহাদের উমেশকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে তার হাতখানা খপ করে চেপে ধরে বললে—পাষণ্ড মিথ্যুক কাপুরুষ!

উমেশ অবাক এবং আশপাশের লোকেরা অবাক। হল কি? উমেশ বললে—ছাড় ছাড়, লাগে—লাগে।

—লাগে? বদমাশ! নির্লজ্জ! মরার ভান করে পড়ে থেকে তোর বাঁচতে লজ্জা হল না?

—কি বলছিস? যা গেল!

—কি বলছি? পাষণ্ড, তুই রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ তা হলে প্রাণ দিয়ে করিস নাই? মিছে করে মরে গিয়েছি দেখিয়ে পড়ে রইলি? আর সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেল রাবণ?

উমেশ জটায়ু সেজেছিল। জটায়ুর আত্মদান জটেকে মুগ্ধ করেছিল। উমেশকেই সে প্রণাম করেছিল বার বার। চীৎকার করে বলেছিল—বলিহারি উমেশ! বলিহারি! বাঃ ভাই, বাঃ! মহাপুণ্য তোমার—মহাপুণ্য!

তাই আজ উমেশকে জীবিত দেখে সে ক্ষেপে গিয়েছে। তা হলে ও সত্যকারের যুদ্ধ করে নি! প্রাণ বাঁচাবার জন্য মিছামিছি মরে যাবার ভান করে পড়ে গিয়েছিল—রাবণ মড়া ভেবেই তাকে ছেড়ে দিয়েছে। ওরে পাষণ্ড! ওরে কাপুরুষ! তোর প্রাণের মায়াটাই এত বড় হল রে?

লোকে হেসে সারা হল। অনেক বুঝিয়ে বললে—যাত্রা-থিয়েটারে যা হয়, তা কি সত্যি হয় রে? সব মিছে।

এর পর থেকে সে শিবনাথের বাড়ি আনাগোনা শুরু করলে। শিবনাথকে তার বড় ভাল লেগেছে। রাম! সে রাম!

শিবনাথ শুধু রাম নয়, শিবনাথ এখানকার গ্রামের মুকুটহীন রাজা। সাধারণ ঘরের ছেলে। লেখাপড়া শিখেছে—এম এ পাস। এখানকার সকল কল্যাণজনক অনুষ্ঠানের সে নেতা। বিয়ে করে নি। এই নিয়েই আছে। যেমন মিষ্ট কথা তেমনি সুন্দর তার চেহারা।

শিবনাথের বাড়ি গিয়ে সে ধরল—সেও থিয়েটারে পার্ট করবে।

শিবনাথ কাউকে দুঃখ দিয়ে ফিরিয়ে দেয় না। 'না' বলতে তার মুখে বাধে। সে বললে—দেব, পার্ট দেব তোকে।

জটে উৎসাহিত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তার গুণপনারও পরিচয় দিলে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বক্তৃতার সুরে—কে রে? কে রে কামাতুর—পাপাচারী পিচাশ—

শিবনাথ সংশোধন করে দিলে—পিচাশ নয়, পিশাচ।

—পিশাচ! আচ্ছা। কে রে কামাতুর পাপাচারী পিশাচ—নিষ্কলঙ্ক স্বর্ণপ্রতিমা শুচিতার প্রতিমূর্তি—নবনীততনু দেবীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিস? —কে?

তারপর হঠাৎ চমকে উঠে বললে—চিনেছি—ওরে দুরাত্মা—ওরে ব্যভিচারী —চিনেছি চিনেছি তোরে। পাপাচারী লঙ্কাপতি—রাক্ষস রাবণ। রামের ঘরনী তুই করিলি হরণ? কিন্তু রক্ষা নাই তোর। গড়ুরের পুত্র আমি—জটায়ু আমার নাম। বৃদ্ধ আমি—তবু আজও নখর প্রখর মোর। নখর-আঘাতে তোর দশ মুণ্ড করিব ছেদন।

পার্ট তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এমন ক্রুদ্ধ ভঙ্গি করে রোষ-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে যে, সে যেন সত্যই জটায়ু।

তারপর ভাঙা গলায় কাতরভাবে মুমূর্ষুর মত শিবনাথের সামনে হাত জোড় করে বললে—সম্মুখে দাঁড়াও তুমি রাম, হে বিশ্বের জীবনাভিরাম দূর্বাদলশ্যাম, ওহে মনোহর!

থরথর করে কাঁপতে লাগল তার কণ্ঠস্বর।

শিবনাথের ভারি ভাল লাগল। সত্যিই পাগলা অভিনয় করতে পারে।

কাল অভিনয়ে উমেশ যা করেছে, যেমন ভাবে বলেছে—তার থেকে সত্যই ভাল, প্রাণবন্ত। সে প্রশংসাই করলে। বললে—তাই তো রে! সত্যিই তো তুই খুব ভাল বক্তৃতা করতে পারিস! এ তো চমৎকার!

জটে বললে—তা হলে আমাকে ওই পার্টটা দাও। বেটা উম্‌শা—কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক। ও মরে নি। দিব্যি বেঁচে আছে। সকালবেলা দেখলাম একটা কাঠি চিবিয়ে দাঁতন করছে। আজ আমি জটায়ু হব?

শিবনাথ বললে—ওরে সর্বনাশ! সত্যি সত্যি মরবি নাকি?

—তা না হলে কি করে জটায়ু হব?

—তা হলে পুলিসে রাবণকে ধরে নিয়ে যাবে যে।

—তুমি রাম, তুমি ভগবান, তুমি রাজা—তুমি বারণ করে দিয়ো। বোলো, জটায়ু স্বর্গে গিয়েছে। যুদ্ধ করে মরেছে। ও পার্ট আজ আমি করবই।

—কিন্তু আজ তো আর 'সীতাহরণ' পালা হবে না জটাধর।

—হবে না? হতাশ হয়ে গেল জটাধর।

—না! আজ 'রানা প্রতাপ' হবে।

—সে আবার কি পালা?

—খুব যুদ্ধ আছে। আমি শক্তিসিংহ সাজব।

এতে জটাধর বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করলে না। আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। রাত্রে থিয়েটার দেখতে এল। কিন্তু প্রথম দৃশ্যেই রানা প্রতাপ ও শক্তিসিংহের ঝগড়া দেখে সে বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে—একটা বুনো শুয়োর মেরেছে, তাই নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া! ব্রহ্মহত্যা হয়ে গেল! রাম! রাম! এই আবার দেখে!

বলে সেই অভিনয়ের মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে ছোট ভাই গঙ্গাধরকে ডেকে বললে—চল্ রে গোঙা, বাড়ি চল্। রাত হয়েছে, ভাত খেয়ে শুবি চল্। ই আর দেখতে হবে না।

চলে গেল সে।

* * *

শিবনাথের বাড়ির পথই সে আর মাড়াল না। মাস কয়েক পরে শিবনাথই তাকে ডাকলে। আবার অভিনয় হবে। জটাধরের অভিনয়ের শক্তি আছে, তাকে সে পার্ট দেবে। জটাধরের মাথাটা তখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ রয়েছে, এবং পার্ট সে ভালই করলে সেবার। সকলেই তারিফ করলে জটাধরের। বললে—ওরে, এ যে ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল! ক্ষ্যাপা যে বেড়ে অভিনয় করে! অ্যাঁ!

জটাধর ঘাড় নেড়ে বলল—জটায়ুর পার্ট যদি দিত দেখতে! দেখিয়ে দিতাম এক হাত!

এর পর জটাধর থিয়েটার করেই পাগল হয়ে উঠল।

শিবনাথের বাড়ি নিত্য হাজিরা দেয় এবং প্রশ্ন করে—আবার কবে থিয়েটার হবে, তা বল।

মধ্যে মধ্যে বলে—এই দেখ, রাম সাজলে তোমাকে যেমন মানায় তেমন কিছুতে মানায় না। তুমি আর একবার 'সীতাহরণ' পালাটা কর। আমি একবার জটায়ু সাজি! একবার দেখিয়ে দি।

বলেই আরম্ভ করে—কে—রে ? কে—রে কামাতুর পাপাচারী পিশাচ ? আরে—আরে—চিনিয়াছি তোরে। পাপাচারী লঙ্কাপতি রাক্ষস রাবণ।

শিবনাথ হাসে।

জটাধর হাসে এবং হাসতে হাসতেই শিবনাথের পাখানি টেনে নিয়ে টিপতে শুরু করে বলে—রামচন্দ্র, এবার তুমি বিয়ে কর। সীতা আন ঘরে।

শিবনাথ বলে—জটা, ওটা আর কপালে নেই। বুঝলি, হরধনু ভাঙবার ক্ষমতা নেই। অভাবের লোহাতে গড়া ধনুক, ও ভাঙতে আমার সাধ্যি নেই।

হঠাৎ কিন্তু অঘটন ঘটে গেল। অভাবের লোহায় গড়া ধনুকখানা সত্যিই ভেঙে ফেললে শিবনাথ। নিজেও জানতে পারলে না, কেমন করে কি হল। হঠাৎ রাতারাতি বিখ্যাত লোক হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, অভাব ঘুচে টাকার বাজারে দাম বেড়ে গেল তার। সে হল ওই থিয়েটার থেকে।

শিবনাথের এক বন্ধু সিনেমায় কাজ করত ; সে একখানা ছবিতে ডিরেক্টার হয়ে গেল। সেই ওকে টেনে নামালে ছোটখাটো একটা ভূমিকায়। শিবনাথের তাতেই নাম হয়ে গেল। চেহারাটা ছিল ভাল, তার উপর অভিনয় হল সবার সেরা ; বাস্, তার পরেই দুটো ছবিতে আরও দুটো পার্ট করে তিনটের বেলায় হয়ে গেল হিরো।

এক বছর পর শিবনাথ যখন দেশে ফিরল, তখন সে বিখ্যাত ব্যক্তি তো বটেই, উপরন্তু অভাব তার ঘুচে গেছে। এক বছরে চারখানা ছবিতে সবসুদ্ধ পাঁচ-ছ হাজার টাকা রোজগার করেছে এবং দশ-বারো হাজার টাকার কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে। চেহারা পর্যন্ত পালটে গেছে তার।

গ্রামের লোক প্রায় ভিড় করে তাকে দেখতে এল। জটাধরও এল। সকলেই শিবনাথকে অভিনন্দিত করে ফিরে গেল। বসে রইল জটাধর।

জটাধরের চেহারা দেখে শিবনাথ চমকে উঠল।—এ কি চেহারা হয়েছে জটাধর ?

জটাধরের ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। চোখে জল এল। সে বললে—তুমি এত নিষ্ঠুর ! আমাকে ফেলে তুমি চলে গেলে ! এরা আমাকে আর পার্ট দেয় না। বলে—পাগল।

জটাধরের মাথা আবার খারাপ হয়েছে। শরীর শীর্ণ হয়েছে, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, ময়লা কাপড়জামা—জামা নয়, একটা গেঞ্জি। ঘরের কাজকর্ম করে

না, শুধু ঘুরেই বেড়ায়। বলে—দেখবে দেখবে। যাব কলকাতা। রামচন্দ্র এলে হয়। সিনেমায় নামব। বড্ড নাম হবে।

শিবনাথকে বললে—আমি পার্ট করতে পারি না? উমশা আমার চেয়ে ভাল পার্ট করে? তুমি বল! কই সে বলুক, আমার মত!

বলেই আরম্ভ করলে—কে রে? কে—রে কামাতুর পাপাচারী পিশাচ? আরে—আরে চিনিয়াছি—চিনিয়াছি তোরে। পাপাচারী লঙ্কাপতি রাক্ষস রাবণ।

শিবনাথ তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বললে—পার্ট তুই সত্যিই ভাল করিস জটাধর।

—তবে আমাকে নিয়ে চল তোমার সঙ্গে।

—কলকাতায়?

—হ্যাঁ।

এ কথার কি জবাব দেবে শিবনাথ? মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে সঙ্কোচ হল তার। সে চুপ করে রইল। জটাধর ডাকলে—রামচন্দ্র!

—না রে, ও-সব জায়গা ভাল নয় জটাধর। সে-সব জায়গা বাবুদের। বাবুরা সেখানে চাষী সাজে, মুটে সাজে। চাষী মুটে যারা সত্যিকারের, তাদের তারা নেয় না।

—তুমি একবার আমাকে একটা পার্ট দিয়ে দাও। তা পরে আমি দেখে নোব।

—আচ্ছা দেখব।

দিন কয়েক থেকেই শিবনাথ চলে গেল। জটাধর বললে—তোমার চিঠি পেলেই আমি চলে যাব। চিঠি দিয়ো।

শিবনাথ বললে—দেব। অবশ্য নিতান্তই সান্ত্বনা-বাক্য।

জটাধর তারপর নিত্য যেত পোস্ট-অপিস।—আমার চিঠি আছে পিওন—জটাধর কর্মকার?

—নাই।

পরের দিন আবার।

—নাই।

আবার পরের দিন।

—নাই।

—মিছে কথা—ভাল করে দেখ। মাস্টারবাবু, তোমার পিওন নিশ্চয় আমার চিঠি মেরেছে।

মাস্টার ধমক দিয়ে বললে—ভাগ পাগলা। পাগলামির আর জায়গা পাও নি!

কে যেন একজন রসিকতা করে বললে—হায় প্রভু রামচন্দ্র—দূর্বাদলশ্যাম! তুমিও বঞ্চনা করলে—দীন ভক্ত জটায়ু অধমে! হায় রাম!

মুহূর্তে কি হয়ে গেল জটাধরের। একটা চীৎকার করে উঠল আহত পশুর মত এবং ছুটে পালিয়ে গেল গ্রাম থেকে।

বেরিয়েছিল সে কলকাতা যাবে বলে। কিন্তু মাস দুই-তিন পর বাড়ি ফিরল বদ্ধপাগল হয়ে। গ্রামের প্রান্তে, রাস্তার ধারে বসে থাকত। চীৎকার করে থিয়েটারের পার্ট বলত। মধ্যে মধ্যে যেত থিয়েটারের বর্তমান পাণ্ডা দেবকুমারবাবুর কাছে।

—'সীতাহরণ'টা একবার করুন। শিবনাথ রাম—আমি জটায়ু। পাঁচ টাকা দোব আমি। ভিক্ষার টাকা থেকে সত্যিই সে পাঁচ টাকা জমিয়ে রেখেছে।

—আর কলকাতার লোকেদের নেমন্তন্ন করুন। তারা দেখে যাক, শিবনাথ রাম করে ভাল, না, আমি জটায়ু করি ভাল! আমাকে নিশ্চয় নিয়ে যাবে তারা। আমি যা রোজগার করব তার অর্ধেক থিয়েটার পার্টিকে দোব। করুন একবার ঐ পালাটা।

দেবকুমার বলে—বিরক্ত করিসনে বাপু। যা, এখান থেকে যা।

শেষ পর্যন্ত বলে—বেরো বলছি।

এই জটে পাগলা। শেষ পর্যন্ত নখে চুলে, দাড়িতে-গোঁফে বীভৎস হয়েছিল চেহারা। দেহ হয়েছিল শীর্ণ। জটে খেত না ভাল করে।

এই জটে পাগলা কালা গোঁসাইকে হত্যা করতে পারে, এ কি সম্ভব?

* * *

শিবনাথ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে বললে—তাই হয়েছে শ্রীযুত বোস। আমি বলছি আপনাকে।

যেদিন সকালে কালা গোঁসাই এবং জটে পাগলার লাশ চালান গেল, সেই দিন বিকেলবেলা শিবনাথ এল গ্রামে। খবর পেয়ে সে ছুটে গেল সদরে। একা নয়, সস্ত্রীক। শিবনাথ মাস কয়েক আগে বিয়ে করেছে। মাস খানেক আগে বউ নিয়ে এসেছিল গ্রামে। বউটি সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে, গান গায় ভাল। বউ নিয়ে গ্রামে এসে সে বেশ সমারোহ করে খাইয়েছে লোকদের।

জটাধরও এসেছিল।

চুপি চুপি শিবনাথকে বলেছিল—খাসা সীতা হয়েছে রামচন্দ্র। এইবার সেই পালাটা একবার কর। আমি দশ টাকা জমিয়ে রেখেছি। বুঝেছ?

শিবনাথ বলেছে—হবে। তুই পেট ভরে খা।

পেট ভরে খেয়ে সে শিবনাথের বউকেও তার পার্ট শুনিয়েছিল। বলেছিল—তুমি বল রামচন্দ্রকে। বুঝেছ মা!

শিবনাথের বউ বলেছিল—বলব। কিন্তু হেসেছিল।

জটাধর রাগ করে চলে গিয়েছিল।

শিবনাথ ম্যাজিস্ট্রেটকে বললে—আমাকে হঠাৎ যেতে হয়েছিল কলকাতা। জরুরী কাজ। এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হতে হল। সেই কারণে আমার স্ত্রী রইলেন। কথা রইল, কাজ সেরে ফিরে এসে ওঁকে নিয়ে যাব। ওঁর ধনুকভাঙা পণ—এখানে একখানি ছোট বাড়ির পত্তন না করে যাবেন না। গ্রামের প্রান্তে যেখানে জটে এবং কালা গোঁসাই মরেছে, তার খানিকটা এ দিকে আমার বাড়ির জায়গা ঠিক করেছিলাম। যেদিন আমি গেলাম, সেদিন স্টেশনের পথে জটাধরের সঙ্গে দেখা হল। বললাম—হ্যাঁ রে, রাগ করেছিস?

রাগই সে করেছিল। আমার কথার জবাব দিলে না।

বললাম—রাগ করিস নে। আমার বউয়ের ঐ স্বভাবটা মন্দ। কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে। ওই জন্যে ওকে পার্ট দেয় না।

সে বললে—রিহারস্থাল দাও। সেরে যাবে। আমি ধমক দিয়ে সারিয়ে দেব। তুমি পালা ধর।

শিবনাথ বললে—তাড়াতাড়ি ছিল আমার, আমি বললাম, আমি ফিরে আসি, এসে তাই করব।

জটাধর বললে—কোথায় যাবে তুমি?

—কলকাতা।

—সীতা?

শিবনাথ ম্যাজিস্ট্রেটকে বললে—তারপর শুনুন আমার স্ত্রীর কাছে। বল কল্যাণী।

শিবনাথের স্ত্রী কথা বলতে গিয়ে যেন বলতে পারছে না। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

শিবনাথ বললে—সঙ্কোচ কোরো না। সঙ্কোচের এতে কিছু তো নেই।

শিবনাথের স্ত্রী কল্যাণী আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললে—এখানে এসে এ গ্রাম আমার বড় ভাল লেগেছে। লাল মাটি, খোলা মাঠ আর এখানকার রাত্রের আকাশ দেখে আমার কেমন যেন মনে হয়, আমি যেন হারিয়ে যাই! তাই আমি জেদ ধরেছিলাম, এইখানে বাড়ি কর। গ্রামের ভিতর পুরনো বাড়িতে নয়—গ্রামের শেষে খোলা মাঠের ধারে। যে বাগানটায় এই কাণ্ড ঘটেছে, সেই বাগানটার ধারে ওঁর খানিকটা জমি আছে, সেইখানটাই আমার পছন্দ হল। ওঁকে টেনে আমিই নিয়ে গেলাম ইঁটের ঠিকাদারের কাছে, রাজমিস্ত্রীদের ডাকলাম। তা ছাড়া, ওঁকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বহু জায়গা দেখে বেড়ালাম। ওঁর ছেলেবেলার প্রিয় জায়গাগুলি দেখালেন উনি। যে জায়গায় কালা গোঁসাই তার আস্তানা পেতেছিল, সেই জায়গায় ছিল ওঁদের ছেলেবেলার ভয়ের জায়গা। বলতেন, ফুটবল খেলে ফেরবার সময় ওই জায়গায় ওঁরা প্রায় চোখ বুজে জায়গাটা পার হতেন। ওখানে নাকি ভূত ছিল। ওখানেই দেখলাম কালা গোঁসাইকে। কালা গোঁসাই এসে ওঁকে বললে—আরে বেটা, তুমি নাকি ভারি আমীর আদমী! সিনেমার পার্ট করো? তুমার বহু? ও করে?

উনি বললেন—না।

কালা গোঁসাই বললে—আমাকে জান তুমি? আমি কালা গোঁসাই।

—নাম শুনেছি।

—তা কালিকেশ্বর শিবের পূজা তো কিছু দাও। খুব তো লোককে খাওয়ালে দাওয়ালে।

একটা টাকা উনি দিলেন।

পরের দিন সকালে উনি বন্দুক বের করে সেটাকে পরিষ্কার করছিলেন। কথা ছিল, ওখান থেকে দু ক্রোশ দূরের বিলে শিকার করতে যাব। কালা গোঁসাই এল। বললে—বন্দুক? শিকার?

উনি হেসে বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু তোমার আবার কি খবর? কি মনে করে?

গোঁসাই বললে—একনলা বন্দুক, কিন্তু কি রকম গড়ন? এটা কি? এ রকম তো দেখি নি!

আমি বললাম—ওটাতে টোটা পোরা থাকে, একসঙ্গে পাঁচটা। বার বার টোটা পুরতে হয় না। একসঙ্গে পর পর পাঁচবার গুলি ছোঁড়া যায়।

—আ! আচ্ছা! খুব ভাল বন্দুক। তুমি ছুঁড়তে পার?

—পারি, কিন্তু তোমার খবর কি গোঁসাই?

—তুমি খুব ভাল আদমী। তোমার কাছে এলাম। তুমি বাড়ি করবে শুনলাম?

—হ্যাঁ। কে বললে তোমাকে?

সে কথার জবাব না দিয়ে গোঁসাই বললে—ওই নীরদ ঠিকাদারকে ঠিকা দিয়ো না তুমি।

—কেন?

—উঁহু। ওকে আমি বললাম, শিবের দরবারে ঢুকবার পথের মুখে দুটো থাম বানিয়ে একটা ফটক বানিয়ে দাও। উ দিলে না। ওকে ঠিকা তুমি দেবে না। আমি তোমাকে রাজমজুর দোব—কাজ দেখে দোব। ভাল কাজ সস্তায় করে দোব। তুমি শিবের দরবারে থাম ফটক বানিয়ে দেবে।

উনি বললেন—আমি ওকে কথা দিয়েছি গোঁসাই। সে হয় না।

—না না। আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে।

—তোমার কথা শুনতে হবে? উনি একটু চটে উঠলেন—কেন বল তো?

—আমি কালা গোঁসাই। বাবা শিবের হুকুম।

উনি ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে বললেন—বিরক্ত কোরো না গোঁসাই, যাও তুমি এখান থেকে। তুমি এখানে অনেক উপদ্রব করছ আমি শুনেছি। আমার নামও তুমি জান। আমি আজ সিনেমার কাজে বাইরে থাকি, কিন্তু এখানে আমি অনেক উপদ্রব বন্ধ করেছি। তুমি নিশ্চয় শুনেছ!

—আ—চ্ছা! কালা গোঁসাই উঠে দাঁড়াল। তারপর বললে—শিব তোকে দণ্ড দিবে। আমাকে দোষ দিস নে।

উনি হেসে বললেন—কি হবে? গাময় ঘামাচি?

কালা গোঁসাই বললে—নন্দীর ত্রিশূলের মুখে বন্দুক তোমার বাত বলবে না। এ আমি বলে দিলাম।

একটু চুপ করে রইল শিবনাথের স্ত্রী।

তারপর বললে—ও কথাটা আমাদের কারুরই মনে ছিল না। কালা গোঁসাই মধ্যে মধ্যে বাড়ির সামনে দিয়ে যেত আসত। কিন্তু আর ঝগড়া-টগড়া করে নি।

উনি হঠাৎ সেদিন টেলিগ্রাম পেয়ে চলে গেলেন। আমাকে বললেন—একলা থাকতে পারবে তো?

বললাম—খুব পারব।

এত বড় গ্রাম—এ গ্রামে চুরি, তাও ধান চুরি, কাপড় চুরি, ঘাট থেকে বাসন চুরি ছাড়া আর কখনও কিছু হয় নি। ভয় বলতে অসুখের আর ভূতের। ওঁর ডাক্তার-বন্ধু রয়েছেন; সকলে ভালবাসেন; আর ভূতের ভয় আমার নেই। তা ছাড়া, ওঁর বন্ধুদের উনি বলে গেলেন।

আমি একলাই বেড়ালাম দুদিন।

সেদিন ছিল বোধ হয় পূর্ণিমার পরদিন। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হয়তো বা দ্বিতীয়া পড়ে থাকবে। পূর্ণিমার দিন থেকে আমাদের বাড়ির ইঁট আসছিল এখানে। ঠিকেদার নীরদবাবু আর দেবকুমারবাবু এসে বললেন—চলুন বউদি, ইঁট গুনে দেখব। আপনাকেও গুনতে হবে।

ইঁট গোনা হল। সন্ধ্যে হয়ে গেল; পুবদিকে সোনার থালার মত চাঁদ উঠল। আমিই বললাম—বসুন একটু। চাঁদ উঠছে, দেখি।

দেববাবু বললেন—তা হলে গান শোনান।

অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না, গাইলাম। দেখতে দেখতে জ্যোৎস্নায় হেসে উঠল চারিদিক। সেই জ্যোৎস্নার মায়াতে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। একখানার পর আর একখানা—আবার একখানা গাইলাম।

হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর মূর্তি এসে সামনে দাঁড়াল। আমি চমকে উঠলাম। দেববাবু ধমক দিয়ে বললেন—কে?

সে বললে—আমি জটাধর, দেবুভাই।

—জটে?

—হ্যাঁ। বলে বসল সে। তারপর বললে—এমন সুন্দর গান গায় আমাদের সীতা, তা সে পালাটা একবার করবে না? আমার সাধটা একবার মেটাবে না?

দেববাবু বললেন—পাগলামি করিস নে জটে, বাড়ি যা। আজকাল শুনি বাড়ি যাস নে, যেখানে-সেখানে মাঠে-ঘাটে পড়ে থাকিস।

জটাধর বিড়বিড় করে বললে—বাড়ি? বাড়ি? উঁহু! উঁহু! বাড়ি আমার কোথা আবার? বললাম পালাটা করতে, তা করবে না তোমরা, তা কোরো না।

তারপরই বক্তৃতা শুরু করলে—কে রে ? কে রে তুই কামাতুর—পাপাচারী নিষ্ঠুর পিশাচ ?—বলে চলে গেল সে বাগানের ভিতর দিয়ে।

আরও একটা গান গেয়েছিলাম। তারপর ফিরলাম বাড়ি।

আমাদের বাড়ি যাবার একটা সোজা পথ আছে। সেটা গলি-পথ। বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর দিয়ে। দরজাটা চণ্ডীমণ্ডপের দিকেই মুখে করে।

ওঁরা আমাকে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পৌঁছে দিলেন। আমি বললাম—আর আসতে হবে না। ওঁরা চলে গেলেন। আমি চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকলাম। আমার শ্বশুরকুলের চণ্ডীমণ্ডপ। ওঁর ঠাকুরদাদাদের পাঁচ ভাইয়ের প্রতিষ্ঠা করা পাঁচটি শিবমন্দির পাশাপাশি উঠেছে। লোক নেই, জন নেই—খাঁ-খাঁ করছে। মন্দিরের প্রদীপগুলি নিবে গিয়েছে। শরিকেরা গরিব হয়ে গিয়েছে। দেখলাম, শ্যাওলা-ধরা মন্দিরের গায়ে চাঁদের আলো পড়ে যেমন লজ্জা পাচ্ছে তেমনি লজ্জা দিচ্ছে। উপরের কলসগুলি কালো হয়ে গিয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, বাড়ি তৈরি আরম্ভ করবার আগেই এর সংস্কার করাতে হবে। কলসগুলি মাজাব, মন্দিরে চুনকাম করাব—

হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার মুখ চেপে ধরলে। এক মুহূর্তে আশ্চর্য কৌশলে মুখ বেঁধে, আমাকে তুলে ঘাড়ে ফেলে, গলি-পথ ধরে ছুটল। অলিগলি তার জানা। কোন্ গলি-পথ বেশি অন্ধকার, কোন্ গলিটা দুটো বাড়ির জলপড়া নালা সে সব জানে। ওই নালার গলি-পথ ধরে সে ছুটল। আমি চীৎকার করতে পারছিলাম না। তার শক্ত মুঠোয় দুখানা হাত যেন আমার ভেঙে যাচ্ছিল। শুধু পাচ্ছিলাম গায়ে গাঁজার উৎকট গন্ধ।

অনেকটা পথ এসে সে এক জায়গায় আমাকে ফেলে দিলে।

জায়গাটা আবছা অন্ধকার। বড় গাছের ছায়াতল। সে আমাকে ফেলে দিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল। দেখলাম, কালা গোঁসাই।

বীভৎস হাসি, কুৎসিত দৃষ্টি। সে বললে—হাম কালা গোঁসাই। হাঁ! বন্দুক কোথা ? বন্দুক ? পাঁচটা গুলি পর পর চলে ? হাঁ! সিনেমাওয়ালী—আজ তুমকো লেকে ভাগেগা হম! হি-হি-হি! হি-হি-হি! হি-হি-হি! সে হাসতেই লাগল!

আমি ভয়ে বোবা হয়ে গেলাম। শরীরে বল ছিল না আমার।

সে আমার হাত ধরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলল। এমন সময় হঠাৎ একটা

বিকট চীৎকার উঠল—বিকট চীৎকার করে অন্ধকার থেকে প্রেতের মত একটা মূর্তি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কালা গোঁসাইয়ের উপর—কে—রে—কে—রে?

দেখলাম, অতর্কিতে ধরলে সে কালা গোঁসাইয়ের গলার নলিটা চেপে। চীৎকার করতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম—সে জটে পাগলা। জটায়ুটা বক্তৃতা করছে।

কালা গোঁসাই কথা বলতে পারছিল না। এক হাতে সে জটের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করছিল, অন্য হাতে সে কোমর থেকে ছুরি বার করে তাকে মারবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু জটে পাগলার নিষ্ঠুর আক্রমণ, নিষ্ঠুর বজ্রের মত শক্ত হাতের মুঠি। সে যুদ্ধ নিষ্ঠুর যুদ্ধ। আমার মনে হল, অমাবস্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল পৃথিবী। আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

তারপর তখন কত রাত্রি তা জানি না। বোধ হয় দু পহর পার হয়েছে। আমার জ্ঞান হল। চাঁদ তখন মাথার উপর। জ্যোৎস্নার রঙ তখন নিটোল মুক্তোর মত ঝকঝকে শাদা! ঝলমল করছে চারিদিক। গাছের ফাঁক দিয়ে বাগানের অন্ধকারের মধ্যে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। বাগানের ভিতরের অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। তার মধ্যে দেখলাম—একদিকে পড়ে আছে কালা গোঁসাই, অন্যদিকে পড়ে আছে জটে পাগল।

হঠাৎ শিবনাথের স্ত্রীর চোখ থেকে গড়িয়ে এল দুটি জলধারা। সে বললে—পাগল নয়। সে জটায়ু।

সকলে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। কল্যাণী বললে—আমি বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়িতে ঝি-চাকর ভয় পেয়েছে। তারা জেগে বসে ছিল। আমি বললাম—জ্যোৎস্না দেখছিলাম। উনি বাড়ি আসতে সব বললাম।

শিবনাথ বললে—সৎকারের জন্য ওর শবটা আমি চাইতে এসেছি। ওর সৎকার করব আমি।

কা তব কান্তা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

. . . .

এই কাহিনী বর্তমান কালের কি ভবিষ্য কালের তাহা ঠিক বলিতে পারিতেছি না। এ যুগে মহাকাল যেরূপ প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়াছেন তাহাতে বর্তমান কাল চক্ষের নিমেষে অতীতে পরিণত হইতেছে, ভূত-ভবিষ্যৎ একাকার হইয়া যাইতেছে। এই ছুটাছুটি ও হুড়াহুড়ির হিড়িকে মাটির বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে, আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতেছি। অন্যান্য স্থাবর বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ নামক গৃহপালিত সংস্কারটি গৃহের মতই অনাবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ এই বাক্যটাকে প্রসারিত করিয়া যস্মিন্ কালে যদাচারঃ এই বাক্যটি প্রবর্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

অথ—

দক্ষিণ আমেরিকার একটি রাজ্য; চিরবসন্তের দেশ। বসন্ত ঋতু কখনও একটু আতপ্ত হয়, কখনও বা একটু শীতল হয়; অন্য ঋতু নাই। সোনালী দিনগুলি রূপালী রাত্রে মিলাইয়া যায়; আবার সূর্যের পরশমণি রূপাকে সোনা করিয়া তোলে। জীবন-নদী দ্রুতবিলম্বিত ছন্দে সঞ্চারিত হয়; জীবনের ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটাছুটি এই রাজ্যে আসিয়া যেন ক্ষণকালের জন্য ক্লান্তি বিনোদন করে।

এই রাজ্যে ভারতীয় দূতাবাস আছে। দূতাবাসে যে-কয়জন ভারতীয় রাজপুরুষ আছেন তন্মধ্যে দুইজন বাঙালী; করঞ্জ রায় এবং উন্মেষ গুপ্ত। তাহারা মধ্যম শ্রেণীর রাজপুরুষ, দূতাবাসের সন্নিকটে অপেক্ষাকৃত নির্জন পাড়ায় বাসা লইয়া একত্র বাস করে। দু'জনেই যুবা পুরুষ এবং সস্ত্রীক।

ভারতীয় দৌত্য-বিভাগে যাহারা কাজ করে তাহাদের নানা সদ্‌গুণের সঙ্গে রূপও থাকা চাই, অর্থাৎ চেহারা ভাল হওয়া দরকার। শুধু তাই নয়, তাহাদের স্ত্রীরাও সুদর্শনা হইবে এইরূপ একটি অলিখিত নিয়ম আছে। কারণ, দূতাবাসের রাজপুরুষদের নিয়তই স্ত্রী লইয়া আন্তর্জাতিক পার্টি ও জলসায় যোগ দিতে হয়, সেখানে ভারতের পক্ষ হইতে খেঁদি-বুঁচির আবির্ভাব বাঞ্ছনীয় নয়; তাহাতে ভারত সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের ধারণা খারাপ হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং বলা

বাহুল্য যে উন্মেষ গুপ্ত ও করঞ্জ রায় যেমন সুপুরুষ, তাহাদের স্ত্রী উন্মনা ও কিঙ্কিণীও তেমনি কান্তিমতী।

তাহাদের বাসা বাড়িটি স্প্যানিশ্-আমেরিকান ছাঁদের একতলা বাড়ি, তাহাকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগে উন্মেষ ও উন্মনা থাকে, অন্য ভাগে থাকে করঞ্জ ও কিঙ্কিণী। কেবল স্ত্রী-পুরুষের সংসার ; তাহারা বড় আনন্দে আছে। যেন পাশাপাশি খোপে জোড়ের পায়রা।

একদিন অপরাহ্ণে উন্মনা ও কিঙ্কিণী বাড়ির সংলগ্ন বাগানে বেড়াইতেছিল। বাগানটি ফুলে ফুলে ভরা। কিঙ্কিণীর ভারি বাগানের শখ, সে নিজের হাতে বাগানটি গড়িয়া তুলিয়াছে ; এ দেশের নানা জাতীয় মরসুমী গাছ তো আছেই, ভারতবর্ষ হইতে চাঁপা স্থলপদ্ম শিউলি প্রভৃতি গাছ আনাইয়া পুঁতিয়াছে। উন্মনার অত বাগানের শখ না থাকিলেও সে গাছপালা লতাপাতা ফুলফল ঘেরা পরিবেশ ভালবাসে। দু'জনেই প্রসন্নমনা, বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা, গড়ন-পেটেনও প্রায় একই রকম, বেশবাসও একই ধরনের। একই সংস্কৃতির ছাঁচে ঢালাই করা দু'টি প্ল্যাস্টারের মূর্তি।

বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে দু'জনে অলস কণ্ঠে লঘু বাক্যালাপ করিতেছে। আজ তাহাদের কোথাও যাইবার নাই ; গতকল্য মার্কিন দূতাবাসে একটা বড় গোছের পার্টি হইয়া গিয়াছে, নাচ-গান শেরি-শ্যাম্পেন চলিয়াছে। আজ বিশ্রাম। উন্মেষ ও করঞ্জ দুপুর বেলা লাঞ্চের পর কাজে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই। সাধারণত তাহাদের কাজকর্ম কিছু থাকে না, আজ বোধহয় হঠাৎ দূতাবাসে কোনও কাজ পড়িয়াছে।

আকাশে এরোপ্লেনের দূরাগত গুঞ্জন অনেকক্ষণ ধরিয়া শোনা যাইতেছিল, এখন দেখা গেল একটা ভাইকাউন্ট প্লেন পশ্চিম দিগন্তরেখার কাছে নিভৃতে অবতরণ করিল, তাহার ভ্রমর-গুঞ্জন ক্ষান্ত হইল। ওই দিকে এরোড্রোম আছে, নিয়মিত প্লেনের যাতায়াত হয় ; কিন্তু প্লেনগুলা শোরগোল করে না, চুপিচুপি আসে, চুপিচুপি যায়।

উন্মনা ও কিঙ্কিণী কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তারপর উন্মনা বলিল, 'কারা এল কে জানে।'

কিঙ্কিণী বলিল,—'যাদের ছুটোছুটি করে বেড়াতে ভাল লাগে তারাই এল, আর কে আসবে।'

উন্মনা হাসিয়া বলিল,—'তোর এক জায়গায় ভিত গেড়ে বসে থাকতে ভাল লাগে। সকলের তো তা নয়।'

কিঙ্কিণী বলিল,—'তা কি করব। এমন দেশ পেলে কি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে। শীত নেই, গরম নেই, পচা বর্ষা নেই; যেন মেঘদূতের অলকাপুরী।'

উন্মনা বলিল,—'আচ্ছা কিঙ্কিণী, তোর দেশের জন্যে মন কেমন করে?'

কিঙ্কিণী একবার স্নিগ্ধ চোখে বাগানের চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া কহিল,—'না ভাই, এই দেশটাই আমার নিজের দেশ বলে মনে হয়। বাংলা দেশে আমার কেই বা আছে, কেউ নেই। তবে যদি কেউ বাংলা দেশ থেকে জুঁই চামেলি জবা ফুলের চারা এনে দেয়, খুব ভাল লাগে।—তোর কি বাংলা দেশের জন্যে মন কেমন করে নাকি?'

উন্মনা মাথা নাড়িয়া বলিল,—'না। আমার মনে হয় পৃথিবীর সব দেশই আমার দেশ। ইচ্ছে করে নতুন নতুন দেশে ঘুরে বেড়াই।'

সহসা কিঙ্কিণী নাসা-পুট স্ফুরিত করিয়া বলিয়া উঠিল,—'উন্মনা! গন্ধ পাচ্ছিস? কাঁঠালী চাঁপার গন্ধ? নিশ্চয় ফুল ফুটেছে। আয় আয় খুঁজে দেখি।'

বাগানের এক কোণে কাঁঠালী চাঁপার ঝাড়। সেইদিকে যাইতে যাইতে কিঙ্কিণী হাসিমুখে বলিল,—'এক মাস পরে বকুল গাছে ফুল ধরবে। তখন যে কী মজা হবে! সারা বাগান বকুলের গন্ধে ভরে থাকবে—'

তাহারা কাঁঠালী চাঁপার ঝাড়ে লুকোনো ফুল খুঁজিতেছে, এমন সময় দূতাবাসের মোটর আসিয়া ফটকের সামনে থামিল। মোটর হইতে নামিল একা উন্মেষ। সাধারণত উন্মেষ ও করঞ্জ একসঙ্গে দূতাবাসের গাড়িতে বাসায় ফেরে, আজ উন্মেষকে একা ফিরিতে দেখিয়া উন্মনা ও কিঙ্কিণী তাহার দিকে অগ্রসর হইল। উন্মনা স্বামীকে প্রশ্ন করিল,—'একা যে! দ্বিতীয় ব্যক্তি কোথায়?'

উন্মেষের টেনিস-খেলা শরীরে একটি বেত্রবৎ নমনীয়তা আছে। সে নাটকীয় ভঙ্গিতে দুই বাহু তরঙ্গায়িত করিয়া বলিল,—'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—'

কিঙ্কিণী দ্রুতপদে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল,—'কি হয়েছে?'

উন্মেষ বাগানের ইতি-উতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিশ্বাস ছাড়িল,—'আহা, এমন সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে!'

কিঙ্কিণী তাহার টাই ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিয়া বলিল,—'শিগ্‌গির বল কি হয়েছে।'

উন্মেষ তখন বলিল,—'কি আর হবে, করঞ্জর বদলির হুকুম এসেছে।'

'অ্যা!' কিঙ্কিণীর মুখ পাংশু হইয়া গেল।

উন্মেষ বলিল,—'তাও কি কাছাকাছি! একেবারে পৃথিবীর ও-প্রান্তে।'

উন্মনা কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল,—'কোথায়?'

'লেনিনগ্রাডে। লৌহ-যবনিকার অন্তরালে।'

শুনিয়া কিঙ্কিণী টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, উন্মেষ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া পৃষ্ঠের উপর বাহুবেষ্টন পূর্বক অকপট অনুকম্পার স্বরে বলিল,—'There there, don't be upset darling. আমরা সবাই পদ্মপাতায় জল। কাল হয়তো আমার অষ্ট্রেলিয়ায় বদলি হওয়ার হুকুম আসবে।'

কিঙ্কিণী উন্মেষের কোটের বুকে মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বাষ্পবিকৃত স্বরে বলিল,—'না না, আমি যাব না—আমি যাব না—'

উন্মেষ উন্মনাকে চোখের ইশারা করিল; দু'জনে কিঙ্কিণীর দুই বাহু ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল, সোফায় শোয়াইয়া দিল। উন্মনা ত্বরিতে এক পেয়ালা গরম দুধে ব্রাণ্ডি মিশাইয়া কিঙ্কিণীকে খাওয়াইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া কিঙ্কিণী বলিল,—'ও কখন আসবে?'

উন্মেষ বলিল,—'এখনই আসবে। চার্জ বোঝানো, পাসপোর্টের ব্যবস্থা করা, কালকের প্লেনে সীট্ বুক্ করা, সব কাজ সেরে ফিরবে।'

'কালকের প্লেনে!'

'হ্যাঁ। দিল্লি থেকে জরুরী তার এসেছে, কালকেই তোমাদের বেরুতে হবে।'

কিঙ্কিণী সোফায় চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল, মাঝে মাঝে রুমাল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর করঞ্জ ফিরিল। ক্লান্ত ও বিমর্ষ মুখে কিঙ্কিণীর সোফার পাশে বসিতেই কিঙ্কিণী মাথা ঝাঁকানি দিয়া বলিল,—'আমি যাব না, যাব না, যাব না—'

করঞ্জ কিঙ্কিণীর হাত ধরিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে স্ত্রীকে এক রাজ্যের দূতাবাসে ফেলিয়া অন্য রাজ্যের দূতাবাসে বদলি হওয়া সম্পূর্ণ রাজনীতি-বিরুদ্ধ, ইহাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংকটময় হইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু কিঙ্কিণী

বুঝিল না, মাথা নাড়িয়া বলিল,—'আমি শীত সহ্য করতে পারি না, লেনিনগ্রাডে ভীষণ শীত ; সেখানে গেলে আমি শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে যাব।'

করঞ্জ আর-এক দফা বুঝাইবার উদ্যোগ করিল, কিঙ্কিণী বলিল,—'এক মাস পরে আমার বকুল গাছে ফুল ফুটবে। আমি যাব না, কিছুতেই যাব না।' বলিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল।

করঞ্জ হতাশ ভাবে উন্মেষ ও উন্মনার পানে চাহিল। উন্মেষ তাহাকে ঘাড় নাড়িয়া ইশারা করিল ; দুইজনে উঠিয়া গিয়া পাশের ঘরে দ্বার বন্ধ করিল। উন্মনা কিঙ্কিণীর শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

আধঘণ্টা পরে উন্মেষ দ্বার একটু ফাঁক করিয়া হাতছানি দিয়া উন্মনাকে ডাকিল। উন্মনা উঠিয়া গিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল, প্রশ্ন-কুতূহলী চক্ষে চাহিয়া বলিল,—'কত দূর ? সমস্যার সমাধান হল ?'

উন্মেষ বলিল,—দু'জনে পরামর্শ করে একটা রাস্তা বার করেছি। কিন্তু সব নির্ভর করছে তোমার উপর।'

'তাই নাকি ? প্রস্তাবটা কী শুনি।'

করঞ্জ প্রস্তাবটি প্রকাশ করিয়া বলিল। শুনিয়া উন্মনা চকিত চপল চক্ষে তাহাদের দু'জনের পানে চাহিল। কিছুক্ষণ চক্ষু নত করিয়া ভাবিল, তারপর হাসি-ভরা মুখ তুলিয়া বলিল,—'মন্দ কি ! একটা নতুন ধরনের অ্যাড্‌ভেঞ্চার হবে।'

করঞ্জ মহানন্দে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'উন্মনা, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তুমি যদি রাজী না হতে—'

উন্মনা অবাক হইয়া বলিল,—'রাজী হব না কেন ! আমার তো দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে ভালই লাগে।'

উন্মেষ বলিল,—'কিঙ্কিণীর কাছে প্রস্তাবটা তাহলে তুমিই কর, উন্মনা।'

'আচ্ছা।'—উন্মনা করঞ্জের পানে একটি সুস্মিত কটাক্ষপাত করিয়া চলিয়া গেল। উন্মেষ করঞ্জের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল ; দু'জনে প্রগাঢ় ভাবে শেক্-হ্যাণ্ড করিল।

উন্মনা ফিরিয়া গিয়া কিঙ্কিণীর কাছে বসিল,—বলিল, 'উঠে বোস্ কিঙ্কিণী, কথা আছে।'

কিঙ্কিণী নির্জীবভাবে বাহুতে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল। উন্মনা তখন

মৃদু কণ্ঠে তাহাকে প্রস্তাবটি শুনাইল। শুনিতে শুনিতে কিঙ্কিণীর চোখে মুখে সজীবতা ফিরিয়া আসিল, সে সোজা হইয়া বসিল। উন্মনা প্রস্তাব শেষ করিয়া বলিল,—'আমরা কে কার বউ এদেশে কেউ তা ভাল করে ঠাহর করতে পারে না। আমরা যেমন চীনে-জাপানীদের মুখের তফাত বুঝতে পারি না, ওদেরও সেই দশা। বেশি কথা কি, আমাদের নিজেদের অ্যামবাসেডর হরিআপ্পা সাহেব সেদিন আমাকে তুই বলে ভুল করলেন।—তাহলে কি বলিস? রাজী?'

কিঙ্কিণী আবেগভরে উন্মনার গলা জড়াইয়া গণ্ডে চুম্বন করিল, বলিল,—'রাজী।'

পরদিন সন্ধ্যাবেলা চারিজনে দূতাবাসের স্টেশনওয়াগনে চড়িয়া এরোড্রোমে উপস্থিত হইল। পাসপোর্ট দেখানো ইত্যাদি কর্ম নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইল।

প্লেন ছাড়িতে বিলম্ব নাই। উন্মেষ করঞ্জের পৃষ্ঠে সাদর চপেটাঘাত করিয়া বলিল,—'বঁ ভোয়াজ্।'

করঞ্জ বলিল,—'গুড বাই। বী গুড।'

কিঙ্কিণী ও উন্মনা পরস্পর আলিঙ্গন করিল। কিঙ্কিণী উন্মনার কানে কানে বলিল,—'পৌঁছে চিঠি দিস্।'

তারপর করঞ্জ ও উন্মনা বাহুতে বাহু জড়াইয়া প্লেনে গিয়া উঠিল। উন্মেষ ও কিঙ্কিণী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রুমাল নাড়িতে লাগিল।

হসন্তী

আইনের বাইরে

বনফুল

. . . .

খুব দুঁদে ডেপুটি ছিলেন বিশ্বম্ভর বাঁড়ুজ্যে। হামদো মুখ, গোল গোল ভাঁটার মতো চোখ, ভেড়ার শিঙের মতো গোঁফ। চিবুকের ঠিক মাঝখানে কালো আঁচিল একটা। আঁটসাঁট বলিষ্ঠ-গঠন ব্যক্তি। দেখলেই ভয় পেত সবাই। তিনি চাইতেনও যে সবাই ভয় পাক। কারো দিকে যখন চাইতেন, কটমট করে চাইতেন। তাঁর ধারণা পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই বোম্বেটে বদমাইশ, যত দূরে থাকে ততই ভালো। কারও সম্বন্ধে কোন দুর্বলতা ছিল না তাঁর। কেবল তাঁর

মেয়ে সুবি ছাড়া। তাঁর ওই মা-হারা মেয়েটাকে খুব ভালবাসতেন তিনি। সুবি তাঁর একমাত্র সন্তানও। ওকে কেন্দ্র করেই তাঁর সংসার। বাড়িতে দ্বিতীয় লোক ছিল না। তাই, যদিও তিনি আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না, তবু সুবিকে স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিলেন। তাঁকে তো সমস্ত দিন কাছারিতে থাকতে হ'ত, বাড়িতে ওকে দেখবে কে। গতানুগতিক পথ ধরে সুবি স্কুল থেকে ক্রমশ কলেজেও গেল! বিশ্বম্ভর মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন বি. এ পাশ করলে তাঁর বাল্যবন্ধু প্রমদাচরণ মুখুজ্যের ছেলে সমরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। সমরও মাতৃহারা এবং প্রমদার একমাত্র ছেলে। বেশ রাজযোটক মিল হবে ভেবেছিলেন বিশ্বম্ভর। এ-ও তাঁর গোপনে গোপনে অভিসন্ধি ছিল যে সমরকে ক্রমশ ঘরজামাই করে ফেলবেন। কিন্তু সব ভেস্তে গেল। সমর ছোকরা পণ করে বসল যে সে ডানাকাটা রাঙা পরী ছাড়া বিয়ে করবে না। সুবিকে তার মোটেই পছন্দ নয়, সে নাকি বিশ্বম্ভরের মতোই দেখতে। ডানাকাটা রাঙাপরী অবশ্য পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু স্নেহান্ধ প্রমদাচরণ তাই খুঁজে বেড়াতে লাগল ব্যাকুল চিত্তে। ছেলেকে ধমকে সুবির সঙ্গে যদি জোর করে বিয়ে দিয়ে দিত ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু তা হ'ল না, যা হ'ল তা মর্মান্তিক। সমর 'লভে' পড়ে এক কালো সুঁটকো কায়েতের মেয়েকে বিয়ে করে বসল। প্রেমে পড়লে চোখের দৃষ্টিই অন্য রকম হয়ে যায় হয়তো। ওই সুঁটকো কালো মেয়েটাকেই তার রাঙা পরী বলে মনে হতে লাগল। বিশ্বম্ভর গোঁড়া লোক, এ বিয়েতে তিনি যান নি। দিন সাতেক পরে প্রমদাচরণের সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হ'ল তখন তার দিকে কটমট করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "কেমন, শিক্ষা হয়েছে তো, রাসকেল!"— বলেই হনহন করে চলে গেলেন বিপরীত দিকে।

কিন্তু একই খড়্গ যে তাঁরও মাথার উপর উদ্যত হয়েছিল তা টের পান নি বিশ্বম্ভর। অনেকদিন পান নি। যখন পেলেন তখন আর চারা নেই, ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। সাধুচরণ যে এ কাণ্ড করতে পারে তা তাঁর স্বপ্নাতীত ছিল। কিন্তু আজকাল পরমাণুর যুগ, স্বপ্নাতীত ব্যাপারই ঘটছে সব।

গুরুচরণের পুত্র সাধুচরণ। গুরুচরণ জাতে মেথর। আধুনিক ভাষায় 'হরিজন'। গুরুচরণ আর বিশ্বম্ভর সমবয়সী। গুরুচরণই বোধহয় কিছু বড় ছিল। গুরুচরণকে বিশ্বম্ভরের বাবা ত্রিলোচন খুব স্নেহ করতেন। ছেলের মতোই। মেথর হলে কি হয়, গুরুচরণের মধ্যে এমন একটা নম্র শুচিতা ছিল

যাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। গুরুচরণের বিয়েও ত্রিলোচনই দিয়েছিলেন। বিশ্বম্ভরের বিয়ের অনেক আগে গুরুচরণের বিয়ে হয়েছিল। গুরুচরণের ছেলে সাধুচরণের যখন জন্ম হ'ল তখনও বিশ্বম্ভরের বিয়ে হয় নি। শিশু সাধুচরণ ত্রিলোচনের বাড়িতেই প্রায় সমস্ত দিন থাকত। বিশ্বম্ভরের মা তাকে খেতে দিতেন, দেখাশোনা করতেন। সাধুচরণের মা সমস্ত দিন কাজ করে বেড়াত। মিউনিসিপ্যালিটির কাজ তো ছিলই, অনেকের বাড়িতেও কাজ করতে সে। সন্ধ্যার সময় এসে ঘুমন্ত সাধুচরণকে বাড়ি নিয়ে যেত। ত্রিলোচনের সংসারে মানুষ হওয়াতে সাধুচরণও আর মেথরের ছেলে রইল না, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে গেল। একটু বড় হলে ত্রিলোচন তাকে মাইনর স্কুলে ভরতি করে দিলেন। প্রতি বছর ক্লাসে ফার্স্ট হ'ত, মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তিও পেল। তখন ত্রিলোচন তাকে পাঠালেন শহরে, বিশ্বম্ভরের কাছে। বিশ্বম্ভরের বাড়িতে থেকে খেয়ে সে সসম্মানে ম্যাট্রিকুলেশনটাও পাশ করলে। সে যখন ফোর্থ ক্লাসে তখন স্থবির জন্ম হয়। সাধুচরণই ওর স্থবাসিনী নাম রেখেছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে সে বৃত্তি পেয়েছিল। একটা ক্রিশ্চান কলেজে ভরতি হয়ে গেল কলকাতায়। সেখানেও সসম্মানে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল সে। সর্বভারতীয় আই. এ. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন আগে সে এখানে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছে। বিশ্বম্ভরের বাড়িতে প্রায় আসে। যখনই আসে তখনই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে। নিজের বাবারই মতো খাতির করে বিশ্বম্ভরকে। স্থবি সাধুদা বলতে পাগল। সাধুচরণ এলে সে যে কি করবে ভেবে পায় না। এই সাধুচরণ যে শেষটা এমন দাগা দেবে তা বিশ্বম্ভর কল্পনা করেন নি। হাই ব্লাড প্রেসারের রোগী তিনি, সাধুচরণের চিঠিটা পেয়ে তাঁর রগের শিরগুলো দপদপ করতে লাগল।

খুব বিনয় সহকারে সম্ভ্রমপূর্ণ চিঠিই লিখেছিল সাধুচরণ।

শ্রীচরণেষু,

আমি জানি আপনি খুব গোঁড়া এবং এ চিঠি পেয়ে খুব বিচলিত হবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও লিখতে বাধ্য হলাম, কারণ না লিখে উপায় নেই। আপনি স্থবাসিনীর বাবা, আপনাকে না জানিয়ে, আপনার আশীর্বাদ না নিয়ে আমি তাকে বিয়ে করতে ইতস্তত করছি। আপনাকে এ চিঠি লিখবার আগে স্থবাসিনীকে আমি জিগ্যেস করেছি, তার খুব মত আছে। সে বি. এ পাশ

করেছে, এ যুগের মেয়ে সে। সেকেলে সংস্কার আঁকড়ে থাকতে সে চায় না। জাতিভেদ চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। গুণ এবং কর্ম অনুসারেই জাতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেকালের জাতি-ভেদ একালে অচল। একালে নতুন নতুন জাতি সৃষ্টি হয়েছে। যারা চাকুরে তারা একজাত। ওদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ হয়েছে। অফিসাররা এক গোষ্ঠিভুক্ত, পুলিসরাও তাই, ডাক্তাররাও তাই, রেলের বাবুরাও তাই। যারা ব্যাবসা করে তারা আর-এক জাতের, যারা শিক্ষক তারা আবার আর-এক জাত। মিলিটারিতে যারা থাকে তাদের ক্ষত্রিয় বলতে পারেন, লেখাপড়া নিয়ে যাঁরা থাকেন তাঁরা ব্রাহ্মণ। প্রকৃত ক্ষত্রিয় এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণ বড় বেশী নেই। কারণ যে বিশুদ্ধ চরিত্র এবং তপস্যার জন্যে তাঁরা সেকালে সমাজে শ্রদ্ধার আসন পেতেন তা এ যুগে দুর্লভ। এ যুগে বৃত্তি বা পেশা অনুসারে নতুন নতুন জাতের সৃষ্টি হয়েছে। এ হিসেবে আমি আপনার স্বজাতি, কারণ আপনিও চাকুরিজীবী, আমিও তাই। আপনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আমি ম্যাজিস্ট্রেট। সুতরাং সুবিকে আমি যদি বিয়ে করি তাহলে তা অসবর্ণ বিয়ে হবে না। সুবি যখন খুব ছোট তখন থেকেই ওকে আমি ভালবাসি। আপনি যদি ওকে আমার বিবাহিতা পত্নী হবার অনুমতি দেন তাহলে আমাদের উভয়েরই জীবন সুখের হবে এবং আমি কৃতার্থ হব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার উত্তরের আশায় রইলাম। সামনা-সামনি এ বিষয়ে আলোচনা করতে সঙ্কোচ হল বলেই চিঠি লিখছি। আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। ইতি—

প্রণত

সাধুচরণ

বিনা মেঘে বজ্রপাত! খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন বিশ্বম্ভরবাবু। তারপর সুবি যখন কলেজ থেকে ফিরল তখন তাকে সাধুচরণের চিঠিটা দিয়ে বললেন—"ছোঁড়ার আস্পর্ধা দেখ্। এবার এলে ঢুকতে দিস নি বাড়িতে। দুধকলা দিয়ে কালসাপকে পুষেছিলাম আমরা—"

সুবি সবই জানত।

চিঠিখানা নীরবে পড়ে ফেরত দিলে।

"তোকেও বলেছিল লিখেছে—"

"হ্যাঁ। আমি ওঁকেই বিয়ে করব। আপত্তি কোরো না তুমি—"

"মেথরের ছেলেকে বিয়ে করবি ?"

"মেথর বোলো না, হরিজন বল।"

"আমি মেথরকে মেথরই বলব। ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে বলেই তোর চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, না ? ও সাধারণ মেথর থাকলে ওকে বিয়ে করতিস ?"

"ও সাধারণ নয়, ও অসাধারণ। ম্যাজিস্ট্রট যদি না-ও হ'ত তাহলেও ও অসাধারণ থাকত। তাহলেও ওকে আমি বিয়ে করতুম—"

বিশ্বম্ভরবাবুর গোল গোল চোখ দু'টি আরও গোল হয়ে গেল। নির্নিমেষে তিনি কন্যার মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

সুবি দৃঢ়পদে অন্য ঘরে চলে গেল।

তার পরদিনই চিঠির উত্তর দিলেন বিশ্বম্ভর।

সাধুচরণ,

তোমার স্পর্ধা এবং ধৃষ্টতার পরিচয় পাইয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। বামন হইয়া চন্দ্রে হাত দিবার লোভ সম্বরণ কর। আমি প্রাণ থাকিতে এ অনুমতি দিতে পারিব না। কিছুতেই না, কিছুতেই না। সুবি কিছুতেই তোমার পত্নী হইবে না, হইতে দিব না। ইতি—

বিশ্বম্ভর

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল সাধুচরণের।

শ্রীচরণেষু,

বড় আশা করেছিলাম যে বিবাহে আপনার আশীর্বাদ পাব। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তা পেলাম না। একটা জিনিস বোধহয় আপনি ভুলে গেছেন। সুবির বয়স একুশ পার হয়ে গেছে। আইনের চক্ষে সে এখন সাবালিকা। আপনার অনুমতি না নিয়েও সে আইনত আমাকে বিয়ে করতে পারে। সাত দিন পরে তাই হবে। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

প্রণত
সাধুচরণ

সাত দিন পরে সুবি বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করে বলল—"বাবা, আমি যাচ্ছি। উনি গাড়ি পাঠিয়েছেন। তুমিও চল না বাবা—"

"উচ্ছন্নে যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও—"

বোমার মতো ফেটে পড়লেন বিশ্বম্ভর। সুবি ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর যা হ'ল তা প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত দুইই। দড়াম করে পড়ে গেলেন বিশ্বম্ভর মেঝের উপর এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হ'ল তাঁর।

বিয়ের দলিলে সুবাসিনী সই করতে যাচ্ছে, কলমটা তুলেছে, এমন সময় অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেল একটা।

"এ কি বাবা, ছাড় ছাড়, হাতটা ছাড়, বড় লাগছে যে—" কলমটা তার হাত থেকে পড়ে গেল। অফিসের অন্য সবাই অবাক হয়ে গেল, কারণ কেউ কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিল না।

তারপর যা হ'ল তা আরও অদ্ভুত।

দড়াম করে পড়ে গেল সুবি অফিসের মেঝের উপর। তার এক গোছা চুল কেবল শূন্যে উঠে রইল। মনে হতে লাগল কে যেন তার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

"বাবা—বাবা—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—"

কিন্তু রেহাই পেল না সে। হড় হড় করে কে যেন তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। সাধুচরণ তাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। যে টানছে তাকে দেখতেও পেল না।

বড় রাস্তার উপর টানতে টানতে নিয়ে এল সুবিকে। তারপর ছুঁড়ে দিল তাকে একটা ছুটন্ত লরির সামনে। নিমেষের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সে।

দুরবীন

উপকার বিফলে যায় না

মনোজ বসু

. . . .

চাকরির খোঁজ এল। নাম-করা ফার্মের রিসেপসনিস্ট। বিদেশি কোম্পানি, মাইনে খারাপ দেবে না। খাটনিও কিছু নয়—সাজগোজ করে বসে থাকা, আর মিষ্টি কথা বলা আগন্তুকের সঙ্গে। কাজ কিছু কর আর না কর, মুখের হাসিটা চাই।

খোঁজ এনে দিল উর্মির বান্ধবী অলকা। টাইপিস্ট সে ঐ অফিসের। উর্মি বলে, ওই তো সবচেয়ে কঠিন কাজ আমার কাছে। হাসতে ভুলে গেছি। কটু বিষে মন জ্বলে, মিষ্টি কথা ঠোঁটে আনব কি করে? আর সাজগোজের কথা বলছিস, রূপ থাকলে তবে তো সাজ! একটু-আধটু যা আমার ছিল, পুড়েজ্বলে গেছে। সাজ তোকেই মানায়।

দাগা পেয়েছে জীবনে, আপনজন পেলে এমনিধারা বকবক করে। দরখাস্ত একেবারে টাইপ করে নিয়ে এসেছে অলকা। তাড়া দিয়ে উঠল : সই করতে বলছি, তাই কর। রূপের জন্য আজকাল বিধাতার মুখ চাইতে হয় না। নানান রকম জিনিস বেরিয়েছে বাজারে—নিজেরাই রূপ বানিয়ে নিতে পারি। ডাকুক ইণ্টারভিউয়ে। আমি সেদিন এসে সাজগোজ করে দেব।

ইণ্টারভিউয়ের দিন—উঃ, এত সুন্দর সুন্দর মেয়ে বেকার! হলঘর ভরে গেছে। সেক্রেটারি শহরে নেই, শোনা গেল অ্যাসিস্ট্যাণ্টের উপর ভার, জন-পাঁচেক তিনি বাছাই করে রাখবেন। সাহেব দিল্লি থেকে ফিরে তাদের ভিতর থেকে নিয়ে নেবেন। কিন্তু কোন বিচারে কাকে যে বাদ দেবে, উর্মি ভেবে পায় না। যার দিকে তাকায়, নজর ফেরে না। কী উজ্জ্বল! কথাবার্তায় ও চালচলনে বিদ্যুতের চমক। আগে বুঝতে পারে নি, কখনো তাহলে এমন প্রতিযোগিতায় আসত না।

একে একে ডাক পড়ছে, ইণ্টারভিউ হয়ে ভিন্ন দরজায় বেরিয়ে যাচ্ছে তারা। আরম্ভ হয়েছে ঠিক এগারটায়। দেড়টায় একঝোঁক বন্ধ হয়ে আড়াইটা থেকে আবার চলছে। এখন চারটে বাজে, উর্মিকে তবু ডাকে না। এরই মধ্যে আলমারির কাচে একবার নিজের প্রতিবিম্ব দেখল। সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ! অলকা যথাসাধ্য সাজিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই পাঁচ ঘণ্টায় রূপের গুঁড়ো ঝরে গিয়ে আদি চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। এ চাকরিতে চেহারাই হল আসল—সরে পড়বে নাকি টিপিটিপি? কিন্তু পুল থেকে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়া অথবা রেলের পাটিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়া ছাড়া আর যে কোন নিশ্চিন্ত জায়গা মনে পড়ে না।

অবশেষে ডাক এল। নাগেশ নয়? নাগেশ এই ফার্মে এসে জুটেছে, সে ইণ্টারভিউ নিচ্ছে। হায় বিধাতা! ক্ষীণতম আশাটুকুও ফুস করে এক লহমায় নিভে গেল। কামরার মধ্যে সে আর নাগেশ। কড়া কিছু

বচন শোনাবে বিদায় করবার আগে? টাকা ফেরত চাইবে দশ বছরের সুদ সমেত।

একটি পলক। পলকের মধ্যে দশটা বছর পিছিয়ে চলে যায়। নাগেশ পাগল তখন উর্মিকে নিয়ে। শত কাজ ফেলে গেটে দাঁড়িয়ে থাকে অফিসের ছুটির সময়টা। দু-জনে বেরিয়ে পড়ে। অনেক দূর চলে যায়—এক-একদিন সেই ঘুঘুডাঙার বাগানে। কোন বড়লোক বাগান-বাড়ি বানিয়েছিল। এখন সাপ-শিয়ালের আস্তানা। কিন্তু পুকুরঘাটের ভাঙা চাতালের উপর পা ছড়িয়ে বসে দু-জনে চিনাবাদাম খাবার পক্ষে জায়গাটা উপাদেয়। নাগেশ এম. এ. পাশ করে এক কলেজে ঢুকেছে। প্রিন্সিপ্যাল আপন মামা। তাঁরই জোগাড়ে ঢুকতে পেরেছে। অধ্যাপনার কাজ—টাকাকড়ি না হোক, অতিশয় সাধু বৃত্তি। খাতির-সম্মান খুব।

নাগেশ গড়গড় করে ভবিষ্যতের সুখ-শান্তির কথা বলে, বাদাম খেতে খেতে উর্মি হুঁ-হাঁ দিয়ে যায়। একদিন দেখা গেল উর্মির মুখ ভার। হাসে না, কথা বলে না। জোর করে মুখের আঁচল সরাতে গেল তো চোখে জল।

কি—কি হয়েছে?

বলবে না কিছু। নাগেশও নাছোড়বান্দা। যা কোনদিন করে না—আবেগের মাথায় হাত ধরে বসল উর্মির।

অগত্যা বলতে হয়। মেজবউদিরা বড়লোক। সত্যিকার বউদি নয়, প্রতিবেশী। তাঁর জড়োয়া নেকলেশ পরে বিয়েবাড়ি গিয়েছিল। নেকলেশ চুরি গেছে। স্বার্থপর জঘন্য মেয়েমানুষ মেজবউদি। স্বামীটাও গোঁয়ারগোবিন্দ। গয়না ফেরত না পেলে রক্ষে রাখবে না।

আত্মহত্যা করতে না হয়। তাছাড়া আর উপায় দেখি নে।

আজকের দিনটা উর্মি যা-হোক বলে ঠেকিয়ে এসেছে: নেকলেশ বাক্সের ভিতর, বাক্সের চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। নেকলেশ হারানোর কথা বলতে সাহস হয় নি, বলেছে চাবি হারিয়েছে। মেজবউদি সন্দেহ করেছে তবু। আজকের ভিতর চাবি পাওয়া না গেলে তালা ভেঙে বের করে দিতে হবে। সকালবেলা গয়না তার চাই-ই।

উর্মি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

নাগেশ ত্রস্ত হয়ে বলে, চোরে নিয়েছে, কোথায় এখন চোর খুঁজে বেড়াব? সোজাসুজি বরঞ্চ দামের কথা বলে দেখ।

ঊর্মি বলে, পাঁচ-শ টাকায় সেদিন মাত্র কিনেছে। আমি সঙ্গে ছিলাম। টাকাটা পেলে হয়তো ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু মাসের শেষে এখন পাঁচ-শ কি—পাঁচটা টাকাও তো জোটানো দায়।

নাগেশ একটুখানি ভেবে বলে, কালকের দিনটাও সময় নিয়ে নাও—সন্ধ্যা অবধি। আমি আসব এমনি সময়ে।

ঊর্মির জল-ভরা চোখে চিকচিকে হাসি। কত ভাল ঊর্মি! অনেক রাতে নাগেশ বাসায় ফিরল। তখন সে নিশ্চিত বুঝেছে, ঊর্মি আত্মহত্যা করলে তাকেও পিছন পিছন যমালয় অবধি ধাওয়া করতে হবে।

পরের দিন এক-শ টাকার পাঁচখানা নোট এনে ঊর্মির হাতে দিল। ঊর্মি বলে, যাই, মুখের উপর ছুঁড়ে দিইগে মেজবউদির। সবুর সইছে না। কী কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে! সংসারে টাকাটাই চিনেছে কেবল, টাকা ছাড়া আর কিছু জানে না।

নাগেশ অন্যমনস্ক। এক কথার জবাবে অন্য কথা বলে বসে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায়: আজকে যাচ্ছি। হাঙ্গামাটা মিটল কিনা, তার জন্য মন ব্যস্ত থাকবে।

ঊর্মি হেসে গলে পড়ছে। বলে, কাল নয়, পরশুও নয়—দুটো দিন কামাই করব। শুক্কুরবারে এস তুমি নাগেশ। নিশ্চয় এস। তোমার এত বড় ঋণ কেমন করে শোধ হবে, তাই ভাবছি।

ম্লান হেসে নাগেশ বলে, ভাল করে ভেবে এস এই দুটো দিনে। সাধুফকির আমি নই—শোধ চাই নে, প্রাণ ধরে এমন কথা বলতে পারব না।

শুক্রবারে গিয়েছিল নাগেশ। সেদিনও ঊর্মি অফিস করে নি। তখন চলে গেল বাগানবাড়ি—তাদের সেই ভাঙা চাতালে। সেখানে যদি আসে। মশাও যেন মতলব করে দলবদ্ধ হয়ে লেগেছে। গির্জার ঘড়িতে দশটা বাজলে হুঁশ হল, আর যুবতী মেয়ে আসতে পারে না।

তারপরে বিষম বিপাক। য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষার ফরম পূরণ করিয়ে ফী নেবার ভার নাগেশের উপর। তার মধ্যে ঐ পাঁচ-শ টাকা জমা দেয় নি। বন্ধুবান্ধবের কাছে হাওলাত-বরাত করে শেষ তারিখের মধ্যে দিয়ে দেবে ভেবেছিল। ঊর্মি আত্মহত্যার কথা বলে—ভাবনার কিছু ছিলও না তার

উপরে। কিন্তু হাওলাত কেউ দিল না। কমিটির কানে উঠল। অধ্যাপক মানুষের পক্ষে সাংঘাতিক অপরাধ। প্রিন্সিপ্যাল মাতুলমশায় টাকাটা নিজে থেকে দিয়ে কোনরকমে আদালতের অপমান থেকে বাঁচালেন। চাকরি গেল।

এর মধ্যেও নাগেশ অনেকবার উর্মির অফিসের গেটে এসে দাঁড়িয়েছে। শেষটা একদিন ভিতরে ঢুকে গেল। চাকরিটা পাকা নয়; তার উপরে বিনা খবরে মাসদেড়েক একটানা কামাই—ধরে নেওয়া যেতে পারে, নেই তার চাকরি। বাড়ির ঠিকানাও জানা গেল না। দারুণ অভাবের মধ্যে ছিল—নাগেশ কতবার ভেবেছে, সত্যি সত্যি আত্মহত্যাই করল বা! কতদিন নিশ্বাস ফেলেছে!

আসলে কিন্তু নাগেশের মুখোমুখি হবার ভয়। পাছে দেখা হয়ে যায়, সেই ভয়ে উর্মি অফিস কামাই করত। পাঁচ-শ টাকা নিয়ে সেদিন সোজা সে গেল হিরণ্ময়ের কাছে। বিলাত যাবে হিরণ্ময় বিজনেস-ম্যানেজমেণ্টের ডিপ্লোমা নিতে। চিঠিপত্র লিখে ভর্তি হয়েছে। পাশপোর্ট তৈরি। গিয়ে পড়লে ইণ্ডিয়া-হাউসে ধরে-পেড়ে কাজ একটা জুটিয়ে নেবেই। সে আত্মবিশ্বাস আছে। মুশকিল, জাহাজ-ভাড়ার জোগাড় হচ্ছে না।

তাই একদিন নিশ্বাস ফেলে বলল, কেরানিগিরিতে জীবন কাটবে। বুড়ো বয়সে দেড়-শ টাকা। ঘরসংসার-স্ত্রী-পুত্র অদৃষ্টে নেই। একলা উপোস করতে পারি, কিন্তু উপোসের ভাগ নেবার জন্য অন্যকে আনি কোন্ বিবেচনায়?

তারপর উর্মি টাকা এনে দিল। হিরণ্ময় অবাক হয়ে বলে, দিচ্ছ আমায়?

উর্মি বলে, তুমি চাইলে প্রাণ অবধি দিয়ে দিতে পারি। এ তো কয়েকটা টাকা।

হিরণ্ময় গদগদ হয়ে বলে, টাকা নয়। দু-জনে আমরা স্বর্গ রচনা করব, সেখানে উঠবার সিঁড়ি।

আবার বলে, আশার অতীত এনে দিলে তুমি। তবু হয় না। আমি অপদার্থ—দু-শ মাত্র জোটাতে পেরেছি। বেশি হবে কোথা থেকে? মাস গেলে যে ক'টি টাকা দেয়, তোমার কাছেও তা বলতে পারি নে। বিদেশ-বিভুঁয়ে শূন্য হাতে ওঠা যায় না। একটি হাজার অন্তত। তোমার টাকা এখন রেখে দাও উর্মি। এই সেসানে হবে না। পরের সেসান ছ-মাস পরে, তখন চেষ্টা করব।

আবার ছ-মাস? রক্ষে কর—

ঊর্মি টিপিটিপি হাসছিল এতক্ষণ। আঁচলের তলা থেকে গয়নার কৌটা বের করল। বলে, এটা বেচলে শ-চারেক হয়ে যাবে।

নেকলেশ। হিরণ্ময় অবাক হয়ে বলে, এমন জিনিসটা পরতে কোনদিন তো দেখলাম না।

আনকোরা নতুন দেখছ না? একজনে উপহার দিল আমায়।

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে ওঠে: না গো, মুখ ভারী করতে হবে না। কে আমায় দিতে যাবে! যা-কিছু দেবার তুমিই দিও বিলেত থেকে ফিরে এসে। নেকলেশ মেজবউদির। পছন্দ করে নতুন কিনেছে। মামাতো বোনের বিয়েয় আমি পরে গেলাম। নিপাট ভালমানুষ মেজবউদি, মেজদাও তেমনি। মানে নিরেট বোকা। হারিয়ে গেছে বলতে অমনি তাই বুঝে নিল।

হিরণ্ময় ইতস্তত করে। বলে, চুরি করা হল যে!

ঊর্মি সায় দেয়: তা সত্যি। চোর আমি তোমারই জন্যে। মেজবউদির কাছে পাপী হয়ে রইলাম। ফিরে এসে তুমি পাপ মোচন করে দিও।

ঘাড় নেড়ে হিরণ্ময় বলে, নিশ্চয় করব। তখন এ দুঃসময় থাকবে না। কোন একটা অজুহাত করে বউদিদিকে নেকলেশ গড়িয়ে দেব। ডবল দামের নেকলেশ।

দু-জনে সামনাসামনি বসে কত গল্প! দেড় বছর কি বড় জোর দুটো বছর —দেখতে দেখতে কেটে যাবে। বম্বে পৌঁছেই চিঠি দেব। এডেন থেকে আর একটা, আলেকজাণ্ড্রিয়ায় গিয়ে আবার। জেনোয়ায় পৌঁছে মস্তবড় খামের চিঠি। সারা পথ চিঠি ছাড়তে ছাড়তে যাব ঊর্মি।

কিন্তু একটা চিঠিও আসে নি দশ বছরের ভিতর। একটা খবরও নয়। নাগেশের সামনে দাঁড়িয়ে পলকের মধ্যে পুরানো কথা মনের উপর তরঙ্গ খেলে যায়। নাগেশ একদৃষ্টে তাকিয়ে। ভাল করে চিনে নিচ্ছে। এতকাল পরে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে— হুঙ্কার দিয়ে উঠবে? কিংবা ঘৃণায় কথা না বলে বেরিয়ে যাবার দরজা দেখাবে?

অতি সহজভাবে নাগেশ বলল, বসুন। (শোন, ঊর্মিকে আপনি বলে আজ নাগেশ!) ঊর্মির দরখাস্তটা দেখে খসখস করে কি লিখে যাচ্ছে ফাইলের পৃষ্ঠায়। মুখ তুলে তারপর বলে, বাঁ-দিককার ঘরে গিয়ে বসুন। খবরটা জেনে যান একেবারে। মিনিট পনেরোর ভিতর নাম পাঠাব।

অতএব সেই ঘরে গেল উর্মি। আরও সব আছে, নাগেশের নিন্দেমন্দ করছে তারা : বিশ্বসংসারের যাবতীয় প্রশ্ন—জবাব নিজেই বড় জানে কিনা! সুযোগ পেয়েছে তো বিদ্যে ফলাতে ছাড়বে কেন? কিন্তু উর্মিকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে নি নাগেশ। 'আগে দর্শনধারী, তারপরে গুণ বিচারি'—নজরে দেখেই হয়তো প্রশ্ন করা বাহুল্য মনে করেছে।

কেরানিবাবু এসে নাম পড়ছেন। কী আশ্চর্য, কানে শুনেও বিশ্বাস হয় না—প্রথম নাম উর্মি।

বড় দোকানের কাচের জানলায় উর্মি ঘুরে ঘুরে সাজানো জিনিসপত্র দেখছে। নাগেশ বেরিয়ে আসতে দ্রুতপদে কাছে গেল।

আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। লিস্টে আমার নাম দিয়েছেন।

নাগেশ বলে, সকলের উপরে।

কী যে উপকার করলেন আমার!

ট্রাম ধরতে যাচ্ছিল নাগেশ। থমকে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে সহজভাবে বলে, কিছু না, কিছু না। এ নামটা না দিয়ে ওই নাম বসানো। কিন্তু সেবারের উপকারের ধাক্কায় শ্রীঘরে নিয়ে তুলছিল। মামা বাঁচিয়ে দিলেন। সে যাকগে। শেষরক্ষা হলে হয়। কড়া সাহেব আমাদের সেক্রেটারি। ভাল উচ্চারণে ইংরেজিতে তড়িঘড়ি জবাব দেবেন। তবু কী হয় বলতে পারি নে। আচ্ছা—

তড়াক করে লাফিয়ে সে চলতি ট্রামে উঠে পড়ল।

দিন দশেক পরে সেই মোক্ষম পরীক্ষা। সেক্রেটারি সাহেবের খাসকামরায়। দরজা-জানলা-আঁটা এয়ারকণ্ডিসণ্ড ঘর। কিন্তু ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যেই কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। দুটো ইংরেজি কথা পাশাপাশি জুড়তে জিভ জড়িয়ে যায়, কী ইংরেজি জবাব দেবে সাহেব মানুষের কাছে!

সাহেব আঙুল তুলে চেয়ার দেখিয়ে দেয়। চেয়ার কী—যেন জলহস্তী হাঁ করে আছে। গদির মধ্যে চক্ষের পলকে তাকে গিলে খেয়ে ফেলল।

সাহেব মানুষ উর্মিকে অবাক করে দিয়ে বাংলা কথা বলে ওঠে : চাকরি আপনারই হবে। ওই চারজনকে ডেকে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করে বাতিল করে দেব। মিনিট দুয়েক বসে যান। ভয়ানক রকমের পরীক্ষা দিচ্ছেন, বাইরের ওরা ভাবুক।

হাসল একটু ঠোঁটের হাসি। আর চিনতে বাকি থাকবে কেন? হিরণ্ময় পুরাদস্তুর সাহেব এখন, এবং এত বড় ফার্মের সেক্রেটারি। হঠাৎ ঊর্মির পুরানো নীতিবাক্য মনে আসে: উপকার কদাপি বিফলে যায় না। হিরণ্ময়ের বিলাত যাওয়ায় সাহায্য করেছিল—ফল এই দশ বছর পরে।

চাকরির প্রথম দিন নাগেশ এক সময়ে ঊর্মির টেবিলে হাজির।

অভিনন্দন জানাতে এলাম।

আপনিই তো এর মূলে।

হেন ক্ষেত্রে না-না বলে বিনয় দেখানো রীতি। নাগেশের তা নয়। ঘাড় নেড়ে সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, তা ঠিক। গোড়াতেই যদি ঝেড়ে ফেলতাম—সে ক্ষমতা ছিল আমার—তা হলে সাহেব অবধি পৌঁছতে হত না। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় আসছে না—

ঊর্মি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

নাগেশ বলে, মাইনে দেড়-শ বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। কলমের খোঁচায় সাহেব আড়াই-শ করে দিলেন। উনি যা করবেন, ডিরেক্টররা চোখ বুঁজে মেনে নেবে। কিন্তু এমন কখনও হয় না। কোম্পানির টাকা ওঁরই যেন বুকের পাঁজরা। এইবারে কেবল এই আপনার বেলা দেখছি—

ঊর্মি কৌতুক-দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, কী মনে হয় আপনার?

আগের জানাশোনা নাকি?

আমার কাছে উপকার পেয়েছিলেন এক সময়ে।

দেখলেন? নাগেশ বিগলিত হয়ে উঠল: মানুষ এমনি-এমনি বড় হয় না। ওঁর জন্যে কবে কী করেছিলেন, মনের মধ্যে গেঁথে রেখে এতদিনে তার শোধ দিলেন।

একটু থেমে ঢোঁক গিলে নিয়ে বলে, উপকার আমিও তো করি। উপকারের দায়ে সেবারে ধরুন জেলে যেতে বসেছিলাম।

বুকের মধ্যে দুলে ওঠে ঊর্মির। বছর দশেক আগে দু-জনাই কমবয়সি—সেই আমলের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পায়। বলে, কী করতে পারি বলুন। প্রাণ দিয়েও আপনার ঋণের যদি শোধ হয়—

নাগেশ ইতস্তত করে: প্রাণ কেন দিতে হবে? মানে—

ঊর্মি অধীর কণ্ঠে বলে, বলুন না—

দেখুন, ফার্স্টক্লাস এম. এ আমি। পাচ বছর পড়ে আছি, মাইনে কুল্যে এক-শ আশি। অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা, কুলিয়ে ওঠা যায় না। সাহেবকে যদি বলেন একটু আমার কথা! মানে, এক্ষুনি নয়, ধীরেসুস্থে সময় বুঝে—

একটুখানি স্তব্ধ থেকে উর্মি হাসল : সে কী কথা! নিশ্চয় বলব। উপকার বিফল হয় না। আমার বেলা হয় নি, আপনারই বা হবে কেন?

হিরণ্ময়কে বলবে কি না বলবে, সে হল পরের ভাবনা। রিসেপসনিস্ট মেয়ে —হাসতে হবে। সেজেগুজে হেসে হেসে মিষ্টি কথা বলা তার চাকরি। এই পয়লা দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল।

মায়াকন্যা

আ ঘ্রা ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

. . . .

ঝড়ের বাড়িখাওয়া পথহারা পাখির মতন মেয়েটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মেঝের উপর ব'সে পড়ল না, দাঁড়িয়ে রইল, তাও দেয়ালের কোণ ঘেঁষে নয়, মুখোমুখি টেবিলের ধারটিতে।

টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে কি-একটা লিখছিল নীলাঞ্জন, মুখ তুলে চেয়ে বললে, 'কি চাই?'

কি চাই! এ প্রশ্নের কে উত্তর দিতে পারে! দ্বিধায় দুলতে লাগল মেয়েটা।

'কোনো চাকরিবাকরি?'

মেয়েটা কথা কয় না।

'কোনো সাহায্য-টাহায্য? চাঁদা? কোনো ফাংশানের টিকিট?'

এত কথার উত্তর দিতে হ'লে বসতে হয়, বিস্তৃত হ'তে হয়। দাঁড়িয়ে থাকাটা কেমন ভালো দেখায় না।

কিন্তু যার কাছে এসেছি তিনি যদি বসতে না বলেন তো বসি কি ক'রে? বসতে বলবেন এমনও তো মনে হয় না। নিচু হ'য়ে আবার লেখায় মন দিয়েছে নীলাঞ্জন।

কিন্তু উদ্যোগ করতে দোষ নেই। উদ্যোগ ছাড়া কিছু হবারও নয়। মেয়েটা শব্দ ক'রে চেয়ার টানল। বসল নিজের থেকে।

তবু ও-পক্ষে কিছুমাত্র উদ্যোগ আছে ব'লে মনে হয় না। অনুমতি ছাড়া সশব্দে অমনি চেয়ার টেনে ব'সে পড়াটা নিশ্চয়ই অভদ্রতা। যেমন জাঁদরেল রাগী লোক ব'লে নামডাক, নিশ্চয়ই রুখে উঠবে। আসলে এই ঔদাসীন্য এই অনারম্ভও তো একরকমের রুক্ষতা। কিন্তু প্রতিপক্ষ একটু রুক্ষ না হ'লেও আনন্দ নেই। যে রূঢ় তার নম্রতা না জানি কত সুন্দর! যে কৃপণ তার না জানি অজস্রতা!

মেয়েটা অস্ফুট স্বরে বললে, 'আমাকে নকুলবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'কে নকুলবাবু?' প্রায় গর্জন ক'রে উঠল নীলাঞ্জন।

কে নকুলবাবু তাও বুঝিয়ে বলতে হবে? চারদিকে কোথাও একটা চাপরাসি-আর্দালি দেখা গেল না। এ কোথায় এসে উঠলাম!

'শহরে বত্রিশটা নকুলবাবু আছে। কে তোমার মুরুব্বি তা খুলে না বললে বুঝি কি ক'রে? আমি কি সর্বজ্ঞ?'

এত কষ্টেও একটু হাসল মেয়েটা। বললে, 'মোক্তার নকুলবাবু।'

'কেন, কোনো কেস-সংক্রান্ত বুঝি? তিনি গেলেন কোথায়?'

'আমাকে পৌঁছে দিয়েই চ'লে গেছেন।'

'এই ভরসন্ধেবেলায়? একা-একা?'

উলটো ক'রে বুঝল মেয়েটা। বললে, 'সঙ্গে গাড়ি আছে।'

'গাড়ি? এই মফস্বল শহরে মোক্তারের আবার গাড়ি কোথায়?'

'ঘোড়ার গাড়ি।'

'এখনো আছে নাকি এ শহরে? সাইকেল রিক্‌শার ঠেলায় উঠে যায় নি?'

'একখানা আছে।'

'তাতে ক'রে মক্কেল পৌঁছে দিয়েই কেটে পড়ল?' নীলাঞ্জন মোটা চুরুট ধরাল: 'মক্কেলকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে উকিল-মোক্তারই ঘরে ঢোকে শুনেছি। এ যে দেখি বিপরীত। মক্কেলকে পৌঁছে দিয়ে মোক্তারেরই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা। কি কেস? ম্যাট্রিমনিয়েল?' মুখের উপর স্পষ্ট চোখ ফেলল নীলাঞ্জন।

'এখনো হয় নি বিয়ে।' চোখ নামাল মেয়েটা।

মাথার দিকে তাকাল নীলাঞ্জন। মাঠের মাঝখান দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথের মতো শাদা সিঁথি। বললে, 'তবে কি অন্য জাতীয় ?'

'তেমন কোনো কেস নয়—'

'কেস নয় মানে ? মোক্তার মানেই মকদ্দমা। মোক্তার মানেই জামিন-নামা। মকদ্দমা তো কোর্টে না গিয়ে এখানে কেন ?'

এখানে কেন ? তবে কি আমার কোনো ভুল হয়েছে ? ভুল বাড়িতে এসেছি ? আমি এলুম কোথায় ? আমাকে তো নিয়ে এল !

মুখ ম্লান ক'রে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল মেয়েটা। বললে, 'আমার কি ভুল হয়েছে ?'

'নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে।' প্রায় হুমকে উঠল নীলাঞ্জন।

'এটা কি তবে হালদারসাহেবের কুঠি নয় ?'

'শহরে এ কে না জানে ?'

'আর আপনিই—'

'হ্যাঁ, আমিই। মাতাল, লম্পট, দুশ্চরিত্র —শোন নি আমার সম্বন্ধে ?'

যেন সহজে নিশ্বাস ফেলল মেয়েটা। বললে, 'শুনেছি।'

'সেদিক দিয়ে কিছুই ভুল হয় নি। ভুল হচ্ছে তোমাকে নিয়ে।'

'আমাকে নিয়ে ?' কেমন অস্থির হ'য়ে উঠল মেয়েটা। এপাশ ওপাশ তাকাতে লাগল।

'নিজের সম্বন্ধেই তোমার স্পষ্ট ধারণা নেই। তোমাকে এখানে কেউ নিয়ে আসে নি, তুমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছ।'

ও, এই কথা। একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বসল মেয়েটা।

'তোমার উকিল-মোক্তার লাগবে কেন ? তুমি নিজেই তোমার জবানবন্দি, নিজেই তোমার সওয়াল-জবাব। কি, ঠিক নয় ?'

'ঠিক।'

'তুমি কিডন্যাপিঙের বয়সের মধ্যে আর পড় না। সে সীমা তুমি অনেকদিন ছাড়িয়ে এসেছ। তা ছাড়া, তুমি যদি নিজের থেকে এখানে না আস সাধ্যি কি তোমাকে কেউ জোর ক'রে নিয়ে আসে ?'

'বা, আমি নিজের ইচ্ছেতেই তো এসেছি।' চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত ক'রে ধরল মেয়েটা।

'তবে বলছিলে কেন নকুলবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন ?'

'কি ভাবে বললে বুঝতে পারবেন তারই জন্যে অমনি ক'রে বলা।' মেয়েটা মাথা নিচু করল : 'একটা পরিচয়পত্র—'

'বেশ, তবে যাও পাশের ঘরে।'

পাশের ঘর! যেন কত রাজ্যের পথ, কত দিগন্ত পেরিয়ে সে দুর। একটা পর্দার তো মোটে ব্যবধান। তবু মনে হ'ল অন্তরালে কি যেন আতঙ্ক রয়েছে ওত পেতে।

ভয়ের কিছু আছে ব'লে তো শোনে নি। সকলের থেকে আলাদা হ'য়ে একা-একা থাকে হালদার। স্ত্রীর থেকে আলাদা, ছেলের থেকে আলাদা। দুর্গম অরণ্যে ক্লান্ত, পরিত্যক্ত পর্বত। ভিতর থেকে ক্ষয় হ'তে-হ'তে কি মূর্তিতে বিদীর্ণ হয় ঠিক কি।

নিজের ইচ্ছেতেই যেতে হবে। পা বাড়াল মেয়েটা।

যাবে, শেষ পর্যন্ত যাবে। ভয়ও তো একটা আশ্চর্য রোমাঞ্চ।

'যাও, লুকোও, বেশিক্ষণ থাকতে হয় না আপিসঘরে।' তাড়া দিল নীলাঞ্জন।

এই বুঝি ড্রয়িংরুম। সব সুন্দর ক'রে সাজানো-গোছানো। নম্রাভ আলো জ্বলছে স্ট্যাণ্ডে। কিন্তু আশেপাশে কোথাও এতটুকু হাঁটাচলা নেই, কথাবার্তা নেই। স্তব্ধতা যেন ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে চারদিক থেকে।

লম্বা সেটির এক কোণে বসল মেয়েটা।

কিন্তু কতক্ষণ এমনি ব'সে থাকবে? সেও কি কার্পেট, কৌচ, এই সব আসবাবপত্রেরই একজন? তারও কি সুখদুঃখ নেই, ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই, আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই?

আপিসঘরের দরজাটা বন্ধ হ'ল শব্দ ক'রে।

এক গাছ পাখি থরথর ক'রে কেঁপে উঠল, আকাশ কালো ক'রে ঝড় আসছে। পারের কাছে নদীর জল কুলকুল ক'রে উঠেছে, শাদা চাদর উড়িয়ে এল বুঝি অমাবস্যার কোটাল।

এবার আসবে নীলাঞ্জন।

'পরিচয়পত্র?' বলতে-বলতে ঘরে ঢুকল নীলাঞ্জন : 'ফাঁকা সন্ধ্যায় চুপচাপ একা ব'সে আছি, তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে, জিগ্‌গেস করলুম, কে, তুমি ব'লে উঠলে, আমি—এই কি যথেষ্ট পরিচয় নয়?' ঘরে পা দিতেই যেন চমকে উঠল, 'এ কি, তুমি? এখনো ব'সে আছ?'

'ব'সে আছি।' নিরুপায়ের মতো শোনাল কথাটা।

'কার জন্যে ব'সে আছ?'

'আর কার জন্যে।' চোখ দুটি স্থির ক'রে গাঢ় ক'রে তাকাল নীলাঞ্জনের দিকে। বললে, 'আপনার জন্যে।'

কত বড়ো প্রকাণ্ড লোক। কত বড়ো পণ্ডিত। সমাজের কত উঁচু চুড়োয় এসে বসেছেন। কত দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন। কত টাকা। কত মান। কত শক্তি। আর, কি সুন্দরই বা দেখতে!

'আমার জন্যে কেউ ব'সে আছে এ ভাবতে ভারি সুখ হয়। সুখ জিনিসটাই ভাবনার মধ্যে, জিনিসের মধ্যে নয়। কিন্তু আমি ভারি আশ্চর্য হচ্ছি,' নীলাঞ্জন এক পা এগোবার ভঙ্গি করল: 'কই, তুমি তো কাঁদছ না?'

পাশে জায়গা ঢের আছে, তবু আরো একটু সংকুচিত হ'ল মেয়েটা। বললে, 'কাঁদব? কাঁদব কেন?'

'এর আগে যে এসেছিল সে এ ঘরে ঢুকেই মেঝের উপর ছিটকে প'ড়ে কেঁদেছিল একচোট।'

'কেন?'

'ভয়ে।'

'ভয় কিসের? আসতেই যদি পারল তবে আবার কাকে ভয়?'

'ভয়কে ভয়। তুমি যে নিশ্চিন্ত-নিশ্চিন্ত আছ এইটেই আশ্চর্য।'

মুচকে হাসল মেয়েটা। বললে, 'আমি যে সব জেনেশুনে এসেছি।'

তাকাল নীলাঞ্জনের দিকে। মাথার চুল প্রায় শাদা, পাতলা হ'য়ে স'রে বসেছে দূরে-দূরে। কপাল তাই বেশি চওড়া ও চকচকে দেখাচ্ছে। সাফল্যে একটু স্থূল কিন্তু মুখে কেমন একটা আত্মনিমগ্ন শিশুর ভাব। মনে-মনে ভাবছিল মেয়েটা, সত্যিই কামনা কি করুণ!

'কি, কতদূর জেনেছ তুমি?' হালকা হবার চেষ্টা করেছিল নীলাঞ্জন, কিন্তু কেমন যেন গম্ভীর শোনাল।

'তা জানি না। কিন্তু, তারপর, তাকে, সেই আগের জনকে কি করলেন?'

'তাড়িয়ে দিলুম।'

তারপর কতক্ষণ কোনো কথা নেই।

মেয়েটা ছোট্ট একটা হাই তুলল।

হঠাৎ নীলাঞ্জন ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার নিশ্চয়ই ঘুম পাচ্ছে। তোমাকে

একটা সাইকেল রিক্‌শা ডাকিয়ে দিই। রাত মন্দ হ'ল না। বাড়ি ফিরে যাবে তো ?'

এতটা যেন ভাবতে পারত না মেয়েটা। আহতের মতো উঠে দাঁড়াল। বললে, 'দরকার কি। একটু হেঁটে গিয়েই রাস্তায় পেয়ে যাব রিক্‌শা।'

'হ্যাঁ, নিজের জোরে চ'লে যাওয়াই ভালো। নিজের ইচ্ছেয় আসা, নিজের জোরে চ'লে যাওয়া।'

চ'লে গেল মেয়ে। যাবার আগে নীলাঞ্জন জিগ্‌গেস করলে, 'তোমার ফি-টা পেয়েছ ?'

'ফি, কিসের ফি ?' আঁচলে রাগের ঝলস দিয়ে উঠল রিক্‌শাতে।

'আরেকদিন এস।'

পরদিন সকালে নকুল এসে হাজির। হাড়গিলের মতো চেহারা, নাকের উপরে একটা আবার বড়ো আঁচিল। ধূর্ত যে সাপ তাকেও আমি জব্দ করি আমার নামেই তার পরিচয়।

'স্যার—'

স্টেনোকে ডিকটেশন দিচ্ছিল নীলাঞ্জন, নকুল ঘরে ঢুকল।

নথিপত্র গুটিয়ে নীলাঞ্জন তাকাল ঘড়ির দিকে। স্টেনোকে বললে, 'কোর্টে।'

নকুল বললে, 'দেবলাকে আপনার পছন্দ হ'ল না ?'

'কে দেবলা ?'

'কাল সন্ধ্যায় যে এসেছিল—'

'না, না, বেশ মেয়ে। তোমার সনাতনীদের চেয়ে ভালো। বেশ অন্যরকম।'

'ফোর্থ ইয়ারে পড়ে স্যার।'

'ফোর্থ ইয়ার!' নীলাঞ্জন মুগ্ধের মতো বললে, 'তাই, তাই অমন স্মার্ট। চালাক-চালাক। রাগটুকুও আছে ভাগটুকুও আছে। কার মেয়ে ?'

'ডিস্ট্রিক্ট বারে প্র্যাকটিস করে ঐ যে উকিল ভূপেন ঘোষাল, তার মেয়ে।'

'কে ভূপেন ঘোষাল ?'

'পাকিস্তান থেকে এসেছে, রিফিউজি উকিল—'

'তাই চেকনাই আছে খানিকটা—'

'কিন্তু তাকে নাকি আপনি তাড়িয়ে দিয়েছেন ?'

'তাড়িয়ে দিয়েছি ?'

'খুব দুঃখ করছিল। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়ে রেখেই নাকি চ'লে যেতে বলেছেন। খুব অপমানিত বোধ করেছে—'

হেসে উঠল নীলাঞ্জন : 'তার টাকাটা তাকে পুরোপুরি দিয়েছ তো?'

'তা দিয়েছি।'

'তা হ'লে তার নালিশ কি?'

'তবু আপনার মতো জেলার এমন একজন প্রধান পুরুষের কাছ থেকে সে একটু স্নেহ একটু দয়া আশা করছিল—একটু বন্ধুতা।'

'খাসা বলেছ। যাকে অপমান করতে পারতুম তাকে যে অপমান করলুম না সেইটেই তার অপমান? বেশ, তাকে আরেকদিন আসতে বোলো।'

'আর কি আসবে?' দর বাড়াচ্ছে নকুল।

'একদিন যখন এসেছিল তখন আরেকদিনই বা আসবে না কেন? সেও টাকা এও টাকা। টাকা মানেই আরো-টাকা। রোজগার মানেই আরো-রোজগার।'

'হ্যাঁ, আরো টাকা।' নাকের ডগার আঁচিলটা সূক্ষ্ম ক'রে একটু চুলকে নিল নকুল। বললে, 'আমিও ধৈর্য ধরতে বলেছি দেবলাকে। বলেছি হাড় থাকলেই মাস হবে।'

আর কি সে আসবে!

প্রতীক্ষা ক'রে থাকার আনন্দ আর নেই জীবনে। ক্যালেণ্ডারে মাসের প্রথম তারিখটির জন্যে যা কিছু প্রতীক্ষার স্বপ্ন। কিন্তু প্রতীক্ষায় আনন্দ কোথায়? এ যে নতুন রকম যন্ত্রণা।

এ যে শুধু প্রতীক্ষার জন্যেই প্রতীক্ষা ক'রে থাকা।

গাঢ় সন্ধ্যায় একটা সাইকেল রিক্‌শা এসে দাঁড়াল।

'নিজের থেকেই এসেছি।' আপিসরুমে না ঢুকে ড্রয়িংরুমে ঢুকল দেবলা।

'আর তোমার জন্যেই তো ব'সে আছি আমি।'

তাকাল নীলাঞ্জন। পাতলা, একহারা চেহারা, দুর্বল, যেন অনেক শ্রান্ত-ক্লান্ত। তারই মধ্যে একটু ঘষামাজা সেরে নিয়েছে। চুল বিনুনি ক'রে বাঁধা, পায়ে স্যাণ্ডেল। হাতে সরু ক'গাছি কাঁচের চুড়ি।

মুখোমুখি বসল কৌচে। নীলাঞ্জন চুরুট ধরিয়ে বললে, 'কথা বলো—'

'কথা?'

'শুধু কথা। কথাই তো সব। রাতদিন শুধু আপিস-আদালতেরই কথা

কইছি, বিষয়-বাণিজ্যের কথা। ভালোবাসার কথা কতদিন শুনি নি, বলতেও ভুলে গেছি। হোক মিথ্যে কথা, তবু বলতে সুন্দর শুনতে সুন্দর। মিথ্যে-কথাগুলিই তো জীবনকে রঙিন ক'রে রেখেছে।'

'সত্যকথাও তো আছে কিছু।'

'আছে নাকি? কি সত্য?'

'দারিদ্র্য। দুঃখ। সংগ্রাম।'

অদ্ভুত শোনাল দেবলাকে, প্রায় অশরীরী। উৎসুক হ'য়ে জিগ্গেস করল নীলাঞ্জন, 'তুমি কে?'

'আমি আবার কে। আমি এক রিফিউজি।'

'রিফিউজি? আর কোনো পরিচয় নেই?'

'না। একটা নতুন জাত তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। তার নাম রিফিউজি। আর কোনো পরিচয় নেই। আমি তাদেরই একজন।'

'তুমি কি ক্যাম্পে থাকো?'

'থাকবার কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই হয়েছে কোনোরকমে। একেবারে কাপড়ের তাঁবু নয়, তবু বৃষ্টির দিনে জল পড়ে ছাদ ফুঁড়ে। দুর্দান্ত ভাড়া। ছাগলভেড়াতেও থাকে না যেমন আছি আমরা—' গলা প্রায় ভারি হ'য়ে এল দেবলার।

'তোমার কে আছে?'

'আমার আবার কে থাকবে! আমার শুধু আপনি আছেন।' চোখের পাতা নাচিয়ে খুশির ঝিলিক দিল দেবলা।

'সে তো এ মুহূর্তে তুমিও আমার আছ। এ মুহূর্তটির কথা নয়। জীবনে তোমার কে আছে?'

'বাবা-মা আছেন, ছোটো-ছোটো অনেকগুলি ভাইবোন আছে।'

'তোমার বাবা?'

'ভূপেন ঘোষাল। পাকিস্তানে ওকালতি করতেন। এখানে কি ক'রে কি করতে পারবেন বলুন। কিছুই পারছেন না। সব আমার উপর ভার। আমিই বড়ো। কিন্তু আমার সাধ্যি কি কিছু করতে পারি?'

'কলেজে পড় না?'

'না প'ড়ে উপায় কি। পরিবার প্রতিপালনের পথ তো একটা দেখতে হবে। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করবারও যেন সময় নেই।' হাতে-কাচা শাড়ির

আঁচলের ধারটায় অন্যমনস্কের মতো হাত বুলুতে লাগল দেবলা : 'পথ একটা এখুনি পাওয়া দরকার। নইলে কি আর আসি ?'

'খুব অভাব ? নয় ?'

'শুধু একলা আমার তো নয়, সমস্ত ভাইবোনগুলির। অসুখবিসুখ তো লেগেই আছে, ওষুধ কিনব কোত্থেকে! জামাকাপড় শতচ্ছিন্ন, সেলাই করবারও আর জায়গা নেই।' ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠল দেবলা : 'কিন্তু কেবল যদি অভাবের কথাই বলি, ভাবের কথা, ভালোবাসার কথা আসবে কি ক'রে ?'

'তুমি ভালোবাসায় বিশ্বাস কর ?' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল নীলাঞ্জন।

'শুনেছি বটে, দেখি নি।'

'যে ভালোবাসার বয়স নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই ? যে ভালোবাসা কিছু চায় না কেবল দেয়। তুমি ও কোত্থেকে দেখবে ? তোমার কতটুকুই বা বয়স, অভিজ্ঞতাই বা কি! কিন্তু দেখবে একদিন। সে দেখার জন্যে বেঁচে থেকে সুখ আছে—'

'তত সময় কই ?'

'যে ভালোবাসা বিচার করে না, অভিসন্ধি করে না—'

'এদিকে দরজায় যে নেকড়ে বাঘ ব'সে আছে।' হাসল দেবলা : 'নকুলবাবু বলেন হাড় থাকলেই মাস হবে। কিন্তু হাড় ক'খানা টিকলেই তো মাংসের আশা। টিকিয়ে রাখি কি ক'রে ?'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল নীলাঞ্জন। বললে, 'কিছু খাবে ?'

'খাব ?' এতটা যেন ভাবতে পারত না দেবলা : 'কি খাব ?'

'আমি যা খাই। ডাল-ভাত, মাছ-দুধ। খাবে ? মনে হয় কত দিন তুমি যেন পেট ভ'রে খাও না।'

'না, না, সে কি কথা!' কি ইঙ্গিত পেল কে জানে, দেবলাও উঠে পড়ল। বললে, 'আপনার খাবার দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, আমি তবে উঠি।'

নিস্পৃহের মতো নীলাঞ্জন বললে, 'আবার এস।'

দরজার কাছে এসে দেবলা একটু থামল। নড়ল-চড়ল, আবার থামল। বললে, 'যাই তা হ'লে ?'

'এস। যাওয়াটাই বড়ো কথা নয়, আসাটাই বড়ো কথা। আর শোনো—'

এখনো বারান্দাটা পেরোয় নি পুরোপুরি, দাঁড়াল দেবলা।

নীলাঞ্জন বললে, 'তোমার ঠিকানাটা আমাকে দেবে ?'

'ছি ছি, আমার আবার ঠিকানা! সেখানে আপনি যেতে পারবেন নাকি? আপনাকে তো বসতেই জায়গা দিতে পারব না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে।'

'আচ্ছা, তোমার টাকাটা ঠিক পাচ্ছ তো?'

আহা, কি ভালোবাসার কথা! কানের মধ্যে যেন ফুটন্ত তেল ঢেলে দিল। পড়ি-মরি ক'রে বেরিয়ে গেল দেবলা।

সেদিন আকাশ-উপুড়-করা বৃষ্টি, তারই মধ্যে চ'লে এসেছে মেয়েটা।

'এ কি, ভিজে গেছ নিশ্চয়ই। কি হবে!' চঞ্চল হ'ল নীলাঞ্জন।

'বেশি নয়—এ শুকিয়ে যাবে এখুনি।'

'না, না, ভীষণ—ভীষণ অসুখ করবে। বদ্‌লে ফেল, শাড়িটা বদ্‌লে ফেল শিগগির—'

'বেশ বলেছেন! এ বাড়িতে শাড়ি পাব কোথায়?' খিলখিল ক'রে হেসে উঠল দেবলা।

'আছে শাড়ি। তোমার জন্যে কিনেছি একখানা।'

'আমার জন্যে?'

'যাও, সোজা ওপরে চ'লে যাও। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সামনে বেডরুম। বেডরুমে খাটের ওপরে দেখবে তোমার শাড়ি।'

'উপরে যাব?'

'যাও না। সোজা। ঐ তো সামনে সিঁড়ি—'

'আপনি?'

'আমিও যাচ্ছি এখুনি।' একটা ম্যাগাজিন নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল নীলাঞ্জন, মুখ তুলে বললে, 'কেমন মানাল তোমাকে শাড়িটাতে, দেখব না?'

সিঁড়িতে আলো জ্বলছে, এক-পা এক-পা ক'রে উঠতে লাগল দেবলা। এই বোধহয় স্বর্গের সিঁড়ি। উঠছে তো উঠছেই, চলেছে সে কোন ঊর্ধ্বলোকে, কোন বসনান্তরে? বাড়িঘর নির্জন তবু এত ভয় কেন? কে যেন দেখে ফেলবে! ধ'রে ফেলবে!

এই শোবার ঘর! কত দূর চ'লে এসেছে আজ দেবলা। রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হ'ল!

বা, এই শাড়ি! এই জামা!

দরজার পর্দার ধার দুটো আরো একটু-একটু ক'রে টেনে দিয়ে প্রান্তের

ফাঁকটুকু ভ'রে দিল। চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল কোথায় সুইচ। তারপরে ঘর অন্ধকার ক'রে দিল।

এর মধ্যেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ না হ'লে বাঁচি।

যখন জুতোর শব্দ হ'ল তখন ফের আলো জ্বলেছে। ভেজা শাড়ি-ব্লাউজ ঘুরন্ত পাখার নিচে মেলে দেওয়া হয়েছে, আর নতুন শাড়ি-জামায় খাটের উপর পাতা বিছানায় গা ঢেলে শুয়ে আছে দেবলা।

'আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।' আবদেরে শিশুর মতো বললে দেবলা, 'এমন সুন্দর বিছানায় জীবনে ঘুমুই নি কোনোদিন।'

'কিন্তু একা-একা পারবে তো ঘুমুতে?'

'আপনার নিচে বুঝি অনেক কাজ?' দেবলার গলা ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে।

'অফুরন্ত। তুমি দেখবে চলো—'

'সত্যি, এই প্রকাণ্ড ঘরে আমি ঘুমুব, আমাকে কে পাহারা দেবে? তারপর বৃষ্টি হ'য়ে যাবার পর চারদিকে কেমন সব ফিসফিস শব্দ হচ্ছে। যেন ভূতের বাড়ি। তাই না?' তবু আরো খানিকক্ষণ শুয়ে রইল দেবলা।

দূরে-দূরে ঘুরঘুর করছে নীলাঞ্জন। একটা বুঝি সিগারেট ধরাল।

দেবলা উঠে পড়ল ঝাপটা দিয়ে। পাখার নিচে মেলা শাড়ি-ব্লাউজ দুটো হাত দিয়ে অনুভব করতে লাগল: 'শুকিয়েছে—কি বলেন?'

'সে কি, যা প'রে আছ তাইতেই চ'লে যাও।'

'সর্বনাশ! লোকের কাছে আমি কি জবাবদিহি দেব? আমার ছেঁড়াখোঁড়া জলকাদামাখা জীর্ণ শাড়িই ভালো।'

সুইচটা অফ ক'রে দিল দেবলা।

নীলাঞ্জন কি বেরিয়ে গেল বাইরে?

আলোজ্বলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে নীলাঞ্জন বললে, 'আবার এস।'

দেবলার মুখে কথাটি নেই।

নীলাঞ্জন তার হাত ধরল। বললে, 'তুমি বড্ড অস্থির—'

'তা ছাড়া আবার কি।' প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায় বললে দেবলা, 'দিন যে ফুরিয়ে যাচ্ছে—'

'তাই ব'লে তুমি ফুরোবে কেন?'

ক'দিন পরে ক'জন উকিল এসে হাজির।

'আসুন, আসুন—'

'পার্টিশানের পর ইনি এখানে প্র্যাকটিস করছেন, নাম ভূপেন ঘোষাল।'

'ভূপেন ঘোষাল! বা, বিলক্ষণ চিনি।' উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল নীলাঞ্জন : 'কেন, কি ব্যাপার?'

'আপনার আশীর্বাদে ব্যাপার শুভ।' করজোড়ে বললে ভূপেন ঘোষাল, 'আসছে শনিবার আমার মেয়ের বিয়ে। যাবেন আপনি।'

আরেকজন ফোড়ন দিল : 'যেতেই হবে আপনাকে।'

'আপনার মেয়ে? কোন মেয়ে?' অগাধ শূন্য যেন হাতড়াতে লাগল নীলাঞ্জন।

'আমার ঐ একটিই মেয়ে।'

'নামটি কি?'

'দেবলা।'

চিঠি দিল। পড়তে চেষ্টা করল নীলাঞ্জন, ঝাপসা-ঝাপসা ঠেকল। ছেলে কি করে, কেমন দেখতে কিছুই জিগ্গেস করার কথা মনে এল না। শহরের সেই যে একখানামাত্র ঘোড়ার গাড়ি আছে তাতে ক'রে চ'লে গেল উকিলের দল, সেই গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

আর আসবে না কোনোদিন।

তবু এই যেন অগাধ শান্তি অতলান্ত শান্তি, আর আসবে না।

আহাহা, বেঁচে গিয়েছে। গুলির নাগালের মধ্যে এসে পড়েছিল পাখি, উড়ে পালিয়েছে। মোটরের চাকার তলায় পড়তে-পড়তে বেঁচে গিয়েছে বাছুর।

তবু, আর আসবে না!

মামুলি নেমন্তন্ন, কে যায়! কে-বা সোনার একটা দামি হাতঘড়ি কেনে।

নীলাঞ্জন আসবে এ কেউ প্রত্যাশা করে নি। সবাই যেন হাতে চাঁদ পেল। সবাই নীলাঞ্জনকে নিয়ে ব্যস্ত।

নীলাঞ্জন বললে, 'কনে দেখব।'

কনের ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল নীলাঞ্জনকে। সসজ্জা কন্যা নমস্কার ক'রে দাঁড়াল।

এ কি! এ কে! এ কাকে দেখছি? এ তো সে নয়। এ যে আলাদা, অন্যরকম। এ তো অনেক হৃষ্টপুষ্ট নধর নিটোল। রংও তো ঢের পরিষ্কার।

'নকুল! নকুল!' কাকে যেন ডেকে উঠল নীলাঞ্জন।

'কাউকে ডাকছেন স্যার?'

'দূরে নকুল ভটচাজকে দেখলাম না?' নীলাঞ্জন আমতা-আমতা করতে লাগল।

'মোক্তার নকুল ভটচাজ? সে এখানে কোথায়?'

'সত্যিই তো, উকিলের বাড়ি বিয়েতে মোক্তার আসবে কেন?'

'তার জন্যে নয় স্যার। সই জাল ক'রে উদ্বাস্তুদের টাকা তুলে নিয়েছে নকুল। পুলিশ চার্জসিট দিয়েছে। ধরতে পারছে না। হুলিয়া বেরিয়েছে। ক্রোক হ'য়ে গিয়েছে বাড়িঘর।'

তবে আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে দেখছ কি!

ঠিকানাটা মনে আছে না? একবার সেখানটা ঘুরে গেলে কেমন হয়? কিন্তু যদি সেখানে না থাকে? কোথাও না থাকে?

বা, এই সামনেই তো আছে। মূর্তিমতী অব্যাহতি। মূর্তিমতী পবিত্রতা।

কনের অচেনা বাঁ হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল নীলাঞ্জন। নিজের হাতে ঘড়িটি পরিয়ে দিতে-দিতে বললে, 'ঘড়ি কি বলছে জানো?'

যেন জানে, মেয়েটি তেমনি ক'রে হাসল।

'বলছে, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু নিজেকে ফুরিয়ে ফেলো না।'

এক অঙ্গে এত রূপ

যূ থি কা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

. . . .

যূথিকা হয়তো এই শহরেই কোথাও আছে এখনো।

এই অজানা অনাবিষ্কৃত শহরে।

মানচিত্র আছে এ শহরের, নিখুঁত বিস্তারিত বিবরণের মানচিত্র আর আছে রাস্তা বাড়ি ঘর জমির ইঞ্চি ধরা নির্ভুল মাপ পৌরভবনের কোনো দপ্তরে। কিন্তু এ শহরকে সে মানচিত্রে কি চেনা যায়? ধরা যায় সে মাপে?

চারতলার নির্জন ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে অন্ধকার রাতের শহরের দিকে মহিতোষ তাকিয়ে থাকে। আলোর বিন্দুতে আঁকা শহর হেমন্তের কুয়াশায় অস্পষ্ট।

যূথিকার স্মৃতিও এমনি অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত ছিল এতদিনে।

কিন্তু তা হয়নি। কেন যে হয়নি তা মহিতোষকে বাইরে থেকে বিচার করলে বোঝা কঠিন।

মহিতোষের মত মানুষের মনে যূথিকা নামটা এতদিন স্মরণ থাকাই আশ্চর্য।

কিন্তু নাম নয়, আরও কিছু আছে।

অক্ষয় সৌরভের মত কি, না দুর্বোধ তিক্ত একটা স্বাদের মত কিছুতেই যা মন থেকে মোছা যায় না!

মহিতোষ নিজেই তা বুঝে উঠতে পারে না।

কিন্তু মনে পড়ে, সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে মনে পড়ে, যেমন পড়ছে এই বিনিদ্র রাতে নির্জন ছাদের উপর দাঁড়িয়ে কুহেলিগুণ্ঠিত শহরের দিকে তাকিয়ে।

এই শহরের কোথাও হয়তো সে আছে, কোন এক সংকীর্ণ নোংরা রাস্তার কোন এক জীর্ণ শ্রীহীন বাড়িতে, কোন রকমে ছোট একটা কুঠুরি ভাড়া করে।

দারিদ্র্যের সঙ্গে তেমনি দৃপ্ত অনমনীয়তার সঙ্গেই সে যুঝছে কি এখনো?

না, সময় সেই ইস্পাত-মনকেও মরচে ধরিয়ে ধরিয়ে মলিন দুর্বল করে এনেছে, তার অনিবার্য ছাপ রেখে গেছে কোমল শান্ত নিষ্কম্প সরোবরের মত স্বচ্ছ দৃষ্টি-স্নিগ্ধ সেই মুখে?

হ্যাঁ, ভেতরে যে ইস্পাতের চেয়ে কঠিন, তার বাইরের চেহারা অমনি বিপরীতই ছিল। শুধু কোমল স্নিগ্ধ নয়। এমন একটি অসহায়তা ছিল সেই দৃষ্টিতে পৌরুষ দম্ভের কাছে যার চেয়ে বড় আকর্ষণ আর কিছু নেই।

মহিতোষ কি দাম্ভিক ছিল তখন?

দাম্ভিক না হোক, সাফল্যগর্বিত একটু বইকি!

সেটা অস্বাভাবিকও কিছু নয়। মহিতোষ সেই বয়সেই সম্মান-প্রতিপত্তির সোপান বেয়ে অনেকখানি উঠে এসেছে।

তখনও সে ওকালতি করে, কিন্তু বসবার ঘর যাদের ভিড়ে সারাক্ষণ জমজমাট হয়ে থাকে তারা সবাই মক্কেল নয়। জনসেবার নানা দায় স্বেচ্ছায় নিঃস্বার্থ ভাবে নেওয়ার খ্যাতি তখনই রটেছে।

যারা দরিদ্র অপারগ তাদের বিনা পারিশ্রমিকেই সে আইন-আদালতের ব্যাপারেও সাহায্য করে।

অপারগ প্রার্থী হিসেবেই যূথিকা একদিন তার বসবার ঘরে এসেছিল।

আশ্চর্যের কথা এই যে সেদিনটার কথা মহিতোষের মনেই পড়ে না ভালো করে।

অনেকের ভিড়ের মধ্যে যূথিকা একজন। বিশেষ করে মনে রাখবার কিছুই তার মধ্যে নেই।

তার সাহায্য নিতে একা যুবতী মেয়ে যূথিকাই তো প্রথম আসেনি। চোখে পড়বার মত বিশেষত্ব কি সৌন্দর্যও তার ছিল না। তা ছাড়া মেয়ে হলেই মনোযোগ দেবার মত মানুষ মহিতোষ নয়। সহজ সুস্থ তার মন।

অতি সামান্য একটা মামলা। মহিতোষ বেরার সমশ্রেণীর ডাকসাইটে হোমরাচোমরারা এত ছোট ব্যাপার নিয়ে হাত ময়লা করে না। কিন্তু মহিতোষ এরকম মামলা আগেও নিয়েছে, জুনিয়ার ও মুহুরীদের অস্ফুট অসন্তোষ সত্ত্বেও।

কোন ব্যারাক বাড়ির একটা কুঠুরি। বাড়িওয়ালা জুলুম করে যূথিকাদের তা থেকে তুলে দিতে চায়।

মহিতোষ কেস্ নিয়েছিল। যূথিকারা বলতে কে, ক'জন, সে খোঁজটা নেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেনি। ভাড়াটে হিসেবে কার নাম আছে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল বোধ হয়। যূথিকা নিজের নামেই ভাড়া দেয় জানবার পর আর কোন কৌতূহল তার জাগেনি। তখনকার দিনেও এই নির্মম শহরে যূথিকার মত নিঃসহায় মেয়ে বিস্ময়ের বস্তু তো নয়।

কেস্—তা সে যত সামান্যই হোক একবার হাতে নিলে মহিতোষ নাছোড়-বান্দা, দুর্ধর্ষ। তুচ্ছ কেস্ হলেও গোলমাল ছিল একটু। মহিতোষ তা সত্ত্বেও কেস্ যথারীতি জিতেছিল এবং ভুলে গেছল তারপর।

কিন্তু ভুলে থাকতে দেয়নি যূথিকাই।

সেদিন সন্ধ্যার পর বসবার ঘরটা একটু অস্বাভাবিকভাবে ফাঁকা। ছুটির দিন বলে ঠিক নয়, রাত্রে মহিতোষের এক সভায় নিমন্ত্রণ জেনেই মুহুরী মক্কেল কেউ আর আসেনি। দু-চারটে খুচরো কাজ সেরে মহিতোষ ভেতরে উঠে যাবার উপক্রম করছে এমন সময় যূথিকা কুণ্ঠিতভাবে ঘরে ঢুকেছে।

একটু অসময়ে এলাম বোধ হয়।

হ্যাঁ, আমায় এখুনি বেরুতে হবে একটু। আপনার কেস্ তো জিতে গেছেন·— মহিতোষের গলায় একটু অধৈর্য বুঝি!

তারই ঋণ শোধ করতে এলাম।

মহিতোষ অবাক্ হয়ে তাকিয়েছে আর সস্তা প্ল্যাস্টিকের একটা ছোট পুরোন

ব্যাগ থেকে যূথিকা দশ টাকা, পাঁচ টাকা ও এক টাকার ছেঁড়া ময়লা নোট মিশিয়ে চল্লিশটি টাকা টেবিলের ওপর রেখে সংকুচিতভাবে বলেছে, আপনার ফী দেবার সাধ্য আমার নেই, কিন্তু কেসের সময় আমার হয়ে বাকি ভাড়ার দরুন যে টাকাটা কোর্টে জমা দিয়েছিলেন—সেইটে শুধু ফেরত দিয়ে গেলাম।

মহিতোষের মনে পড়েছে সবই। উপযুক্ত রসিদ না থাকায় দু মাসের বাকি ভাড়া নিয়ে একটা ফ্যাকড়া উঠেছিল। মহিতোষ নিজে থেকেই সেটা মিটিয়ে দিয়েছিল, তাড়াতাড়ি কেসের মীমাংসার জন্যে।

টাকাটা তুলে নিয়েই নমস্কার জানিয়ে চলে যেতে একটু বেধেছে।

আর কোন গোলমাল নেই তো?—জিজ্ঞাসা করেছে নেহাত শুকনো ভদ্রতার খাতিরে।

না, এখন তো নেই।—যূথিকার স্বরটা ঠিক নিঃসংশয় নয়।

পরে অন্য জুলুম করতে পারে এমন ভয় আছে নাকি?—এ প্রশ্ন আপনা থেকেই আসে।

যূথিকা ম্লান হেসে বলেছে,—আমাদের মত মানুষ নির্ভয় আর কখন?

যূথিকাকে এই কি মহিতোষ প্রথম দেখল? এই প্রথম? মক্কেল নয়, সাহায্যপ্রার্থিনী নয়, হাজার জনের একজন নয়,—যূথিকা!

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতার পর হঠাৎ—সংসার তো আপনিই চালান। কি করেন আপনি?

কি করি? কি আর করব,—মাস্টারি।

যূথিকার ক্ষণিক একটু অস্বস্তি, একটু দ্বিধা যদি দেখা গিয়ে থাকে সেটা মহিতোষের কাছে স্মরণীয় মনে হয়নি।

সেদিনকার আলাপ আর বেশী দূর নয়।

যূথিকা আবার এল মাসখানেকের মধ্যেই।

আপনার কাছেই এলাম।

আবার কি কেস্?

কেস্ নয়—তার চেয়ে বেশী কিছু।

কিন্তু সেটা কি আমার সাধ্যের এলাকায় পড়ে?

পড়ে। আর আপনাকে ছাড়া কাকেই বা আমি চিনি?—সেই কোমল কাতর দৃষ্টির মিনতি।

মনের চকিত ঘোরটা কাটাবার জন্যেই মহিতোষ একটু বিদ্রূপ করলে—কিন্তু চেনা বলেই তো আমি চতুর্ভুর্জ নই। আমার ক্ষমতা কতটুকু।

ক্ষমতা আপনার অনেক। ওরা সবাই আপনাকে মানে, ভয় করে।

ভয় করে! মহিতোষ একটু হাসল,—এ কথাটা নতুন শুনলাম, শুনে খুব খুশী হতে পারছি না।

তবু কথাটা সত্যি। ভয় না করলে কেউ মানে না।

আপনার এই অভিজ্ঞতা? কিন্তু ওরা কারা? আমায় ভয় করার দরুন আপনার সমস্যারই বা কি সুবিধে হবে?

যথেষ্ট হবে। ওরা, মানে আমার বাড়িওয়ালা আর পড়শীরা আমায় তাড়াবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছে। কেস্ করে যা পারেনি, এবার দুর্নাম দিয়ে তাই করতে চায়।

মহিতোষ এবার হতাশাতেই হাসল।—তাই যদি হয়, আমার ভয়েই তারা দুর্নাম দেওয়া ছেড়ে দেবে মনে হয়? দিলেও কতদিন? তার চেয়ে অমন বাড়িওয়ালা আর পড়শীর মায়া আপনি ত্যাগ করুন না। ছেড়ে দিন ও-ঘর।

ঘর ছেড়ে দেব?—কুলায় খোঁজা পাখির মত অসহায় কোমল দুটি চোখের ক্ষণিক বিদ্যুৎ-জ্বালায় পলকের জন্যে আর-এক যূথিকাকে বুঝি দেখা গেল—কঠিনতম ধাতু যার মজ্জায় মেশানো।

মহিতোষ সত্যিই বিস্মিত হয়েছিল। গম্ভীর হয়েই এবার বললে, ঘর যদি না ছাড়তে চান তাহলে দুর্নাম অগ্রাহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় তো আমি দেখি না। আমি তো সত্যিই আপনার দুর্নামের পাহারা হয়ে থাকতে পারব না।

তা হতে আপনাকে বলছি না। দুর্নাম আমি ভয় করি না। কিন্তু আমায় সহায়হীন জেনে ছোটখাট যে-সব অত্যাচার-উৎপীড়ন ওরা লুকিয়ে করে, আপনার আড়ালে আমি আছি জানলে তার আর সাহস পাবে না, এই বিশ্বাসে আপনার কাছে এসেছি।

মহিতোষ খানিক চুপ করে রইল। কঠিন মুখে তারপর জিজ্ঞাসা করলে—কি দুর্নাম দিয়ে ওরা আপনাকে তাড়াতে চায়?

উত্তরটা একটু দেরি করেই এল, যূথিকার গলার স্বরও ভারী। মাথা নীচু করে সে বললে—আমার ঘরে অচেনা পুরুষ আসে যায় এই দুর্নাম।

সে-রকম কেউ আপনার ঘরে সত্যিই আসে?

হ্যাঁ আসে, কিন্তু অচেনা নয়। তিনি, তিনি আমার স্বামী।—এবারও নে
মুহূর্তের দ্বিধা যেন।

কিন্তু মহিতোষ তখন অন্য কারণে বিস্মিত।—আপনার স্বামী আপনার সঙ্গে থাকেন না?

না, আমি আমার মা আর ছোট দুটি বোনকে নিয়ে থাকি।

একটু অস্বাভাবিক নয় কি?

হ্যাঁ, তা না হলে ওরা বিষ ছড়াবার সুযোগ পাবে কোথা থেকে!

মাপ করবেন, কোন অন্যায় কৌতূহল আমার নেই। কিন্তু একসঙ্গে না থেকেও দেখা করতে আসতে যিনি ত্রুটি করেন না, আপনাকে মিথ্যে দুর্নাম থেকে বাঁচানো তাঁরই দায় নয় কি?

দায় নিশ্চয়ই তাঁর। কিন্তু সে দায় তিনি নিলে আপনার কাছে আসবার দরকার হত না। এর বেশী আমার আর কিছু বলবার নেই।—শেষ কথাটা বলার সময় যূথিকা মুখটা আবার নীচু করল।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মহিতোষ ধীরে ধীরে বললে,—আপনার ঠিকানাটা আর একবার দিয়ে যান। ভুলে গেছি।

যূথিকা চলে যাবার পর ঠিকানা লেখা কাগজটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ মহিতোষ চুপ করে বসে রইল। তারপর ঠিকানাটা আর একবার পড়লে।

বেশী দূর নয়। তার নিজের ওয়ার্ডেই। একটা জলের কল বসাবার ব্যাপারে দিন চারেক বাদে ওই দিকেই তার পরিদর্শনে যাবার কথা আছে। পরিদর্শনের কাজ সেরেই মহিতোষ যূথিকাদের বাড়ি গেল।

সে আসবে জেনে যূথিকা যেন তৈরী হয়েই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। কাছাকাছি আরো দু-চারজন।

যূথিকা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। পাখাটা নিজে না করে হাতেই দিলে মহিতোষের। তারপর একটা ছোট চৌকি টেনে নিয়ে কাছেই বসল। বেশী দূরে বসা সম্ভবও নয়। কারণ সংকীর্ণ ঘরটা দুটো ছোট তক্তপোশেই জোড়া হয়ে আছে। সেলাই-এর কল বসানো একটা টেবিল ও একটা সেল্‌ফ রাখবার পর জায়গা আর নেই বললেই হয়। জরাজীর্ণ বাড়িটার বাইরেটা দেখে এবং অন্যান্য ভাড়াটেদের বিশৃঙ্খল জিনিসপত্র ছড়ানো নোংরা ঢোকবার বারান্দাটা দিয়ে আসতে, মনে যে ধারণা হয় ঘরটায় কিন্তু তার সমর্থন নেই। সুস্পষ্ট দারিদ্র্য, কিন্তু যূথিকা কেমন করে যেন তাকে শ্রীহীন হতে দেয়নি এখনো।

শাড়ির ছেঁড়া পাড় জুড়ে রংবেরঙের একটা ঢাকনা বিছানার ওপর পাতা। মেঝে দেওয়াল আসবাবপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেটা তার অভ্যর্থনার খাতিরে যদি-বা হয়, দেওয়ালটা ক্যালেণ্ডারের ছবিতে কুৎসিত না হয়ে থাকাটা তো আর তা নয়।

অন্য সময় হলে মহিতোষ ঘরটা আরো ভালো করে লক্ষ করত, কিন্তু এখন তার সে মেজাজ নেই।

নেহাত বিনা ভূমিকায় কথাটা সোজাসুজি শুরু করতে বাধল বলেই জিজ্ঞাসা করলে,—আপনার মা আর বোনেরা কোথায়?

বোনেরা পড়তে গেছে, মা রাঁধছেন।

একটু চুপ করে থেকে মহিতোষ নিজেকে তৈরী করে নিয়ে বললে,—আমি সত্যিই কেন এসেছি জানেন কি?

জানি।

জানেন না। মহিতোষের গলার স্বর তার মুখের চেয়েও কঠিন।—আমি আপনাকে এ বাড়ি ছেড়ে দিতে বলতে এসেছি।

যূথিকার মুখে কোন ভাবান্তর কিন্তু দেখা গেল না। স্থির দৃষ্টিতে মহিতোষের দিকে তাকিয়ে সে শান্ত স্বরে বললে,—বাড়ি আমি ছাড়ব না, আপনার চোখ-রাঙানিতেও নয়। তবে বাড়িওলা ও পড়শীরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে গেছে শোনবার পরই এ-রকম একটা কিছু আপনি বলতে আসবেন জানতাম।

জানতেন? কিন্তু একথা জানেন কি যে আপনার সমস্ত খোঁজ আমি পেয়েছি? জেনেছি যে আপনার সমস্ত কথা মিথ্যে?

যেমন?

যেমন যাঁর জন্যে আপনার এ পাড়ায় দুর্নাম তিনি আপনার স্বামী নন। আপনাদের বিয়েই হয়নি।

বিয়ে প্রমাণ করবার জন্যে তাহলে তো পুরুতকে সঙ্গে নিয়ে থাকতে হয়।

না, তা হয় না। বিয়ে হলে তার যথেষ্ট প্রমাণ থাকে। না হয়ে থাকলে তাও লুকোন যায় না। কলঙ্কের বোঝা নিয়ে গ্রামছাড়া হয়ে আপনি এখানে এসে লুকিয়ে আছেন। আপনার মাস্টারি করার কথাও মিথ্যে।

এত খোঁজ এরই মধ্যে আমার সম্বন্ধে পেয়েছেন?—যূথিকার স্বর যেমন তিক্ত তেমনি ক্লান্ত।—রোগে উপবাসে শুকিয়ে মরলেও উঁকি মেরে একবার

যারা খবর নেয় না, একটু কাদার ছিটে পেলেই কি তাদের অদম্য উৎসাহ তার ইতিবৃত্তান্ত নাড়ীনক্ষত্র সব-কিছু ঘেঁটে বার করতে!

একটু চুপ করে থেকে যূথিকা আবার বললে,—বেশ, এ সব কথাই স্বীকার করে নিলাম, কিন্তু তাতে হয়েছে কি?

হয়েছে কি?—মহিতোষ রীতিমত বিমূঢ়।

হ্যাঁ, সত্যি এতে কি আসে যায়? লাইনপাতা জীবনের ছাপানো টাইম টেবিল ধরে নির্দিষ্ট স্টেশন থেকে স্টেশনে যাদের যাত্রা তাদের ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মাইনি। জীবনের প্রথম পাতা আমার পোকায় কাটা। কলঙ্কের দাগ আমার কোনদিন মোছবার নয়। কিন্তু তাই বলে নিজেকে নিয়ে একটু নিরিবিলি শান্তিতে থাকবার অধিকারও কি আমার নেই? নিজের ছাড়া কারুর কোন ক্ষতি তো আমি করিনি, কেড়ে নিইনি কারুর কোন কিছু, কারুর সৌভাগ্যে ভাগ বসাতে আমি চাই না, তবু কেন ঘেয়ো কুকুরের মত আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবার এই আক্রোশ? কিন্তু এ জুলুমের কাছে আমিও মাথা নোয়াব না কিছুতেই। হিংস্র হয়ে যুঝব আমার সমস্ত শক্তি সমস্ত অস্ত্র দিয়ে।

তীব্র চাপা গলায় শেষ কথাগুলো বলে যূথিকা ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর মহিতোষ স্থাণুর মত বসে রইল কিছুক্ষণ,—বেশ কিছুক্ষণ।

সদ্যোমুক্ত রুদ্ধ বাষ্পের বেগে সমস্ত ঘরটার কম্পন যেন থামতে চাচ্ছে না।

যূথিকাই ফিরে এল আবার খানিক বাদে। একেবারে সহজ শান্ত।

এসে সেই চৌকিটারই ওপর বসে একটু হেসে বললে,—নাটকটা মন্দ হল না, কি বলেন? কিন্তু এইখানেই যবনিকা পড়ুক। যা জানবার আপনি জেনেছেন, যা বলবার বলেছেন। আর আপনার সময় নষ্ট করে অপরাধী হতে চাই না।

মহিতোষ তবু উঠল না। নীরবে যূথিকার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

অনুমতি চাইলে বলব, না। আর কিছু জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নেই।

অনুমতি ছাড়াই তাহলে জিজ্ঞাসা করছি,—যাঁর এখানে আসা নিয়ে সব গণ্ডগোল, তিনি কে?

যূথিকা একটু হাসল,—এই খবরটাই সঠিক পাননি বুঝি?

যা পেয়েছি তাই সঠিক কিনা জানতে চাই।

সঠিক খবরই বোধহয় পেয়েছেন। তিনিই আমার জীবনের শনি।

তিনিই! কিন্তু এখনো তিনি তো আসেন। তাঁকে তো বিয়ে করলেই পারেন।

তাহলেই সব গোল সস্তায় মিটে যায়, না? আপনাদের বিবেক শাস্ত্র সমাজ, কারুর কোন বিক্ষোভ আর থাকে না! কিন্তু বিয়ে করতে আমি পারি না, পারি না ভালোবাসি না বলে।

মহিতোষের বিস্মিত নীরবতাকে ঘা দিয়েই যূথিকা আবার হেসে বললে,—এত অবাক্ হবার তো কিছু নেই। সরলতার আসল দাম যে কি জীবনে প্রথম যে এ কথা বুঝতে শেখায় তাকে কেউ ভালোবাসে? আর শুধু নিন্দুকের মুখ চাপা দেবার জন্যে নিজেকে জীবন্ত কবর দেবার শখ আমার নেই।

কিন্তু সে তবু এখনও আসে! তাকে আসতে দেন?

হ্যাঁ দিই।—যূথিকার মুখের হাসি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের—কিন্তু কি লাভ আর এ আলোচনায়? দুটো উকিলী জেরা করেই দুদণ্ডে একটা ঝলসানো জীবনের সব-কিছু বুঝে ফেলতে চান!

এ আঘাতের জবাব দেওয়া চলে না। মহিতোষের মুখ দেখে যেন করুণাতেই যূথিকা নিজে থেকে আবার বললে,—সে আসে নিজের গরজে। বিয়েই সে এখন করতে চায়, হয়তো দখল হারাবার অপমান সহ্য করতে না পেরে। আর আসতে আমি তাকে দিই, প্রথম প্রবঞ্চনা যার কাছে পেয়েছি, মিথ্যে আশায় দুলিয়ে রেখে তাকে নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা করতে। ওই আমার প্রতিশোধ আর প্রায়শ্চিত্ত। দিনের পর-দিন সামনে তাকে দেখাই আমার চরম শাস্তি।

তারপর যূথিকার সঙ্গে দেখা সেই আদালতে। মহিতোষ আর উকিল নয় তখন। বিচারাসনের চরম সম্মান পেয়েছে।

খুনের চেষ্টার বিচার। আসামীকে দেখে মহিতোষ অবশ্য চেনেনি, চমকে উঠেছিল নিজের মনে এ মামলার প্রধান সাক্ষীর নাম পড়ে। হ্যাঁ, যূথিকাই প্রধান সাক্ষী। সাক্ষী শুধু নয়, তার হয়েই পুলিশের এই মামলা। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সে যূথিকাকে মাথায় কঠিন কোন কিছু দিয়ে আঘাত করে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল।

যূথিকা যে মারা যায়নি সে নেহাত দৈবের কৃপায়। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল, আর আসামী পালাতে গিয়েও ধরা পড়েছে যূথিকার মা ও বোনেদের চীৎকারে বাইরে লোক জড় হওয়ার দরুন।

মুখ দেখে না চিনলেও আসামী যে কে মহিতোষের বুঝতে বাকি থাকেনি। বিচার যথানিয়মে এগিয়ে গিয়েছে। যূথিকার মা সাক্ষ্য দিয়েছেন, দিয়েছেন পড়শীরা। শুধু যূথিকারই সাক্ষ্যের এখন অপেক্ষা। জ্ঞান হবার পর হাসপাতালে কোন জবানবন্দী দিতে সে রাজী হয়নি, আদালতেই সব কথা জানাবে বলে।

শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে আদালতে এসে যা বলবার সে বলেছে। মাথায় তখনও তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

মহিতোষের দৃষ্টি অনেকবার তার ওপর নিবদ্ধ হয়েছে, বিচারকের নির্লিপ্ততা হয়তো একটু ক্ষুণ্ন করেই। যূথিকাও চেয়ে দেখেছে। জবাব দিয়েছে বিচারকের প্রশ্নের কিন্তু চিনেছে এমন কোন লক্ষণ তার মুখে প্রকাশ পায়নি।

যূথিকার সাক্ষ্যেই বিচারের চরম নিষ্পত্তি হয়েছে।

আসামীকে বেকসুর খালাস দিতে বিচারক বাধ্য হয়েছেন।

না, আসামী তাকে স্পর্শও করেনি—এই যূথিকার জবানবন্দী।—উঁচু তাক থেকে পাড়তে গিয়ে একটা ভারী লোহার কড়া মাথায় পড়ে সে নাকি অজ্ঞান হয়ে যায়। আসামী তখন সেখানে উপস্থিত ছিল মাত্র। আর যারা যা বলেছে তা তাদের অনুমান শুধু। পড়শীরা বাইরেই ছিল, মা-ও নিজের চোখে কিছু দেখেননি।

যূথিকার সঙ্গে আর কোন দিন দেখা হয়নি।

এই শহরেই কোথাও সে তবু আছে নিশ্চয়, সুখেও নয় সম্পদে তো নয়ই। কিন্তু বিপদ কি তার আর কখনো আসে না? আর কোন দুর্দিনে হঠাৎ সাহায্য নিতে সে কি আসতে পারে না একবার!

সমস্ত জীবনকে কঠিন শাসনে বেঁধে সম্মান প্রতিপত্তির নিঃসঙ্গ শিখরে উঠে যাকে সমাসীন থাকতে হয়, মনের এরকম অদ্ভুত দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া তার চলে না।

যূথিকাও হয়তো সে কথা জানে। জানে শূন্য-আকাশ-ঘেরা হিম-শীতল চূড়ায় কাদার ছিটে পৌঁছাবার নয়।

ল্যা ভে ণ্ডা র

অন্নদাশঙ্কর রায়

. . . .

সন্ধ্যাবেলাটা বেশ আনন্দে কাটল। ভদ্রলোক স্বয়ং ইংরেজী গান গেয়ে শোনালেন। হাসির গান, কিন্তু নিছক হাসির নয়। ফল্গুধারার মতো প্রচ্ছন্ন ছিল একটা করুণ মধুর স্বর। আর তাঁর স্ত্রী শোনালেন সেকালের রবীন্দ্রসঙ্গীত। 'মায়ার খেলা'য় তিনি অভিনয় করেছিলেন প্রথম বয়সে। তারই অবিস্মরণীয় অবশেষ। আর তাঁর দুই কন্যা শোনালেন মীরার ভজন। দিলীপকুমারের ঢঙে।

তার পরে তাঁরা চার জনে মিলে গাইলেন অতুলপ্রসাদের প্রাণ-মাতানো গান "উঠ গো ভারতলক্ষ্মী"। মনে মনে আমিও তাঁদেও সঙ্গে মিলে গেলুম।

দেশবন্দনার রেশ যখন নিঃশেষ হয়ে এলো তখন আমি ধীরে ধীরে বিদায় নিতে উঠলুম। এসেছিলুম তাঁদের ওখানে 'কল' করতে। পরিচয় দিতে ও নিতে। ভদ্রলোক ওখানকার কলেজের প্রিন্‌সিপাল। আর আমি ভ্রাম্যমাণ ভ্যাকেশন জজ।

"সে কী! আপনি খেয়ে যাবেন না?" বললেন ভদ্রমহিলা। "আপনার জন্যে সমস্ত তৈরি।"

আশ্চর্য হয়ে বললুম, "কিন্তু ওদিকে সারকিট হাউসে—"

"আমি আগে থাকতে বারণ করে পাঠিয়েছি।"

শুধু তাই নয়। ইতিমধ্যে তিনি আমার হাঁড়ির খবর বার করেছিলেন। আমি যে নিরামিষ খাই তাও তাঁর অজানা নয়। আমার কোনো অজুহাত খাটল না। বসতেই হলো আবার।

খাবার টেবিলে দেখলুম ভদ্রলোক খোশগল্পের রাজা। মন্‌গোমরী কী বলেছিলেন চার্চিলকে। চার্চিল কী বলেছিলেন তার উত্তরে। এসব তো শুনতে হলোই, তার উপর শুনতে হলো স্টালিন কেমন হারিয়ে দিয়েছিলেন চার্চিলকে ভোজনপ্রতিযোগিতায়। সে ভারী মজার কথা। তাঁর মতো রসিয়ে রসিয়ে বলতে পারব না তো, গল্পটা মাটি করব। থাক, বলব না।

আহারান্তে অমনি চলে যেতে নেই, একটু দেরি করতে হয়। বসবার ঘরের এক প্রান্তে বিশাল বুকশেল্‌ফ ছিল। সেখানে গিয়ে বইপত্র নাড়াচাড়া করতে

লাগলুম! ইংরেজী ও ফরাসী বই বেশীর ভাগ। কত কালের পুরোনো বই। আজকাল সে-সব বই দেখাও যায় না। দেখতে দেখতে একখানা বইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা ল্যাভেণ্ডারের পল্লব। শুকিয়ে মুড়মুড়ে হয়ে গেছে। হাত দিলে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমার হাতে ল্যাভেণ্ডারের পল্লব পড়তে যাচ্ছে দেখে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। অপ্রস্তুত হয়ে নামিয়ে রাখলুম বইটা। অমনি তিনি ওখানা সরিয়ে রাখলেন একেবারে নাগালের বাইরে। একটা টুলের সাহায্যে।

হঠাৎ তাঁর এই ব্যবহারে আমি হতভম্ব হয়েছিলুম। তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আমার দুটি হাত ধরে মাফ চাইলেন। তখন তাঁর দুই চোখের চাউনি যা হলো তা চিরদিন আমার মনে থাকবে। কী যে করুণ আর কাতর আর তৃষিত! আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "আপনি এখনো যুবক। দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে আপনার সামনে। আর আমি বিগতযৌবন। আমার জীবনও তো শেষ হয়ে এলো।"

কেন ও কথা বললেন ভাবছি। তিনি বলতে লাগলেন, "আমার জীবনে যা গেছে তা গেছে, তা আর ফিরে আসবে না। ওই যে ল্যাভেণ্ডার ও যদি ধুলো হয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে যায় তা হলে আর এ-জীবনে ল্যাভেণ্ডার উপহার পাব না।"

এবার মার্জনা চাইবার পালা আমার। বললুম, "আমাকে ক্ষমা করবেন। বুঝতে পারিনি। না বুঝে অপরাধ করেছি।"

"না, না, অপরাধ কিসের! বলতে গেলে আমারই অপরাধ, আমি ওটা অতিথির হাত থেকে কেড়ে নিয়েছি। ক্ষমা করবেন তো!" রুদ্ধ কণ্ঠে আবেদন করলেন।

আমি তাঁর স্ত্রীর কাছে বিদায় নিতে গেলুম। ভদ্রমহিলা কফি তৈরি করছিলেন। শুনতে পাননি আমাদের কথাবার্তা। তাঁর হাত থেকে কফির পেয়ালা নিয়ে দু'এক চুমুক দিয়ে শুভরাত্রি জানালুম। তাঁকে ও তাঁর কন্যাদের। ভদ্রলোকের দিকে ফিরতেই তিনি বললেন, "চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই।"

এগিয়ে দিতে গিয়ে তিনি আমার সঙ্গে সারকিট হাউস পর্যন্ত হাঁটলেন। বেশী দূর নয়, তা হলেও প্রত্যাশার বাইরে। সারকিট হাউসে পৌঁছে আমি বললুম, "বেয়াদবি মাফ করবেন। সারা সন্ধ্যা মনে হচ্ছিল আপনার মতো সুখী

কে! কিন্তু সেই ল্যাভেণ্ডারের ঘটনাটার পর অন্য রকম মনে হচ্ছে। ওটা না ঘটলেই ভালো হতো।"

তিনি একটু বিশ্রাম করবেন বলে বসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, "সুখ অনেক রকম আছে। এক রকম সুখ আজ আপনি দেখলেন। সত্যি তার মতো সুখ নেই। কিন্তু সেও তার মতো নয়। সেই ল্যাভেণ্ডার উপহার পাওয়ার মতো।"

আমি তাঁকে একটু উস্কে দিলুম। তিনি বললেন, "শুনবেন নাকি ও কথা?"

বললুম, "আপনার যদি আপত্তি না থাকে।"

তিনি এক গ্লাস জল চেয়ে নিলেন। জল রইল তাঁর হাতের কাছে। মাঝে মাঝে গলা ভিজিয়ে নেন আর গল্প বলেন।

২

দু'চোখ বুজে দুই চোখের উপর দুই হাত রেখে টেবিলের উপর কনুই ভর দিয়ে বসলে প্রথমটা সব অন্ধকার দেখায়। তার পরে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে ফুটে ওঠে সাঁঝের শুকতারা। সাঁঝের শুকতারার মতো শুভ্র সুন্দর একখানি মুখ। শুভ্র সুন্দর শুচি। অন্ধকারে ঐ একটি মাত্র তারা।

তার সঙ্গে আমার দেখা হয় পঁচিশ বছর আগে। লণ্ডনে তখনকার দিনে আমাদের বাঙালী সমাজের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল বেলসাইজ পার্কে মিস্টার ও মিসেস তরফদারের বাড়ি। প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় তাঁরা রিসিভ করতেন। সকলে অবশ্য সব শনিবার যেত না। কিন্তু অন্য কোথাও এনগেজমেণ্ট না থাকলে আমি অন্তত আধ ঘণ্টার জন্যে হাজিরা দিয়ে আসতুম।

এমনি এক সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার দেখা। মিস তরফদারের বান্ধবী বলে তার পরিচয়। শুনলুম বেডফোর্ড কলেজে পড়ে। শনিবারটা প্রায়ই তরফদারের সঙ্গে কাটায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তার মেয়াদ। সাধারণত ছ'টার মধ্যে ফিরে যায়। কিন্তু সেদিন কী জানি কেন আটটা পর্যন্ত আটকা পড়েছিল।

আমি উঠছি দেখে মিসেস তরফদার বললেন, "বরুণ, তোমাকে একটা কাজ দিতে পারি? কিছু মনে করবে না তো?"

"কাজ দেবেন, সে তো আমার সৌভাগ্য, মাসিমা। কিছু মনে করব কেন?"

"তা হলে শোন। এই যে পূরবী দেখছ একে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। আজ এর খুব দেরি হয়ে গেছে। তুমি যদি দয়া করে পৌঁছে দাও তো—"

"চিরকৃতজ্ঞ হবেন তো? আচ্ছা, আমি এই সুখকর কর্তব্য স্বীকার করছি।"

সেখানে আরো কয়েক জন গ্যালাণ্ট যুবা ছিল। তারা কেবল ফষ্টি-নষ্টি করতে জানে, কিন্তু হাতের তাস ফেলে একজনও উঠবে না। বসে বসে দু'কথা শুনিয়ে দিল আমাকে। আমি তাদের কথায় কান না দিয়ে পূরবীকে তার ফারকোট গায়ে দিতে সাহায্য করলুম ও বাইরে যাবার জন্যে দরজা খুলে ধরলুম।

সেদিন বেশ বৃষ্টি পড়ছিল মনে আছে। ছাতা ছিল আমার সঙ্গে। তুলে ধরলুম ওর মাথায়। ওর ছাতা ও সঙ্গে আনতে ভুলে গেছল। ফিরে গিয়ে নিয়ে আসবার মতো সময় ছিল না। বেলসাইজ পার্ক টিউব স্টেশনে ওকে ট্রেন ধরতে হবে।

স্টেশনে পৌঁছে পূরবী বলল, "আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এটুকুরও দরকার ছিল না। তবে আপনি এই দিকে আসছিলেন বলে মাসিমা আপনাকে এ কাজ দেন। তাঁর মতে লণ্ডনের রাস্তায় বিদেশিনী মেয়েদের একা চলাফেরা করতে দেওয়া উচিত নয় এত রাত্রে।"

আমি বললুম, "মাসিমার সাংসারিক অভিজ্ঞতা আপনার চেয়ে বেশী।"

সেদিন আমি ওকে বেডফোর্ড কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে দিলুম। পথে ওর সঙ্গে কত রকম কথাবার্তা হলো। ভারী ভালো লাগল ওর সঙ্গ, ওর স্বভাব। আমার ধারণা ছিল আমাদের দেশের সুন্দর মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, বিয়ে যাদের হয় না তারাই বেশী লেখাপড়া করে ও তাদের কেউ কেউ বিলেত পর্যন্ত আসে। কিন্তু পূরবীকে দেখে আমার সে ধারণা বদলে গেল। সে ডানাকাটা পরী না হলেও তার রূপ দু'দণ্ড চেয়ে দেখবার মতো।

সেদিন বাসায় ফিরে গিয়ে সারা রাত তার কথা ভেবেছি ও তাকে স্বপ্ন দেখেছি। মনে হয়েছে তার সঙ্গে আমার আলাপ একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। আছে এর পিছনে গ্রহতারার চক্রান্ত। নইলে কেনই বা সে আটটা অবধি আটকা পড়বে, এত লোক থাকতে আমাকেই বা কেন তার পার্শ্বরক্ষী হতে

হবে ? অদৃষ্ট আমাদের দু'জনকে একসূত্রে গাঁথতে চায়। তা ছাড়া আর কী এর ব্যাখ্যা !

পরের শনিবারের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে কেমন করে যে সাত-সাতটা দিন পার করে দিলুম তার হিসেব নেই। একটু সকাল-সকাল গিয়ে দেখি যাবার জন্যে পূরবী তৈরি হয়ে বসে আছে। মাসিমা বললেন, "বরুণ, তোমার কথাই হচ্ছিল। কিন্তু আজ আর তোমাকে কষ্ট দেব না। তুমি অনেক দূর থেকে এসেছো, একটু বিশ্রাম করো, একটু কিছু খাও। জিতেন সঙ্গে যাক পূরবীর।"

"না, মাসিমা, কাউকে যেতে হবে না আমার সঙ্গে। এই তো সবে ছ'টা বাজল।" পূরবী একাই যেতে উদ্যত।

এক খাব্‌লা চীনেবাদাম মুখে পুরে এক রাশ চকোলেট পকেটে ভরে হাঁউমাউ করে আমি বললুম, "আমার খাওয়া হয়েছে, মাসিমা। আমিই যাচ্ছি এর সঙ্গে।"

জিতেন তো আমার দশা দেখে হেসে ফেলল। রুমাল দিয়ে আমার দুটো হাত বেঁধে বলল, "চলো, তোমাকে পুলিশে দিয়ে আসি বমাল সমেত।"

মাসিমা বললেন, "বমাল মানে কি চকোলেট না—" পূরবীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।

কয়েক শনিবার পরে পূরবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর পাঁচ জনে মেনে নিল। পূরবী আমার গার্ল, আমি তার beau ; আমাদের বিয়ে হবে একদিন-না-একদিন। উৎসাহ এলো মাসিমার কাছ থেকে। কিন্তু পূরবী এ বিষয়ে নীরব। সে কিন্তু আমার সঙ্গেই মেশে সব চেয়ে বেশী, আমার সঙ্গে থিয়েটারে যায়, বাসের উপর তলায় বসে শহর বেড়িয়ে আসে। অথচ আমার সঙ্গে এমন একটা দূরত্ব রেখে চলে যে আমি অবাক হয়ে যাই তার ব্যবহার দেখে। আর পাঁচ জনে আমাকে মনে মনে হিংসা করছে, কিন্তু আমি কি তাদের হিংসার যোগ্য !

ভেবেছিলুম পূরবীকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করব, আমার সঙ্গে এনগেজ্‌মেণ্ট সম্বন্ধে তার কী মত। কিন্তু কিছুতেই ও কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোলো না। শেষে একখানা চিঠি লিখে সাতপাঁচ ভেবে ডাকে দিলুম।

জীবনে সেই আমার প্রথম প্রেমপত্র। তাতে ওকে কী বলে সম্বোধন করেছিলুম, শুনবেন ? এঞ্জেল বলে। বলা বাহুল্য চিঠিখানা ইংরেজীতে লেখা।

পূরবী তার উত্তরই দিল না।

পরে যেদিন দেখা হলো জানতে চেয়েছিলুম চিঠিখানা ওর হাতে পড়েছে কি না। ওর মুখখানা আরক্ত না হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, "তুমি কি জানতে না যে আমি হস্‌টেলে থাকি? আর কখনো অমন কাজ কোরো না।"

প্রথম পত্রের এই পরিণামের পর দ্বিতীয় পত্র লিখতে আমার সাহস হয়নি। কাজ কী এনগেজ্‌মেণ্টের প্রসঙ্গ তুলে? বাক্যে না হোক, কার্যে কি আমরা এনগেজ্‌ড নয়? পূরবী আমাকে বাক্য দেয়নি, আমিও দিইনি তাকে। কিন্তু আমরা তো পরস্পরের মন বুঝি। তবে আর কী? লোকটা আমি কৃত্রিমতার পক্ষপাতী নই।

এনগেজড না হয়েই আমরা এনগেজ্‌ড বলে বন্ধুমহলে গৃহীত হলুম। তবে নিজেদের কাছে ঠিক এনগেজ্‌ডের অধিকার পেলুম না। চুম্বন করতে গিয়ে অদৃশ্য বাধা বোধ করেছি। এঞ্জেলকে চুম্বন করতে সাহস হয়নি। যদি সে কিছু মনে করে। যদি বলে, "আমি কি এতই সুলভ? আমাকে তুমি কী পেয়েছ?"

আপনাকে খুলে বলতে দোষ নেই। আমাদের ভালোবাসা সম্পূর্ণ প্লেটোনিক। তা বলে কম সত্য বা কম গভীর নয়। তাকে না দেখতে পেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত। দেখা হলে প্রাণ ফিরে আসত। তার চোখে মুখে যা লক্ষ্য করেছি তা আমার সঙ্গ পেয়ে সহজ আনন্দ। সে আর কারো দিকে ফিরেও তাকাত না। আমার চোখে চোখ পড়লে তার চোখের তারা জ্বলে উঠত। অনেক সময় ভেবেছি এ কি প্রেম, না এক প্রকার বন্ধুতা? কিন্তু পরীক্ষায় ফেলে দেখেছি প্রেমই বটে। একবার বেলসাইজ পার্কে যাইনি। সে ছুটে এসেছিল হাইগেটে আমার বাসায় আমার খোঁজ নিতে।

তখনকার দিনে মেলামেশা অত অবাধ ছিল না। সেইজন্যে আমার বাসায় তার ছুটে আসা বলতে কতখানি ত্যাগস্বীকার ও বিপদবরণ বোঝায়, তা একালের ছেলেমেয়ের কল্পনার অতীত। আমার ল্যাণ্ডলেডী তো স্তম্ভিত। পরে আমাকে বলেছিল, "মেয়েটি দেখছি মরিয়ার মতো প্রেমে পড়েছে তোমার। আহা! কী মধুর মেয়েটি!"

ও আমার জন্যে একটা স্কার্ফ বুনে উপহার দিয়েছিল, সেটা ল্যাণ্ডলেডীর নজর এড়ায়নি। বুড়ী বলল, "এর মতো উপহার তোমার কী আছে দেবার? বাজার থেকে কিনে দিতে যে-কোনো লোক পারে।"

বললুম, "আমি তো বুনতে জানিনে। আঁকতেও জানিনে ছাই। আমি আর কী দিতে পারি?"

বুড়ী বলল, "তুমি তো বেশ রাঁধতে পারো দেখি। রেঁধে খাওয়াও না কেন ওকে?"

চমৎকার আইডিয়া। পরের শনিবার নিমন্ত্রণ করলুম পূরবীকে। সে খুশি হয়ে এলো। এখন থেকে প্রায় শনিবার ওর নিমন্ত্রণ আমার সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজনের। তার পরে মাসিমার ওখানে। রান্নাটা অবশ্য একতরফা নয়। সেও যোগ দিত। কী যে আনন্দ পেয়েছি সেই কয়েক মাস! যতই ওর সঙ্গে মিশতে পাই, ততই বুঝতে পারি ওর সঙ্গে যদি বিয়ে হয় তবে সারা জীবনটা কেটে যাবে কয়েকটা মাসের মতো।

পূরবী কিন্তু বিয়ের কথা ভুলেও মুখে আনে না। কথা উঠলে এড়িয়ে যায়। আমি যদি বলি, আমাদের দু'জনের এই আনন্দকে জীবনব্যাপী করতে হলে বিয়ে না করে উপায় কী, সে বলে, আচ্ছা বিয়ে-পাগলা বুড়ো যা হোক।

কিছুদিন পরীক্ষা নিয়ে মহা ব্যস্ত ছিলুম। দেখা হয়নি। পরীক্ষার পরে তরফদার মাসিমা বললেন, "এবার তো দেশে ফেরার সময় হয়ে এলো তোমার। তার আগে একটু ঘোরাঘুরি করবে না?"

আমিও সেই কথা ভাবছিলুম। কন্টিনেণ্টে ঘুরতে চাই। কিন্তু পূরবী কি যেতে রাজী হবে? সে না গেলে আমি কী করে যাই? তার কাছাকাছি থাকতে হবে যে। পূরবীর পড়া আরো এক বছর বাকী। সে আপাতত দেশে ফিরছে না। একা ফিরতে হবে আমাকেই। সেইজন্যে এই দুটি মাস তার কাছাকাছি থাকা এত জরুরি। কন্টিনেণ্টে বেড়ানো অবশ্য আমার অনেক দিনের শখ। কিন্তু দুটোর মধ্যে একটা যদি বেছে নিতে হয় তবে পূরবীর কাছাকাছি থাকা আরো জরুরি।

পূরবীর কানে গেল এ কথা। সে বলল, "বুড়ো, এ তোমার নতুন এক পাগলামি। আবার কবে এ দেশে আসবে! হয়তো এ জীবনে নয়। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে পশ্তাবে। যাও, কন্টিনেণ্ট দেখে নাও।"

ভয়ে ভয়ে বললুম, "তুমি যাও তো আমি যাই।"

সে হাসল। "পড়োনি রবি ঠাকুর কী লিখেছেন? পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নহিলে খরচ বাড়ে।"

পড়েছি। সত্যি, গুরুদেব যদি আর কিছু না লিখে শুধু ঐ একটি পংক্তি

লিখে থাকতেন তা হলেও তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত হতো। ঐ একটি উক্তির দাম লাখ টাকা। আমার পকেট তখন গড়ের মাঠ। ধারকর্জ করে কোনো মতে একজনের কন্টিনেণ্ট বেড়ানো চলে। দু'জনের জন্যে কার কাছে হাত পাতি?

ও যে আমাকে পতি বলে স্বীকার করে নিল এর জন্যে আমার আনন্দের সীমা রইল না। ওর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে দেখলুম আনন্দটা পারস্পরিক।

বললুম, "পতির পুণ্যে কাজ নেই। আমি যাব না। শেষ দুটো মাস সতীর কাছাকাছি কাটাব।"

তার দৃষ্টির দীপ থরথর করে কাঁপল। সে বলল, "আমি যাচ্ছি মেরিয়নের সঙ্গে পাড়াগাঁয়ে থাকতে। তার অতিথি হয়ে। তুমি থাকবে কোথায়?"

তাই তো। আমি থাকব কোথায়? আর থাকতে ভালো লাগবে কেন পাড়া-গাঁয়ে পাক্কা দু'মাস? ও মেয়েরাই পারে। আমরা পুরুষ, আমরা সুদূরের পিয়াসী।

চললুম কন্টিনেণ্ট বেড়াতে। একা একা ভালো লাগে না, দল জুটিয়ে নিলুম। হৈ হৈ করে আমরা কয়েকজন যুবক আজ এখানে যাই, কাল ওখানে যাই, খরচ বাঁচানোর জন্যে ট্রেনে রাত কাটাই, কিংবা সরাইখানায়, কিংবা হস্‌পিসে। এই জন্যেই বলে পথি নারী বিবর্জিতা। পূরবীকে সঙ্গে আনলে অর্ধেক ফুর্তি বাদ পড়ত, জীবনটা সেই পরিমাপে নীরস হতো। কোথায় কাফে, কোথায় কাবারে, কোথায় চোরডাকাতের আস্তানা। আমি ও আমার থ্রী মাস্‌কেটীয়ার্স মিলে কত বার বিপদের সন্ধানে গেছি, সামনে পড়েছি। দৈবাৎ রক্ষা পেয়েছি। সে ছিল বটে একটা বয়স। সে-সব দিন আর ফিরবে না।

ফ্রান্স থেকে জার্মানী, জার্মানী থেকে অস্ট্রিয়া, অস্ট্রিয়া থেকে সুইটজার-ল্যাণ্ড, সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ইটালী, ইটালী থেকে আবার ফ্রান্স হয়ে ইংলণ্ড। পূরবীর জন্যেই ইংলণ্ডে ফেরা, নইলে কোনো দরকার ছিল না।

বিদায় নিতে গেলুম ইস্টবোর্নে। সেখানে সে তরফদারদের অতিথি। আমাকে দেখে তার দৃষ্টিপ্রদীপ উজ্জ্বল হলো। বলল, "খুব উপভোগ করলে?"

সত্যি খুব উপভোগ করেছিলুম, কিন্তু সত্য গোপন করাই বোধ হয় সুবুদ্ধি। বললুম, "কই আর উপভোগ করলুম! তুমি ছিলে না।"

সে হেসে বলল, "কথাটা পতির মতোই হলো। আদর্শ পতির।"

ধরা পড়ে গেলুম। সাফাই মুখে জোগাল না। বললুম, "তুমি কিন্তু শুকিয়ে গেছ।"

সে ঈষৎ কুপিত হয়ে বলল, "বরুণ, থাক। পতিগিরি যথেষ্ট হয়েছে।"

সমুদ্রের ধারে বসে দু'জনে দু'জনকে হৃদয় খুলে দেখিয়েছিলুম সেই এক দিন। গোধূলি যেন ফুরোতে চায় না। শরৎ গোধূলি।

বললুম, "পূরবী, তোমার উপরে নির্ভর করছে আমার জীবনের সুখ সার্থকতা। তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো তা হলে যে আমি বাঁচব না তা নয়, কিন্তু জীবনে আমার সুধা থাকবে না। সুধার বদলে থাকবে সুরা। হৈচৈ, উত্তেজনা, নিজেকে মাতিয়ে রাখা, তোমাকে ভুলে থাকা। যে ভাবে এই দু'মাস কাটল।"

সে অনেকক্ষণ নীরব থাকল। তার পর ক্ষীণ স্বরে বলল, "তুমি বিয়ে করোনি, বিয়ের ভিতর দিয়ে যাওনি, তাই বিয়ে তোমার কাছে একটা সুখস্বপ্ন। আমার কাছেও এক দিন সুখস্বপ্ন ছিল। এখন কিন্তু দুঃস্বপ্ন।"

আমি চমকে উঠলুম। এ কী শুনছি! তা হলে কি সে বিবাহিতা!

"হাঁ, যা ভেবেছ। এত দিন তোমাকে বলিনি। বলার সময় আসেনি। আজ না বললে নয়। আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে, বিয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। চাও তো সব খুলে বলতে পারি, কিন্তু কী হবে ইল্লৎ ঘেঁটে! জেনে নাও যে আমার সুখস্বপ্ন ভেঙে গেছে। যা দেখেছি তার থেকে আমার এই প্রতীতি হয়েছে যে বিয়ের পরে মানুষের পতন হয়। দু'বছর পরে এক দিন হিসাবনিকাশ করে দেখলুম আমি ছোট হয়ে গেছি, আমার স্বামী আমার চেয়েও ছোট। তাঁর কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে এলুম এ দেশে। কিছু স্ত্রীধন ছিল। পড়াশুনা করছি, পাশ করলে চাকরি পাব আশা করি। স্বামীকে অনুমতি দিয়ে এসেছি আবার বিয়ে করতে। তিনি করেছেনও।"

হতবাক হয়ে শুনছিলুম। এ কি সত্য, না আমাকে ভোলাবার জন্যে স্তোকবাক্য! সোজা বললেই পারে আমাকে বিয়ে করতে তার ইচ্ছা নেই, আমি তার অযোগ্য। কিন্তু এসব বানিয়ে বলা কেন? আমার চোখে ধুলো দেওয়া কি অত সহজ?

"বিয়ে করে থাকলে তোমার নাম হতো মিসেস অমুক। কিন্তু তা তো নয়। মিস চৌধুরী তোমার নাম।"

"সেটা আমার কুমারী অবস্থার নাম। ইউনিভার্সিটির কাগজপত্রে সেই নাম ছিল। এখানে নাম লেখাবার সময় কাগজপত্র বদলাইনি। সহপাঠিনীরা জানে আমি মিস চৌধুরী। মণিকা সেই নাম তার বাড়িতে প্রচার করে দিয়েছে। সকলে সেই নামে ডাকে। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে তার প্রতিবাদ

করিনি। কেনই বা করব? বিয়ে তো আমার চুকে গেছে। আমি তো আর বিবাহিতা নই।"

কান্না আমার বুকে আছাড় খাচ্ছিল। আর একটু হলে চোখের বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। একরাশ বিদেশীর সমুখে কান্নায় গলে যাব, আমি কি এতই নরম!

মূকের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম তার মুখে। সে বলতে লাগল, "আমি তোমাকে ঠকাতে চাইনি, ঠকাইনি। তুমি আমাকে ভালো-বাসো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাদের ভালোবাসা আমাদের উন্নত করেছে। হিসাবনিকাশ করলে দেখবে তুমি ও আমি কেউ কাউকে ছোট করিনি, ছোট হইনি। দু'জনেরই উচ্চতা বেড়ে গেছে।"

আমি তা স্বীকার করলুম। কিন্তু আমার আকাশজোড়া কেল্লা যে ধ্বসে গেল। একটা দিনের একটা মুখের কথায় এত বড় পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি হবে! এটা কেমন করে মেনে নিই! ক্ষোভ আর অভিমান আমাকে বিদ্রোহী করেছিল।

"তুমি যদি চাও," সে তার অমিয়মাখা স্বরে বলতে লাগল, "তবে আমাদের এখনকার এই সম্বন্ধ চিরদিনের হতে পারে। আমিও বিয়ে করব না, তুমিও বিয়ে করবে না। এই ইংলণ্ডেই কাজকর্ম খুঁজে নেব দু'জনে। এমনি কাছা-কাছি থাকব। এমনি ভালোবাসব। এর চেয়ে মধুর সম্বন্ধ আর কী হতে পারে! কিন্তু আমি তোমাকে বলব না একে চিরন্তন করতে। আমি জানি তুমি সুখস্বপ্ন দেখছ। আমাকে ঘিরে ততটা নয় বিয়েকে ঘিরে যতটা। যাও তবে, বিয়ে করো একটি মনের মতো মেয়ে। সুখী হও। আমার অন্তরের প্রার্থনা তুমি সুখী হও।"

এর পরে আমাদের বিদায়। বিদায়ের দিন সে আমাকে একখানি বই উপহার দেয়, কবিতার বই, ক্রিস্টিনা রোজেটির। তাতে গোঁজা ছিল একটি ল্যাভেণ্ডারের পল্লব।

৩

গল্প শেষ হয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি। জানতে চাইলুম, "তার পরে?"

"তার পরে?" ভদ্রলোক কী বলবেন খুঁজে পেলেন না। "তার পরে আমি সুখী হলুম, সফল হলুম। দেখছেন তো কেমন সুখী পরিবার আমার?

চাকরিটাও সুখের চাকরি। দেদার বই কিনি আর পড়ি। গান শুনি আর করি। ছেলেরা মাঝে মাঝে দিক করে। ধর্মঘটের ভয় দেখায়। আমিও ভয় দেখাই ইস্তফার। আমার দিন তো প্রায় হয়ে এলো। সামনের বছর রিটায়ার করছি। কোথায় বসব, বলতে পারেন? কলকাতায় যা ভিড়।"

রাত হয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে ভদ্রমহিলা নিশ্চয় ঘনঘন ঘড়ি দেখছেন। শুধু একটি জিজ্ঞাসা ছিল। পূরবী দেবীর কী হলো?

"বিলেতেই রয়ে গেল। এখনো সেইখানেই আছে। বড়দিনের সময় কার্ড পাঠাই, কার্ড পাই।"

কামিনীকাঞ্চন

দা ম্প ত্য সী মা ন্তে

সতীনাথ ভাদুড়ী

. . . .

মাছি ছোটে দূষিত ক্ষতের গন্ধ পেয়ে। নিবারণও চেষ্টা-তদবির করে বদলি হয়েছিল আজবপুর পোস্টাফিসে। ডাক-তার-বিভাগের খবর, সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় পার্সেল, বিলি না হয়ে ফেরত যায়, এই পোস্টাফিস থেকে।

সত্যই আজব জায়গা আজবপুর। আধখানা পড়ে ভারতে, আধখানা নেপালে। নেপালের লোক এই স্টেশন থেকে রেলগাড়িতে চড়ে; এখানকার পোস্টাফিসে চিঠি ফেলতে আসে। এখানকার লোক নেপালে বাজার করতে যায়; মদ খেতে যায়। কাজেই এখানকার লোকের চালচলনও অন্যরকমের। এরা ভোজালি দিয়ে তরকারি কোটে; পুলিসের লোক দেখলে ভয় পায় না; আবগারী-বিভাগের লোক দেখলে হেসে পানের দোকানে নিয়ে যায়। এইরকম আবহাওয়াই নিবারণ পোস্টমাস্টারের পছন্দ।

অসীমার পছন্দ নয়; কিন্তু উপায় কি। যেমন মানুষের হাতে মা-বাপ তাকে সঁপে দিয়েছে! ছোটবেলায় ঠাকুমা নাতনীকে ঠাট্টা করে বলতেন— 'দেখিস, তোর সঙ্গে এমন বরের বিয়ে দেবো যে, সে রাতে মদ খেয়ে এসে তোকে লাঠিপেটা করবে।' অসীমা বলত—'ইস্! ঝাঁটা মেরে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবো না!' তার কপালে ঠাকুমার কথাই ফলল শেষ পর্যন্ত!

বিয়ের পর প্রথম যেদিন জানতে পারে স্বামীর নেশা করার কথা, সেদিন খুব কেঁদেছিল। অমন সুন্দর যার চেহারা, সে মানুষে আবার মদ খায়!

তারপর গত সাত বছরে আরও কত কি জেনেছে, কত কি শিখেছে, কত কি করেছে। যার স্বামীর নেশার খরচ মাইনের চেয়েও বেশি, তাকে অনেক কিছু নতুন করে শিখতে হয়। ইচ্ছা থাক, আর না-ই থাক।

এখানকার লোকে পোস্টমাস্টারকে মাস্টার-সাহাব বলে। সেইজন্যই বোধহয় সে প্রথম রাত্রিতেই স্ত্রীর উপর মাস্টারি ফলিয়েছিল, শিখিয়ে পড়িয়ে তাকে একটু চালাক-চতুর করে নেবার সদুদ্দেশ্যে। বলেছিল, "হাবাতেদের সঙ্গে খবরদার আলাপ কোরো না! আলাপ-পরিচয় করতে হয় তো বড়লোকের সঙ্গে। যার হাতে কিছু আছে, তার হাত থেকেই না কিছু আসতে পারে। আমল না পেলেও বড়লোকের বাড়ির আড্ডার এক কোনায় আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি প্রত্যহ, খবরের কাগজের উপর মুখ গুঁজে। সময়ে কাজে লেগেছে।"

তখনই অসীমার মনে হয়েছিল—এমন কার্তিকের মত যার চেহারা, স্বভাব তার এমন কেন? আগে থেকে এত মতলব ফেঁদে কি সবাই কাজ করতে পারে?

যে স্বামী প্রথম রাত্রিতেই এই কথা বলে, সে যে শুধু মুখের উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত থাকবে না, এ জানা কথা। এখানে আসবার পরই নেপালবাজারের শেঠজীকে একদিন বাড়িতে এনে পরিচয় করিয়ে দিল অসীমার সঙ্গে। তারপর একটু চায়ের জল চড়াতে বলে বেরিয়ে গেল থলে নিয়ে বাজার করতে। ফিরল ঘণ্টা দুয়েক পর।

উপরওয়ালা 'ইন্সপেক্শন'এ এলে, তার জন্যও হুবহু এই ব্যবস্থা।

এ স্বামীকে চিনতে কি কারও দেরি লাগে। সবচেয়ে খারাপ লাগে তার সম্বন্ধে স্বামীর এই নিস্পৃহতার ভাব। সে দেখতে সুরূপা নয়। সেই জন্যই বোধহয় তার মনের এই দিকটা আরও বেশি স্পর্শাতুর। তবে নিবারণ রাত্রিতে আটটার মধ্যে বাড়ি ফেরে, এত দুঃখের মধ্যেও এইটাই তার একমাত্র সান্ত্বনা।

কিন্তু আজ হল কি?

সমীর ঠাকুরপো সেই সাড়ে-সাতটা থেকে যাই-যাই করছে। সে বলেছে, 'বোসো না। এত কি বাড়ি যাবার জন্য তাড়া পড়েছে! তবু তো এখনও বিয়ে করনি। তোমার দাদাকে আসতে দাও, তারপর যেও।'

বেশ লাগে তার সমীর ঠাকুরপোর সঙ্গে গল্প করতে। রেলস্টেশনের মালবাবুর ভাই। আই. কম. পাস করে চাকরির চেষ্টা করছে। রোজ আসে। রান্নাঘরে বসে বউদির সঙ্গে গল্প করে।

আটটা বাজল, নটা বাজল। তবু নিবারণের ফেরবার নাম নেই। অসীমা জানে যে নিবারণ আজ আলোয়ান মুড়ি দিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আজ কিছু কাঁচা পয়সা সে হাতে পাবে। সেইজন্যই দেরি হচ্ছে না তো? ছ'বছরের ছেলে ফনটে; সে অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারবে কেন। খাওয়া হলে, সবাই এল শোবার ঘরে। ঘরের কোনায় স্বামীর খাবার ঢেকে রেখে আবার তারা বসল সুখদুঃখের গল্প করতে। জিমি কুকুরটা অনবরত ডাকছে।

দশটা বাজল। তবু নিবারণ আসে না। মশারির ভিতর কেন যেন ফনটের ঘুম আসছে না আজ কিছুতেই।

"কটায় খাও তুমি রোজ ঠাকুরপো?"

"ঘরে রুটি ঢাকা থাকে, যখন খুশি খাই।"

"তবে আর এত উসখুস করছ কেন যাবার জন্য?"

"না, অনেক রাত হল। দাদার আজ হল কি?"

"কে জানে! কোথাও কোন ড্রেনেটেনে পড়ে রয়েছে বোধহয়!"

কথার মধ্যে বিরক্তি সুস্পষ্ট। নিবারণের মদ খাওয়ার কথা এখানে সবাই জানে। একথা বলতে সমীর ঠাকুরপোর কাছে লজ্জা নাই। পাছে আবার সমীর নিবারণের বাইরে রাত কাটানোর অন্য অর্থ করে নেয়; সেইজন্যই অসীমা মদ খাওয়ার দিকটার উপর জোর দিয়ে কথাটা বলল। স্বামী বাইরে রাত কাটায়, একথার জানাজানিতে শুধু বাইরের লোকের কাছেই লজ্জা নয়, নিজের কাছেও নিজে ছোট হয়ে যেতে হয়।

হঠাৎ অসীমার খেয়াল হল যে, ফনটের সম্মুখে তার বাপের মদ খাওয়ার গল্প করাটা ঠিক নয়। "চল ঠাকুরপো, আমরা ও-ঘরে গিয়ে বসি। কি রে ফনটে, তোর ভয় করবে না তো আমরা ও-ঘরে গিয়ে বসলে? মাঝের দরজা তো খোলাই থাকল।"

মাঝের দরজা খুলে তারা গিয়ে বসল পোস্টাফিসের ঘরে। "জিমি! চুপ করলি না! জ্বালাতন!"

এই মানসিক অবস্থা; এমন দরদী শ্রোতা; নিজের দুঃখের কথা বলবার সময় অসীমার চোখের জল বাধা মানেনি। এগারটার পর সে নিজে থেকেই

সমীরকে চলে যেতে বলেছিল। যাবার সময় সমীর আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিল—"দাদা রাত্রিতে আসবেন ঠিকই। বারোটা-একটা হতে পারে।"

"সে তো নিশ্চয়ই।"

বলেই নিজের কানেই বেখাপ লাগল কথাটা। এত জোর দিয়ে ও-কথা বলবার কোন দরকার ছিল না। শুধু সমীরকে কেন, নিজের মনকেও সে ফাঁকি দিতে চায়। নিজেকে স্তোক দেবার জন্য ঘরের আলোটা শোবার আগে নেবাল না। নেবানোর অর্থ হত, নিবারণ যে আজ আসবেও না, খাবেও না, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ।...খাটের তলায় ইঁদুর খুটখুট করে। ডাকঘরে ঘড়ি বাজে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে কত কি ভাবে; আর চোখের জলে বালিশ ভেজে সারারাত।...পণ্যমূল্যের অতিরিক্ত তার কি আর কোন দামই নাই স্বামীর চোখে?...স্বামী সব চেয়ে বেশি ভালবাসে মদ। তারপর টাকা। কিন্তু তারপর?...

জিমিটারও আজ হল কি? সেও সারারাত ডেকে ডেকে সারা।

শেষ রাত্রিতে চোখের পাতা কখন যেন বুজে এসেছিল। ঘুম ভাঙল হঠাৎ। এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। ফনটে হাত দিয়ে ঠেলছে। দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ। মনের তিক্ততা ঘুমিয়েও কাটেনি। কড়ানাড়ার শব্দের অধীর রূঢ়তা, মেজাজ আরও খারাপ করে দেয় অসীমার।

"জেগে রয়েছিস—উঠে দরজাটা খুলে দিতে পারিস না! বুড়ো ধাড়ি ছেলে!"

চুল ধরে টানাটা এত অপ্রত্যাশিত এই ভোরবেলাতে যে ফনটে কাঁদতে ভুলে গেল।

...রামদেনীর মা কড়া নাড়লে এর আগেও তো কতদিন মাকে ডেকে তুলে দিয়েছে। তার জন্য কোনদিন তো মাকে রাগ করতে দেখেনি।...মশারি থেকে বেরিয়ে, দুমদুম করে পা ফেলে মা দরজা খুলে দিতে গেল। খটাং করে শব্দ হল। রাগ করে খিল খুললে ওই রকম শব্দ হয়। জিমিটা নিশ্চয়ই ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। ওকি! মা এমন দৌড়িয়ে ঘরে ঢুকলো কেন? বিড়াল আসেনি তো।...মা খপ করে একখান পুরনো খবরের কাগজ টেনে নিল। ঢাকা তুলে বাবার জন্য রাখা ভাতগুলোকে খবরের কাগজের উপর ঢালছে। খবরের কাগজে আবার ভাত রাখে নাকি লোকে? জিমির জন্য নিশ্চয়ই। মা আড়চোখে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। মা মিছামিছি ভয় পাচ্ছে,

জিমি বুঝি এখনই ঘরে ঢুকে ওই ভাত খেয়ে নেবে। জিমি যে চলে গিয়েছে বাইরে।…

মশারির ভিতর থেকে ফনটে সব দেখছে। যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। মার কাণ্ডকারখানা আজ সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

…একমুঠো ভাত মা আবার থালায় রাখল। ডাল-তরকারি দিয়ে মেখে সেই ভাতের দলাটাকে সারা থালার উপর একবার বুলিয়ে নিচ্ছে। ডাঁটা চড়চড়িটা থালার একপাশে রেখে আঙুল দিয়ে একটু ছড়িয়ে দিল। মা দরজার দিকে তাকাচ্ছে ভয়ে ভয়ে। একবার মশারির দিকেও তাকাল। ওকি! মা ডাঁটা চিবুচ্ছে! এই সাতসকালে! বাসিমুখে! ভুল দেখছে নাকি সে? না, ওই তো ডাঁটার ছিবড়ে বার করে থালার ওপর রাখলে। মা তার মশারির দিকে তাকাচ্ছে। এরকম সময় মার দিকে তাকাতে নাই; লজ্জা পাবে। তাই ফনটে চোখ ফেরাল জানলার দিকে। রামদেনীর মা আসছে জানলার দিকে।…

অসীমা সত্যই তাকিয়েছিল মশারির দিকে। সে দেখছিল, বাইরে থেকে বোঝা যায় নাকি, এখন মশারির ভিতর কে আছে না আছে। না। যাক! তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছে কোথায় অসীমা। মুহূর্তের মধ্যে সে কতদিক সামলাবে। তার মত অবস্থায় যে পড়েছে সে-ই জানে। সে বুঝতে পারেনি যে দরজার কড়া নাড়ছিল রামদেনীর মা। ভেবেছিল বুঝি ফনটের বাবা। হঠাৎ ঘুম ভাঙবার পর ঠাহর পায়নি। ভাগ্যে ঠিকেঝি রামদেনীর মা কোনদিনই শোবার ঘরে ঢোকে না।

জল খানিকটা মেঝেতে ফেলে, ডালতরকারি-মাখানো হাতটা ডুবিয়ে ধুয়ে নিল গ্লাসের মধ্যে অসীমা। রামদেনীর মা দোর-গোড়ায়। এঁটো থালা-বাসনগুলো তার হাতে দেবার সময় অসীমা চোখ নামিয়ে নেয়। কুয়াতলায় মুখ ধুতে যাবার আগে শোবার ঘরের দরজা আবজে দিতে ভোলে না। স্বামী রাত্রিতে ফেরেনি এই কথাটা ঝিকে জানতে দিতে চায় না সে।

বীরবাহাদুর নেপালী বাইরে থেকে ডাকে, "মাইজী!"

এই ডাকঘরের ঠিকানায় নেপাল এলাকার যে-সমস্ত চিঠিপত্র আসে, সেগুলোকে ঘরোয়া ব্যবস্থায় বিলি করবার জন্য বীরবাহাদুর প্রত্যহ নিয়ে যায়। তার কাঁধে ডাকের ঝুলি। জিমি লেজ নাড়তে নাড়তে তার গায়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। রামদেনীর মা কাজ সেরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বীরবাহাদুরকে বলে গেল—"আজ বোধহয় একটু দেরি হবে মাস্টারসাহেবের। এখনও ঘুমুচ্ছেন।

কাল রাতে বোধহয় চলেছে খুব।" বোতল থেকে মদ ঢালবার মুদ্রা দেখিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায়।

অসীমা এসে দাঁড়িয়েছে।

"বীরবাহাদুর, তুই একটু ঘুরে-ঘেরে আয়।"

ঠোঁটের কোনায় হাসি এনে চোখের ইশারায় বীরবাহাদুর বুঝিয়ে দিল যে রামদেনীর মা বহুদূরে চলে গিয়েছে; অত সাবধান হয়ে কথা বলবার দরকার আর নাই।

"মাস্টারসাহেবের কথাতেই তাড়াতাড়ি এলাম সাইকেলে। তিনি আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। হেঁটে আসছেন কিনা।"

কেন তাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়েছে সেকথার কোন মূল্য নাই অসীমার কাছে।

"দেখা হল কোথায় মাস্টারসাহেবের সঙ্গে?" জিজ্ঞাসা করবার সময় কুণ্ঠায় বীরবাহাদুরের মুখের দিকে সে তাকাতে পারে না।

"আমার বাড়িতেই তো তিনি সারারাত।"

মনটা হালকা হালকা লাগে।

"সারা-রাত?"

বীরবাহাদুর অধৈর্য হয়ে পড়েছে। মাথায় তার গুরুদায়িত্ব! ডাকের থলে থেকে একটা পার্সেল বার করতে করতে বলে—"এটাকে দেবার জন্য কাল রাতেও একবার এসেছিলাম।"

"রাত্রিতে? ক'টার সময়? কেন? খুব দরকারী নাকি?"

"দরকারী না হলে কি আর অত রাতে নিয়ে এসেছিলাম। মাস্টারসাহেব তখন নেশায় চুর। উনি কি তখন আসতে পারেন।"

"তবে রাত্রিতে দিলি না কেন?"

একটু দ্বিধাজড়িত স্বরে সে বলল—"দেখলাম ডাকঘরের মধ্যে আপনি আর মালবাবুর ভাই গল্প করছেন। বাইরের লোকের সম্মুখে তো জিনিসটা দিতে পারি না আপনার হাতে। রাতদুপুরে পোস্টাফিসের সম্মুখে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকারও বিপদ আছে। তাই চলে যেতে হল। গিয়ে মাস্টারসাহেবকে বলতেই তিনি চটে আগুন মালবাবুর ভাইয়ের উপর। ওই নেশার মধ্যেও জ্ঞান টনটনে। বলে, ভোজালি লে আও বীরবাহাদুর! অভী লে আও! খুন করব ছোঁড়াটাকে আমি! কী চীৎকার! সে কি সামলানো যায়!"

শিহর খেলে গেল অসীমার সারাদেহে। বহু আকাঙ্ক্ষিত অথচ অনাস্বাদিত একটা জিনিসের স্বাদ সে পাচ্ছে। খুব ভাল লাগছে শুনতে। ও থামল কেন। আরও বলুক।

ভয়ের অভিনয় করে সে বলে—"তাই নাকি! ওরে বাবারে! তাহলে কী হবে! তাহলে আমি কী করি! তখনই আসছিল নাকি ভোজালি নিয়ে?"

বীরবাহাদুর এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়—"না না, কিছু ভাববেন না, মাইজী। নেশায় যে মানুষ হাঁটতে পারছে না, সে মানুষ তখন আসছে ভোজালি নিয়ে মারতে! আপনিও যেমন!"

"না না বীরবাহাদুর। যত নেশাই করুক, জ্ঞান মাস্টারসাহেবের টনটনে থাকে। জানি তো তাকে।"

"থাকে তো থাকে!"

তাড়া দিয়ে উঠেছে বীরবাহাদুর। বাড়িতে আগুন লাগলেও বাজে গল্প করা ছাড়বে না এই মেয়েমানুষের জাতটা! সে কাজের কথা পাড়ে।

"এই নিন মাইজী পার্সেলটা। সব ঠিক করা আছে। আপনি শুধু সেলাইটা করে রেখে দিন। এখনই। একটুও দেরি করবেন না। মাস্টার-সাহেব এই এলেন বলে। এসেই সেলাইয়ের উপরের গালা মোহরগুলো ঠিক করে বসিয়ে দেবেন। শেঠজী রাত দশটার সময় মাস্টারসাহেবের কাছে একটা জরুরী খবর পাঠিয়েছিলেন। সেইজন্যই না এত তাড়া!"

জরুরী খবর? আর বলতে হবে না। মুহূর্তের মধ্যে অসীমা বুঝে গিয়েছে খবরটা কিসের। কেনই বা বীরবাহাদুরকে নিবারণ তখনই পাঠিয়েছিল। আসবার মত অবস্থা থাকলে নিজেই আসত। ইনস্‌পেক্‌শন অফিসার ডাকঘর খুলবার সময়ের আগে বোধহয় আসবেন না। অফিসারদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয়, সব অসীমার জানা। পার্সেলটা সেলাই করতে আধ ঘণ্টাও সময় লাগবে না।

"ফনটে, জামাজুতো পরে নে! বীরবাহাদুর, ফনটেকে একটু বেড়াতে নিয়ে যা তো!"

অসীমা ঘরে ঢুকল চুল আঁচড়ে শাড়ি বদলে নিতে। চায়ের জল একটু পরে চড়ালেই হবে।

কিন্তু সময় আর পাওয়া গেল না। সবে সেলাই করতে বসেছে পার্সেলটা—মোটরগাড়ি এসে থামল পোস্টাফিসের সম্মুখে। একখানা ছোট, একখানা

বড় গাড়ি। এ তো কেবল 'ইন্সপেকশন'এর উপরওয়ালা নয়! এ যে অনেক লোক! ডাকবিভাগের অফিসার; আবগারী বিভাগের অফিসার; পুলিসের অফিসার; নিবারণ নিজে; পুলিস কনস্টেবল! পথে দেখা হয়ে গিয়ে থাকবে নিবারণের সঙ্গে। তাহলে তো স্বামীর সমূহ বিপদ! এত বড় বিপদের মুখে অসীমা কোনদিন পড়েনি। হে মা-কালী, বাঁচাও! ভয়ে কি করবে ঠিক করতে পারে না। পার্সেলের ভিতরের গাঁজার পুঁটলিটাকে সে কয়লাগাদার নীচে রাখে। পার্সেলের উপরের ন্যাকড়ার মোড়কটাকে উনুনের মধ্যে ফেলে দেয়। হে মা-কালী, গালা আর ন্যাকড়াপোড়া গন্ধটা যেন হাওয়ায় পোস্টাফিসের উলটো দিকে উড়ে যায়! এখন একবার নিবারণের সঙ্গে একলা দেখা করতে পারলে স্থবিধা হত। বাড়ি ঘিরে ফেলেছে পুলিসে। গুটিগুটি লোক জমতে আরম্ভ হয়েছে। নিবারণ অফিসারদের বলছে—অফিসের চাবি বাড়িতেই আছে; সে সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি বাড়ি থেকে বার হয়ে যাবার সময়; বাড়ির ভিতর দিয়েও পোস্টাফিসের ঘরে ঢোকবার আর একটা দরজা আছে; বাড়িতে আছে স্ত্রী আর একটি ছয় বছরের ছেলে; আর বাইরের লোকের মধ্যে আসে ঠিকেঝি রামদেনীর মা। পুলিস এখন স্ত্রীর সঙ্গে নিবারণকে দেখা করতে দিতে রাজী নয়। একজন এসে অসীমার কাছ থেকে পোস্টাফিসের চাবি চেয়ে নিয়ে গেল।

ডাকঘরে টেবিলে ছুটি চায়ের কাপ। 'এ আবার এখানে কোত্থেকে এল।' বলেই নিবারণ কাপ ছুটোকে টেবিলের নীচে নামিয়ে রাখল। অফিসাররা পার্সেল সংক্রান্ত খাতাপত্র দেখতে চাইলেন।

"কালকের তারিখে, এই যে এত নম্বরের পার্সেল সম্বন্ধে লিখেছেন—এই নামের কোন ব্যক্তি ওখানে নাই—এটা আজ কলকাতায় ফেরত পাঠান হবে প্রেরককে—দেখি সেই পার্সেলটা।"

সিন্দুক থেকে সেটাকে বার করে দিতে গেল নিবারণ। শেষকালে মুখ কাঁচুমাচু করে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

পাশের ঘর থেকে অসীমা সব শুনতে পাচ্ছে। নিবারণ নিজেই প্রথম কথা তুলল—নিশ্চয়ই পার্সেলটা কেউ চুরি করেছে। তার মনে আছে যে সে কাল পার্সেলটা সিন্দুকে রেখেছিল। তারপর সারারাত সে বাড়িতে ছিল না। বাইরের তালা যখন ভাঙা নয়, তখন চোর নিশ্চয়ই ঢুকেছে বাড়ির ভিতর দিক দিয়ে।

বীরবাহাত্বরের কাছ থেকে স্বামীর সম্বন্ধে নতুন একটা খবর পাবার পর

থেকে অসীমার মনে নতুন নেশা লেগেছে। আসন্ন বিপদের মুখেও সে নেশার আমেজ কাটেনি। মাঝের খোলা দরজা দিয়ে নিবারণের চোখমুখের ভাব সে একবার দেখে নিল। মনে হল যেন ঈর্ষার রেশের সন্ধান পাচ্ছে সেখানে। বাড়ির হাটে তার নিজের ফেলা নিজের মূল্যের প্রথম স্বীকৃতি।

অফিসাররা এইবার বাড়ির ভিতর ঢুকলেন অসীমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য। তার বেশভূষার আড়ম্বর প্রথমেই তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"কাল বিকালের পর থেকে পোস্টাফিসের ঘরে কেউ ঢুকেছিল ?"

"না।"

স্বামীর চোখের লেখা দেখবার নেশা তখন অসীমাকে পেয়ে বসেছে।

হাঁ-হাঁ করে উঠেছে নিবারণ, কি বলতে হবে, স্ত্রীকে তার ইঙ্গিত দেবার জন্য।

"মেয়েমানুষ। ভয়ে মিছে কথা বলছে হুজুর।"

"মিছে কেন হতে যাবে। কেউ ঢোকেনি ও-ঘরে।"

"কেউ ঢোকেনি তো দুটো চায়ের কাপ কেন ছিল টেবিলের উপর ?"

চটে উঠেছে নিবারণ।

"ও কালকে দুপুরের। তুমি যে দু পেয়ালা চা খেয়েছিলে একসঙ্গে।"

ঘরের বাক্স-পেটরা সার্চ করা হল। অফিসার শুধু বললেন—"নতুন নতুন জরিদার বেনারসী শাড়ি আপনার অনেকগুলো দেখছি।"

"হ্যাঁ, ওগুলো বিয়ের সময় পাওয়া।"

এছাড়া আর কোন কথা বার করা গেল না অসীমার মুখ থেকে। ফনটেকে ডাকা হল।

টফি, লজেঞ্জুস খেয়ে, সে বলল যে সমীর-কাকা কাল রাত্রিতে মার সঙ্গে ও-ঘরে গল্প করছিল, আর মা মাতালের ভয়ে কাঁদছিল। বাসিমুখে ডাঁটা চিবুবার কথা যে বলতে নাই তা সে জানে। দারোগার প্রশ্নের উত্তরে রামদেনীর মা বলল যে, কাল রাত্রিতে সমীর এখানে ছিল।

"তাহলে আপনাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই থানায় যেতে হয় আমাদের সঙ্গে। আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।"

ফনটেকে অফিসার গাড়ির সম্মুখে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন। অসীমা আর নিবারণ বসল ভ্যানের পিছন দিকে। পথ থেকে পুলিস সমীরকেও ভ্যানে

তুলে নিল। সে বসল একা অন্যদিককার বেঞ্চে। সবাই নির্বাক। ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলেছে। সে ধুলো খেতে খেতে মালবাবু সাইকেল চালিয়ে আসছেন গাড়ির পিছনে পিছনে। সমীর গাড়ির বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার বেঞ্চের দিকটায় ছায়া; আর অসীমাদের বেঞ্চের দিকটায় রোদ্দুর পড়ছে। হঠাৎ অসীমা উঠে সেই বেঞ্চটাতে গিয়ে বসল। ভাবে মনে হল যে সে রোদের হাত থেকে বাঁচতে চায়। বসবার সময় অসীমা স্থির লক্ষ্য রেখেছে নিবারণের চোখের উপর। নিবারণও তার দিকে তাকিয়ে। যাতে পুলিসরা না দেখতে পায় সেইজন্য সে হাতখানা বেঞ্চের নীচে নামিয়ে স্ত্রীকে ইশারা করল সমীরের দিকে আরও ঘেঁষে বসতে। স্ত্রীর উপস্থিতবুদ্ধির প্রশংসাসূচক ব্যঞ্জনাও তার চোখমুখে নির্লজ্জ ছাপ ফেলেছে। ঈর্ষার চিহ্নও নাই সেখানে।

যা ভাবতে ভাল লাগে, সেইটাকেই সত্যি বলে ধরে নিয়েছিল এতক্ষণ অসীমা। এতক্ষণে মিষ্টি ভুলের নেশা কাটে। চূড়ান্ত অপমানে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে।

"কেন, ওর কাছে ঘেঁষে বসব কেন। হুকুম?" অসীমা এসে ধপ করে বসল নিবারণের পাশে। তারপর আবার উঠে দাঁড়াল গাড়ির পার্টিশনের লোহার জাফরি ধরে।

"শুনছেন পুলিসসাহেব, এই লোকটাই চুরি করেছে—এই ঠগ, জোচ্চোর, মাতালটা। অন্যর ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়, আমাকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলিয়ে। সব সত্যি কথা বলব আমি। আমার জেল হয় হোক। কলকাতার লোকদের সঙ্গে এর আর নেপালবাজারের শেঠজীর সাট আছে। যেসব লোক সাতজন্মেও এখানকার নয়, তাদের নামে কলকাতা থেকে পার্সেল আসে। এখানে সে নামের লোক পাওয়া যাবে কোথায়। ফেরত যায় সেসব পার্সেল। পার্সেলে আসে রেশমী শাড়ি, টাকা, আরও কত কি। সেসব এই মাতালটার মজুরি। সেটা বার করে নিয়ে এরা পার্সেলের মধ্যে ভরে দেয় নেপালের সস্তা গাঁজা। যে গাঁজার দাম নেপালে চার পয়সা, তার দাম কলকাতায় দেড় টাকা। কলকাতা থেকে যে মিথ্যা পার্সেল পাঠায় সে-ই আবার গাঁজাভরা পার্সেল ফেরত পায়। অনেক দিন থেকে এই করে আসছে এরা। আমার মুখ বন্ধ করবার জন্য আমাকে দিয়ে গাঁজাভরা পার্সেল সেলাই করায়। যাদের হাতে এত লোকজন, যারা সিলমোহর বাঁচিয়ে সেলাই কাটতে

জানে, তারা কি আর সেলাই করবার একটা লোক পেত না ইচ্ছা করলে। শুধু আমার মুখ বন্ধ করবার জন্য আমায় রেশমী শাড়ি দিয়েছে। লোকটা কি কম বদমাইশ! তিন বছর পরে কি করবে সেসব ওর আজকে থেকে ছককাটা থাকে। একটা কথাও লুকবো না আমি হুজুর। গলায় পাথর বেঁধে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে মা-বাপে! বিয়ে না ছাই! ইচ্ছা করে যেখানে দু-চোখ যায় চলে যেতে! পারিনি শুধু ফনটেটার মুখ চেয়ে। জেলে ওকে আমার কাছে থাকতে দেবেন পুলিসসাহেব! তাহলেই আমি সব সত্যি কথা বলব।"···

এতক্ষণে নিবারণ কথা বলল।

"কি পরিমাণ বদ দেখছেন তো হুজুর মেয়েমানুষটা! নাগরকে বাঁচিয়ে স্বামীকে জেলে পুরতে চায়।" তার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

জলভ্রমি

ম নে রে খ

প্রবোধকুমার সান্যাল

. . . .

ব্রাহ্মণ আর নারায়ণকে সাক্ষী রাখা হল, লেলিহজিহ্ব অগ্নিও সাক্ষী রয়ে গেল, —সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে বলা হল, শুধু যুগ-যুগান্ত নয়, কাল-কালান্তও নয়,— জন্ম-জন্মান্তর ধরে তুমি আমার, এবং আমি তোমার! এ সম্পর্ক আগুনে পোড়ে না, মহাকাল একে জীর্ণ করে না,—বরুণ পবন বৈশ্বানর মহেশ্বর বাসুকী মনসা —কারও সাধ্য নেই একে ধ্বংস করে। এ সম্পর্ক অক্ষয়, অব্যয়, অবিভাজ্য, অজর, অমর!

বিয়ের পর কমলাক্ষ বলল, কেমন, এবার খুশী ত'? একেই বলে নারীজন্ম সার্থক। রূপবান স্বামী, সচ্চরিত্র শিক্ষিত এবং স্বাস্থ্যবান স্বামী—মেয়েমাত্রই যা চায়। প্রচুর অর্থ, ঐশ্বর্য, বিলাস-বৈভব এবং মধুরস্বভাব স্বামী, প্রত্যেক মেয়ে যা চায়। সুখ শান্তি ভালবাসা শ্বশুরবাড়ির উদারতা,—যা প্রত্যেক মেয়ের কাম্য। কেমন, এবার খুশী ত'?

অনুপমা এবং নির্মল উভয়েই কমলাক্ষকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। নির্মল হাসিমুখে তার নববিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি একবার তাকিয়ে বলল, আপনার

আশীর্বাদ আমি যেন চিরকাল মনে রাখতে পারি, কমলদা। আমি যেন অনুপমার যোগ্য হই।

কমলাক্ষ হাসছিল। সর্বালঙ্কারভূষিতা সিন্দুরশোভিতা শ্রীমতী অনুপমা এবার একটু রাগ করে বলল, কমলদা, শুনলে ত'? ভক্তের অনুরাগের কথা কান পেতে শুনলে,—এবার তুমিও খুশী ত'—?—তারপর একবার নির্মলের দিকে ফিরে বলল, কমলদা যা বলল তার মধ্যে তুমি আশীর্বাদটা কোথায় খুঁজে পেলে? কই, উনি ত' আশীর্বাদ এখনও করেননি?

কমলাক্ষ এবার চাপা হাস্যের সঙ্গে বলল, আঃ, পোড়ারমুখীর মুখে কিচ্ছু বাধে না। চারিদিকে লোক গিজগিজ করছে, এটা বিয়েবাড়ি, মনে রেখ। নির্মল, তুমি স্ত্রীর প্রতি একটু কঠোর হবে এখন থেকে। ওকে সর্বদা শাসনে রাখবে। দরকার হলে শাস্তি দেবে!

যে আজ্ঞে, কমলদা। এই আশীর্বাদটুকুই চেয়েছিলুম।—নির্মল হাসিমুখে জবাব দিল।

অনুপমা বলল, তবেই হয়েছে! উনি আবার শাস্তি দেবেন! সাত চড়ে রা বেরোয় না,—দেখতে ত' রাঙা মুলো! রূপগুণে আমার কী হবে, স্বামী যদি বলিষ্ঠ পুরুষস্বভাব না হয়? তোমার আদরেই ত' নির্মল উচ্ছন্নে গেছে, কমলদা? কিন্তু তোমার সাংঘাতিক শাসনে আমি অনেক ভাল করে মানুষ হয়েছি। হিসেব করে দেখো? একসারসাইজ করেছি, সাঁতার কেটেছি, ঘোড়ায় চড়েছি, মোটর হাঁকিয়েছি, পাহাড়ে চড়েছি, মাটি কেটেছি, তোমার হুকুমে কি না করেছি, সত্যি বল ত' কমলদা? শেষকালে কিনা আমার হাত-পা বেঁধে ওই নির্মল স্বচ্ছ সরোবরে ভাসিয়ে দিলে!

কমলাক্ষর সঙ্গে নির্মলও হৈচৈ করে হেসে উঠল। অনুপমা তার শেষ অনুযোগ জানিয়ে বলল, এবার যেখানে খুশি যাও, আর কি! এবার যখন সিদ্ধকাম হলে, তখন আর কোনো পিছুটান তোমার ত' নেই—যাও, এবার থেকে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াওগে। আমি নির্মলদের বাড়ি গিয়ে বেশ দিব্যি ঘরকন্না ফেঁদে বসিগে। এই ত' তুমি চেয়েছিলে, কমলদা? আমাকে সুখী করে এতদিনে তোমার সব চেষ্টা সার্থক হল! দাঁড়াও, তোমার পায়ে আরেকটা প্রণাম ঠুকে যাই।

অনুপমা সাষ্টাঙ্গে কমলাক্ষর পায়ে আরেকটি প্রণাম করল। কমলাক্ষ বলল, আশীর্বাদ করি আদর্শ গৃহিণী হও, অনুপমা।

নিশ্চয়, একশোবার। আদর্শ গৃহিণী হবার সম্ভাবনা তুমি আমার মধ্যে

দেখেছ, তাই ত' এ বিয়ে দিলে ! তুমি আবার আশীর্বাদ করো কমলদা, আমার সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যেন নির্মলকে সুখী করতে পারি।

নির্মল হাসিমুখে কেবল বলল, অনুকে আপনি সব শিখিয়েছেন কমলদা, ও কিন্তু সংযম শেখেনি ! বড্ড বেশি ঝগড়া করে।

আরেকবার হাসির কলরোল উঠল। তারপর অনুপমা নির্মলের প্রতি কালকটাক্ষ হেনে তাকে নিয়ে বিয়েবাড়ির হট্টগোলের মধ্যে ঢুকল।

গল্পের মাঝখানে মিঃ দেশমুখ প্রশ্ন তুললেন : আপনি কি বলতে চান, স্যার, এ বিয়েতে অনুপমা খুশী হয়নি মনে মনে ?

দেবরায় বলল, অনুপমার মনের কথা আমি কেমন করে জানব ?

কিন্তু তার কথায় কোথায় যেন একটা দাহ থেকে যাচ্ছে ? অনেক বেশি কথার মধ্যে অনেকটাই যেন ঢাকতে চাইছে ?

আমি জানিনে, তবে তার কথাবার্তার ধরনই ওই। বোধ হয় এটা হতে পারে, কমলাক্ষকে ছুঁচ ফোটানোয় তার বিশেষ উৎসাহ ছিল।

মিঃ আত্রে প্রশ্ন করলেন, কেন, কি কারণে ?

দেবরায় বলল, বহুবার আমি এটি জানবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। আমি কেবল ঘটনার কথাই বলতে পারি।

বন্ধুরা ঘটনাবলী শোনবার জন্যই উৎসুক হয়ে যে যার গুছিয়ে বসল। প্রতি-দিনের মতো আজও সামনে রান্নাবান্নার আয়োজন চলেছে।

ওটা ছিল শীতকাল। নাসিক শহর থেকে প্রায় চার মাইল দূরে সেণ্ট্রাল পি-ডব্লু-ডির তাঁবু পড়েছিল। কাছেই গোদাবরী নদীর আঘাটা। পশ্চিম দিকে কতকটা উজিয়ে গেলে ভিক্টোরিয়া ব্রীজ। সেটি ছাড়ালে অহল্যাবাঈ ঘাট। ওরই কাছাকাছি প্রশস্ত ক্ষেত্রে গেল-বছরে কুম্ভমেলার ভিড় হয়েছিল। ঘাট ছাড়িয়ে উঠে গেলে পঞ্চবটী এবং সীতা-গুম্ফা। শহরের চাপে পৌরাণিক স্থানমাহাত্ম্য আর অনুভব করা যায় না।

তাঁবুর বাইরে খোলা জায়গাটায় একস্থলে ওদের গল্পের আসর বসেছিল। এটি বসন্তঋতুর দেশ, সুতরাং ডিসেম্বর মাসটিও বড় মনোরম। নদীটি এখন শীর্ণকায়া, ভিতর থেকে মোটা মোটা পাথর বেরিয়ে পড়েছে। ওপারের দিকটা গাছপালায় ভরা, এবং সেই বনময় চেহারাটি দূরবর্তী দত্তাত্রেয় আশ্রমের দিকে গিয়ে মিলিয়ে গেছে।

গোদাবরী নদীর গতিপথ, বন্যানিরোধের পরিকল্পনা এবং নূতন বাঁধের নানাবিধ নকশা গবেষণা করার জন্য দেবরায়কে এখানে আনা হয়েছে। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণের সহযোগিতায় কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। তাঁবুগুলি থাকবে আরও কয়েকদিন।

সামনের টেবিলটির উপর পানাদির সরঞ্জাম এবং নানাবিধ হিন্দু-মুসলমান ভোজ্য থরে থরে সাজানো। সকলেই একে একে সেগুলির সদ্ব্যবহার শুরু করেছেন। পাশে গোদাবরী মৃদু মর্মরে বয়ে চলেছে। ওটা ছিল শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি।

অনুপমার বাবা গোবিন্দ ঘোষাল ছিলেন সেকালের একজন রাজনীতিক বিপ্লবী। তিনি ধার্মিক লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর হাতে ছিল যাকে বলে পরশুরামের কুঠার। তিনি ইংরেজ শাসকদেরকে নিশ্চিহ্ন করার ব্রত নিয়েছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের পথ বড় দুর্গম ছিল। একটি রাজনীতিক হত্যাকাণ্ডের পর তিনি যখন নৌকাযোগে পদ্মার উপর দিয়ে পালাচ্ছিলেন, সেই সময় বন্যার প্রচণ্ড আঘাতে তিনি নৌকাডুবি হন। সে যাই হোক, তাঁর ওই একটিমাত্র কন্যাকে তিনি যেভাবে মানুষ করেছিলেন, সেটিকে এক কথায় বলা চলে—তাঁর ওই তলোয়ারকে তিনি মনের মতন করে শান দিয়ে অত্যন্ত ধারালো করতে চেয়েছিলেন। সে কাজ পরে কমলাক্ষ তুলে নিয়েছিল।

ওরা তিনজনে বাল্য বয়স থেকে একই সমিতির সভ্য ছিল। নির্মল ছিল অনুপমার বয়সের প্রায় কাছাকাছি, এবং সে ছিল এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর ছেলে। কমলাক্ষ নির্মল অপেক্ষা বছর পাঁচেকের বড়, এবং কমলাক্ষর হাতেই ঘোষালমশাই তাঁর কন্যাকে দিয়ে বলেছিলেন, একে তৈরি করে তোলার ভার তোমার হাতেই রইল।

কমলাক্ষ ওই ব্যায়াম সমিতির সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। মেয়ে এবং ছেলে মিলিয়ে তখনকার সমিতির সভ্যসংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু ওদের মধ্যে কমলাক্ষর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল নির্মলের প্রতি। নির্মলের মিষ্ট স্বভাব, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, সৎশিক্ষা, স্বভাবসংযত কথালাপ ও বন্ধুপ্রীতি—এই গুণগুলির প্রতি কমলাক্ষ বিশেষ অনুরক্ত ছিল।

ওই প্রতিষ্ঠানে দুটি বিশেষ আদর্শ প্রত্যেককেই পালন করতে হত। যারা বিপ্লববাদ এবং ইংরেজ ও পুলিশ হত্যার দিকে যাবার নির্দেশ পাবে, তারা

প্রথমত কিছুদিনের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে—যাতে এইটি প্রমাণিত হয় যে, তাদের সঙ্গে বহুদিন যাবৎ সমিতির কোনও যোগ নেই! দ্বিতীয় আদর্শ হল এই, ভারত যতদিন না স্বাধীনতা লাভ করে, ততদিন অবধি কেউ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে না। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে অহেতুক ঘনিষ্ঠতা অথবা উভয়ের মধ্যে প্রণয়চিন্তা বিষবৎ নিষিদ্ধ ছিল। বলা বাহুল্য, কমলাক্ষর পরিচালনা এরূপ ছিল যে, এসব ব্যাপারে কোন সভ্যর কখনও বিচ্যুতি ঘটেনি।

দেবরায় বলল, কমলাক্ষ এককালে আমার অন্তরঙ্গ সহপাঠী ছিল। তার নানা সময়ের লেখা চিঠিপত্র আমি আজও রেখে দিয়েছি।

তারপর?

বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে কমলাক্ষর নাম ছিল খুব। পদার্থবিজ্ঞানে তার গবেষণার রীতি লক্ষ্য করে অধ্যাপকরা তাকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করতেন। কিন্তু হাসির কথা হল এই, কমলাক্ষ ডি-এস-সি উপাধি লাভ করে কো-অপারেটিভ আন্দোলন নিয়ে পড়ল। ছোট-বড় প্রায় দশটি সমবায় প্রতিষ্ঠান তথা কাজকারবার সে গড়ে তুলল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল। দেশের বড় দুর্দিন। অনুপমা তার সকল কর্মে নিত্যসঙ্গিনী হয়ে থাকত, এবং নির্মল এদের সমস্ত কাজে প্রয়োজনমতো টাকা যোগাড় করে আনত।

আসন্ন দুর্ভিক্ষের লক্ষণগুলি বিচার করে কমলাক্ষ অনুপমাকে গ্রামের দিকে প্রচারকার্যের জন্য পাঠিয়ে দিল। মাসখানেক পরে অনুপমা যখন ফিরল তখন তার চেহারা দেখে কমলাক্ষ ভয় পেয়ে গেল। অনুপমা যেমন রোগা, তেমনি রোদপোড়া। হাসিমুখে কমলাক্ষ বলল, এমন চেহারা হল যে? খেতে পাওনি বুঝি?

অনুপমা জবাব দিল, তুমি ত' খাবার জন্যে পাঠাওনি!

বাঃ, নির্মলকে পাঠালুম তোমার খোঁজখবর নিতে!

নির্মল! নির্মলকে কি এ-কথা বলে দিয়েছিলে যে, মেয়েটার শরীর-স্বাস্থ্যের খবর রেখো? মেয়েটা যেন রোগা না হয়? নির্মল ত' তোমারই চ্যালা!

কমলাক্ষ বিশেষ লজ্জিত হয়ে অনুপমাকে নিয়ে গিয়ে তার খুড়িমার ওখানে দিন-পনেরো রেখে দিল।

নির্মল একদিন এসে কমলাক্ষর কাছে অনুযোগ জানাল, কমলদা, আপনি আর অনুকে ওসব কাজ দিয়ে কোথাও পাঠাবেন না। ওর মেজাজ বড্ড কড়া।

সাঁড়াসোলের ইস্কুল-বাড়িতে আমরা সবাই গিয়ে উঠেছিলুম, একদিন অনেক রাত্তিরে অনু ওদের এক মাস্টারমশাইকে ধরে আচ্ছা করে ঠ্যাঙালো —

ঠ্যাঙালো ? বল কি নির্মল ?

হ্যাঁ কমলদা,—ওকে আর বিশ্বাস করবেন না, ও সব পারে। ভদ্রলোকের গলা টিপে ধরে ঠাস ঠাস করে এমন দুটো চড় মারল যে, লোকটা ঘুরে পড়ল। ওর "প্যারালাল্ বার" করা অভ্যেস ছিল ত', তাই হাতের মাস্ল্ ভীষণ শক্ত ! আঠারো বছর ত' বয়স মোটে—

সহাস্যে কমলাক্ষ বলল, মারতে গেল কেন ?

নির্মল বলল, ওকেই জিজ্ঞেস করুন। অনু ঘুমোচ্ছিল, ভদ্রলোক বুঝি ওকে গা ঠেলে ডাকছিলেন। ব্যস—আর যায় কোথা ?

কমলাক্ষ বলল, গা ঠেলা ঠিক কাকে বলে, মেয়েরা সেটা বোঝে, নির্মল। আচ্ছা যাও, পরে আমি শুনব।

কুড়ি-একুশ বছরের এই স্বল্পজ্ঞান ছেলেটির চলে যাবার পথের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে কমলাক্ষ চেয়ে রইল। ওর কিচ্ছু জ্ঞান হয়নি।

গোবিন্দ ঘোষালের ওই মেয়েটি ছাড়া তাঁর সংসারে আর কেউ ছিল না। অনুপমার শৈশবে তার মায়ের মৃত্যু ঘটে। কলকাতা থেকে মাইল-পঁচিশেক দূরে ওদের ভূ-সম্পত্তি মন্দ ছিল না। কমলাক্ষ বহু ছুটোছুটি করে অনুপমাকে সমস্ত বিক্রি করিয়ে টাকাকড়ি অনুপমার নামে ব্যাঙ্কে জমা দিল, এবং তাকে বি-এ পাস করাবার সমস্ত ব্যয়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিল। অনুপমার খরচপত্রের জন্য প্রতি মাসের পয়লা তারিখে একটা বিশেষ অঙ্কের টাকা সে পূর্বাহ্ণে সরিয়ে রাখত।

বি-এ পাস করার পর অনুপমা একদিন এসে কমলাক্ষর সামনে দাঁড়াল। বলল, তুমি কেন আমার সব খরচপত্র চালাচ্ছ, কমলদা ? বাবা কি বলে গেছেন যে, পরের টাকায় তাঁর মেয়ে মানুষ হবে ?

হাসিমুখে কমলাক্ষ বললে, মানুষ ত' এখনও ঠিক সে হয়নি, এখনও কথায়-কথায় দাঁত খিঁচিয়ে আসে !

বেশ, আমি না হয় বাঁদর ! তাই বলে তুমি কেন টাকা দেবে আমার জন্যে ? তুমি কে ? তুমি কি আমার কেউ হও ?

কমলাক্ষ বলল, বটে, আসলে একটা প্রশ্ন নিয়ে আজ হাজির হয়েছ

দেখছি। টাকার কথাটা উপলক্ষ্য মাত্র—কেমন? মনের মধ্যে কথা উঠেছে, এই না?

অনুপমা বলল, আমি ত' এখন বড় হয়েছি!

হ্যাঁ, মুখস্থ করে বি-এ পাস করেছ। নিশ্চয়ই বড়!

তাহলে কি আমার কোনও জ্ঞান হয়নি বলতে চাও তুমি?

কমলাক্ষ আবার হাসল। বলল, কার এমন বুকের পাটা যে, তোমাকে অজ্ঞান বলে? তোমার জ্ঞান হয়েছে বলেই ত' সেবার বেশ হাতের সুখ করে মাস্টারকে ধরে ঠেঙিয়ে এসেছিলে?

ও-মা,—অনু চোখ কপালে তুলে বলল, নির্মল বুঝি ফিরে এসে তোমাকে বলেছে? আমি কিন্তু তোমার কানে তুলতে ওকে মানা করেছিলুম, কমলদা। সত্যি বলছি তোমাকে, বিশ্বাস করো,—লোকটাকে ভূতে পেয়েছিল! ওর হাতের ভাষা ছিল অন্যরকম!

আচ্ছা হয়েছে, সে-ভাষাটি বেশ শিখেছ দেখছি! যাও—আমার কাছে আর নালিশ জানাবার জন্যে এসো না।—কমলাক্ষ তার কাজে মন দিল।

যুদ্ধের ধাক্কায়, বন্যার তাড়নায়, দুর্ভিক্ষের বিপর্যয়ে—একদিন ওদের সেই ব্যায়াম সমিতি লোপ পেয়ে গেল। মুদ্রাস্ফীতির ভিতর দিয়ে মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি সমাজজীবনে একটা মস্ত অরাজকতা এনে ফেলল। কিন্তু দেশের সেই চরম দুর্গতির দিনেও কমলাক্ষ তার গুরুদায়িত্বের কথা ভোলেনি। সান্ত্বনার কথা শুধু এই ছিল, ওদের পরস্পরের ভিতরকার মধুর মৈত্রীর সম্পর্কটা অব্যাহত রয়ে গেল। নির্মল এম-এ পাস করে বেরিয়ে এল। ওদের তিনজনের মধ্যে সম্পর্কটা রইল প্রায় অবিচ্ছেদ্য। অনুপমা কোমর বেঁধে নতুন করে তার পড়াশুনায় মন দিল।

কমলাক্ষ কোন অবস্থাতেই তার খদ্দরের পাঞ্জাবিটা ছাড়েনি। সেটা কখনও ছিঁড়েছে, কখনও রং বদলেছে, কখনও বা নতুন হয়েছে। তার গুণপনা ও গবেষণার কথা নানাস্থানে সুবিদিত ছিল। মাঝে মাঝে তার কাছে ভাল চাকুরিলাভের লোভনীয় প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু সে তার এই দুটি নিত্যসঙ্গীকে ছেড়ে কোথাও চলে যেতে রাজি হয়নি। গোবিন্দ ঘোষাল মহাশয় একদা তার হাতে যে-দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, সেই দায়িত্ব-পালনই তার জীবনে বড় আদর্শ হয়ে রইল।

শ্রীমতী অনুপমা বিশেষ সম্মানের সঙ্গে এম-এ পাস করল।

টাকাকড়ির অভাব ছিল না। কিন্তু অভাব-বোধ ছিল অন্যত্র, সেটি মনে-মনেও উচ্চারণ করা চলে না। ওদের তিনজনের জীবনের শেষ পরিণাম কি, সেটা ওদের কাছে অস্পষ্ট। সংসার-রচনার চিন্তা ওদের জন্য নয়। নির্মলের বাবা মারা গেছেন। তারা দুই ভাই। নির্মল ছোট। কিন্তু বাড়ির শাসনের বাইরে সে। সে ব্রতধারী। সে একটি আদর্শবাদী,—কোনও লোভে, কোনও মোহে সে ব্রতভঙ্গ করতে প্রস্তুত নয়। হাতে তার গোবিন্দ ঘোষালের পতাকা, ললাটে তার কমলাক্ষর জীবনাদর্শ। নির্মল তার নিজস্ব জগৎ নিয়ে খুশী ছিল।

দেবরায় তার হুইস্কির গ্লাসটি তুলে একটি চুমুক দিল। তারপর কয়েকটি বাদাম মুখে দিয়ে বলল, এই আদর্শবাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল অনুপমার মনে। তার ধৈর্য অটুট ছিল না। একদিন সে এসে দাঁড়াল দু'জনের সামনে। বলল :

বাঁধনটা কোথায় বল ত' কমলদা, ওটা ত' চোখে দেখা যাচ্ছে না!

নির্মল এবং কমলাক্ষ দু'জনেই অনুপমার দিকে তাকাল। এটা কমলাক্ষর জানা ছিল, অনুপমার জীবনে নানা অশান্তি এসেছে। শান্তকণ্ঠে সে বলল, অনেক বড় বড় বাঁধন আছে, সে-সব চোখে দেখা যায় না।

কিন্তু বাঁধনের শাসনটা সত্যিকার মুক্তির পথ আগলে রইল কেন?

কথাটা স্পষ্ট নয়। কমলাক্ষ হাসিমুখে তাকাল। বলল, তুমি কি বলতে চাও বুঝিনে।

বুঝতে তুমি চাও না, তাই বুঝতে পার না। জীবনটা যদি সব বাঁধন কাটিয়ে উঠতে না পারে, তবে নিজের জীবনের ওপর শ্রদ্ধাই বা থাকে কোথায়? আমার যে দম বন্ধ হচ্ছে!

নির্মল প্রশ্ন করল, তোমার মনে এ-সব প্রশ্ন উঠছে কেন?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল অনুপমা। বলল, হিসেব-নিকেশ মেলাতে পাচ্ছিনে, তাই প্রশ্ন। আমি কোন্ অন্ধকারের দিকে ঠেলা খেয়ে ঠিকরে যাচ্ছি, তা জানিনে। ব্রত? মেয়ের ব্রত মেয়ে জানে বৈকি। পুরুষের জগতের সঙ্গে মেয়ের মনের যোগ কোথায়? বাবাও ত' সব মেয়েপুরুষকে এক ছাঁচে ঢালতে চেয়েছিলেন। পুরুষ মাত্রই ডিক্‌টেটর হতে চায় কেন?

অনুপমার বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে কমলাক্ষ মুখ ফিরিয়ে নিল। অনুপমার সমস্ত অভিযোগের পিছনে রয়েছে কেমন একটা নিরুপায়

আবেদন। তার শরসন্ধানের লক্ষ্যটা কোথায় কমলাক্ষ জানে। মেয়েটা বিদ্রোহ শুরু করেছে তার বিরুদ্ধে।

যুদ্ধ থামবার পর মাস-দুয়েক পরে ওরা তিনজনে বেরিয়ে পড়ল। সেই অবারিত মুক্তির মধ্যে অনুপমা বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। পাহাড়-পর্বতে বিচরণ করল, বনে-প্রান্তরে ঘুরল, নতুন নতুন শহর দেখে বেড়াল, ঐতিহাসিক পুরাকীর্তির ভগ্নাবশেষের আনাচে-কানাচে ঘুরে দেখল এবং অস্থায়ী বাসা রচনা করে তারা ফিরল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ওদের দু'জনের কৌতুক উদ্রেক করে অনুপমা কখনও চোখে দিল সুর্মা, কখনও রাজপুতানীর ঢঙে পরনের শাড়িকে ঘাগরা করে পরল, কখনও ময়ূরের পালক মাথায় গুঁজল, কখনও বা পাঞ্জাবি-শালোয়ারের সঙ্গে আচকান এবং উড়ানি ঝুলিয়ে এসে দু'জনের সামনে দাঁড়াল।

কমলাক্ষ তার দিকে চেয়ে বলল, উহুঁ, হল না! এলোখোঁপার ডগায় ফুলের গোছাও বাঁধোনি, কিংবা কাঁচকড়ার খোকা পুতুলটি কোলে নিয়ে খেলাঘরও সাজাওনি! তুমি বাঙালী মেয়ের নাম ডোবালে!

অনুপমা রাগ করে শুধু বলে গেল, এর জন্যে তুমিই দায়ী! তুমি খুশী থাকবে বলেই সহজ মেয়েকে সঙ সেজে বেড়াতে হয়!

কমলাক্ষ অপরাধীর মতো চুপ করে রইল।

ভেবে-চিন্তে নির্মল বলল, কমলদা, আপনি এক কাজ করুন। অনুর মধ্যে বড্ড তাড়াতাড়ি মেয়েলি লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে! ব্রতটা থাক আপনার আর আমার মধ্যে। আপনি দেখে-শুনে অনুর একটা বিয়ে দিন।

কমলাক্ষ হো-হো করে হেসে উঠল।

কথাটা অনুপমার কানে গিয়েছিল। একদিন ট্রেনের কামরায় বসে অনুপমা বেশ গম্ভীরভাবে বলল, কমলদা, তুমি নির্মলকে আমাদের দল থেকে তাড়িয়ে দাও ত'? ও তোমাকে আদর্শচ্যুত করতে চেয়েছিল। এবার দলটা ভেঙে দিতে চায়।

নির্মল বলল, আমাকে তাড়ালে দলের মধ্যে থাকবে মাত্র তোমরা দু'জন। তাতে অসুবিধে হবে না?

কমলাক্ষ বলল, অত্যন্ত অসুবিধে হবে। কেননা অনুর যেরকম মেজাজ-মর্জি, তাতে একদিন আমাকেও দলছাড়া হয়ে পালাতে হবে! শুধু থাকবে অনু তার দল আর বল নিয়ে।

তিনজনেই হেসে অস্থির হল।

এর পর বছর-দেড়েকের মধ্যে ওদের জীবনের চেহারা অনেকটা পালটে গেল। নির্মল চলে গেল তাদের আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় দেখাশোনার জন্য, অনুপমা একটি সরকারি চাকরি নিয়ে বসল এবং কমলাক্ষ মোটা উপার্জনের প্রলোভন ত্যাগ করে তার সেই কো-অপারেটিভ সোসায়েটি নিয়ে পড়ে রইল।

এমনি সময়টায় ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতা লাভের কথাটা একপ্রকার পাকা হয়ে উঠল।

স্বাধীনতা! চমক ভাঙল কমলাক্ষর। সে কি, স্বাধীন হবে তাদের দেশ? ইংরেজ চলে যাবে তার মাথার মণি ছেড়ে? এ কি সম্ভব? কমলাক্ষ কিছুদিন নিরুদ্দেশভাবে ঘুরে বেড়াল আপন মনে। ভারত যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে তাদের তিনজনের উপায়? তারা কি অবস্থায় এসে দাঁড়াবে? গোবিন্দ ঘোষালের সেই নির্দেশ কমলাক্ষ ত' ভোলেনি! স্বাধীনতা লাভের পর সংসার রচনা?

সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই এক বিশেষ জরুরী সভা আহ্বান করা হল। কিন্তু তার সভ্য মাত্র তিনজন। অনুপমা থাকে এক মেয়েদের হোস্টেলে, চিঠি পাবামাত্র সে এসে হাজির হল। নির্মল ফোন করে জানাল, যথাসময়ে সে আসছে।

দেবরায় হাসিমুখে বলল, সেই সভায় কলহ-বিতর্ক বেশ উগ্র আকার ধারণ করেছিল। একসময় নির্মলকে অপদস্থ করার জন্য অনুপমা এমন প্রস্তাবও আনল, আগামী পনেরই আগস্টের স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাবটা না হয় আপাতত মুলতুবি থাকুক। আমাদের মধ্যে বোঝাপড়াটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করাটা যুক্তিসঙ্গত হবে না।

গণতান্ত্রিক ভোটে অবশ্য অনুপমার প্রস্তাবটা বাতিল হয়ে গেল।

মিঃ আত্রে হাসিমুখে বললেন, মেয়েটি 'ফানি'!

দেশমুখ বললেন, অত সহজে মেয়েটিকে বিচার করবেন না, মিঃ আত্রে। ওর মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে মনে রাখবেন। ওর জীবন এবার সমস্যায় কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠল।

কেন বলুন ত'?

বাঃ, 'অ্যাটাচ্‌মেণ্টটি' বুঝতে পারছেন না? মেয়েটার মনের কথা বিচার

করে দেখুন ত'। কমলাক্ষকে একটু বুঝবার চেষ্টা করুন? নির্মলের ভূমিকাটা কিরূপ, অনুমান করুন না কেন?

আত্রে বললেন, হ্যাঁ, কোথায় যেন কি একটা কথা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে একটি কথা খুব স্পষ্ট। এমন সংযত এবং ভদ্র ছেলেমেয়ে আজকাল খুব কমই দেখা যায়। ওরা দেশের গৌরব।

গোদাবরীর রক্তিম-কৃষ্ণ প্রস্তরতটের উপর দিয়ে সন্ধ্যারাত্রি তার ছায়া বিস্তার করেছে। দত্তাত্রেয় আশ্রমের মাথার উপরে শুক্লা-সপ্তমীর চন্দ্র একপ্রকার মলিন-মধুর জ্যোৎস্নার জাল বিস্তার করেছিল।

হাসিমুখে দেবরায় বলল, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল বটে, কিন্তু সেই-সঙ্গে তিনটি জীবন ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। শুধু একটা কথা এর মধ্যে স্পষ্ট হল, ওদের উপর আর কোনও শাসন এবং বাঁধন নেই। ব্রত উদ্‌যাপন ওদের হয়ে গেছে। ওরা এর পরে আপন আপন পথ বেছে নেবে, এবং পরস্পরের কাছে আর কোনও বাধ্য-বাধকতা রইল না। ওরা সম্পূর্ণ স্বাধীন!

কমলাক্ষ নিজের ফ্ল্যাটটি বেশ গুছিয়ে তুলেছিল। একটি ঘরে তার অফিস, আরেকটি ঘরে তার বিছানা, এবং তৃতীয়টি তার বসবার ঘর। রাতদিনের একটি চাকর আছে, নাম লোকনাথ। সে-ই রান্নাবান্না করে এবং তার হাতেই ঘরকন্না চালাবার দায়িত্ব। তার ঘর আলাদা। এদিকে অফিসে ফটিক নামে একটি ছোকরা মোতায়েন আছে, সে সর্বপ্রকার ফাই-ফরমাশ খাটে। অফিসে কমলাক্ষর কাজ অনেক। সমবায়-পদ্ধতিতে আর কোন্ কোন্ কাজ বাড়ানো যেতে পারে, এই নিয়ে কিছুদিন থেকে সে ভাবতে বসেছিল। সম্প্রতি তার কাছে খবর এসেছে, যে-কোনও প্রতিষ্ঠান সে যদি নিজে পরিচালনা করে তবে গভর্নমেণ্ট তাকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করতে প্রস্তুত থাকবেন।

এমনি সময় একদিন অনুপমা তার ওখানে এল। সে-অনুপমা নয়, এ-মেয়ে অন্য। এ-অনুপমা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পরাধীন যতদিন ছিল, ততদিন অনুপমার মধ্যে জ্বালা ছিল, তেজস্বিতা ছিল, ছিল একটি দুর্লভ আত্মাভিমান,—চড়া সুরে সাতটি তার বাঁধা ছিল। সেগুলি স্পর্শমাত্র ঝনঝনিয়ে বেজে উঠত। এ-অনুপমার অহঙ্কার যেন কোথায় ঘুচে গেছে, যেন সে ফতুর হয়ে গেছে আগাগোড়া, চরিত্রের সেই জেল্লাটা হারিয়ে গেছে। অনুপমা স্বাধীন হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে।

অনুপমা ভীরু পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে এসে চেয়ারে বসল।—কাগজপত্র থেকে একসময় কমলাক্ষ মুখ তুলল। বলল, ও, তুমি! আমি ভাবলুম বুঝি ফটিক। তারপর, কেমন আছ অনু? একটু কাহিল দেখছি যেন? চাকরি-বাকরি কেমন করছ একটু বলো শুনি।

কমলাক্ষ হাতের কলমটি রেখে বেশ গুছিয়ে বসল। কিন্তু যাকে এমন সাগ্রহে অভ্যর্থনা করা হল, সে চেয়ে রইল অন্যদিকে। তার দিকে তাকিয়ে খুশী হয়ে কমলাক্ষ পুনরায় বলল, তা বেশ, একটু শান্ত হয়ে গেছ, মনে হচ্ছে। হবারই ত' কথা। অনু, আজ আমার চেয়ে আনন্দ আর কারুর নেই, জেনে রেখ। ঘোষাল মশাই যে-দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন, তা আমি বর্ণে বর্ণে পালন করেছি। আজ এই আমার অহঙ্কার। তোমাদের পায়ে আর কোনও শেকল নেই, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছ, উপার্জনে মন দিয়েছ, এবার…

উপার্জন?—অনুপমা মুখ ফিরিয়ে তাকাল,—তারপর মাথা নীচু করে বলল, চাকরি আমি ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিয়েছ? কেন?

কি হবে চাকরি করে? কার জন্যে?

কেন, নিজের জন্যে! শুধু-শুধু বসে থাকবে কেন? এখন যে-কোনও সরকারি চাকরি মানেই ত' দেশগঠনের কাজ! এইটিই ত' সকলের পক্ষে কাম্য ছিল! জীবনটাকে নতুন করে গড়ে তুলতে না পারলে,—ও কি, উঠছ যে?

অনুপমা আস্তে আস্তে উঠল। কমলাক্ষ তার দিকে চেয়ে বলল, আরে, কোথা চললে এর মধ্যে? একটু বসলে পারতে?

মুখ ফিরিয়ে অনুপমা দাঁড়াল। বলল, তোমার বক্তৃতা চিরকাল শুনে এসেছি, তার মর্যাদাও স্বীকার করেছি,—এখন আর কেন? ওসব কথার রং এখন চটে গেছে।

বেশ ত', তোমার বক্তব্য কিছু থাকে যদি, বল না কেন?

বক্তব্য আমার কিচ্ছু নেই।—বলে অনুপমা আবার ফিরে সেই চেয়ারখানাতেই বসল। মুখে চোখে তার অসীম অতৃপ্তি ও ক্লান্তির ছায়া পড়েছিল। একসময় বলল, আমি দেখতে এসেছিলুম তুমি কি নিয়ে আছ।

আমি!—কমলাক্ষ বলল, আমার কথা আর বোলো না। অকাজের যত কাজ আমার। রাতদিন এখানে-ওখানে গিয়ে ভূতপ্রেত চরাচ্ছি।

অনুপমা বলল, তোমার অকাজের মধ্যে আমাকে ডেকে নিলে না কেন?

আমাকে কেন স্বাধীন ভারতের মরুভূমির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে তুমি চুপ করে গেলে? আমি ত' তোমার কোনও কাজের অযোগ্য নই?

অনুপমার গলার আওয়াজটা গাঢ় হয়ে উঠল।

শান্তকণ্ঠে কমলাক্ষ বলল, তোমাকে আমার কাজের মধ্যে নেবো, কিন্তু তোমার ওপরে আর যে আমার কোনও দখল নেই, অনু। তিনজনেই আমরা তিন দিকে সরে গেছি। যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এবার তুমি তোমার নিজের পথ বেছে নেবে, এই ত' জানি।

অনুপমা বলল, আরেকটু বেশি জানলে পারতে! বড্ড বেশি লেখাপড়া শিখেছ তাই তোমার সব জানাটা বইয়ের মধ্যেই রয়ে গেল।

কমলাক্ষ বলল, কি জানি, তা হবেও বা। তবে তুমি ত' আমাকে বলোনি অনু যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরেও তুমি আমার কথা শুনবে?

তোমার কথার অবাধ্য হতে পারি এই কি ভেবে রেখেছিলে?

দাঁড়াও—কমলাক্ষ বলল, আমার মাথায় ওটা একবারও আসেনি। তাহলে ব্যাপারটা ত' খুব সহজ হয়ে গেল! আমি ঠিক বুঝতেই পারিনি যে, আমাদের মিষ্টমধুর সম্পর্কটা ভবিষ্যতে টিঁকে থাকতে পারে।

অনুপমা প্রায় অবাক হয়ে এই আত্মবিস্মরণশীল ব্যক্তিটির প্রতি তাকিয়ে রইল। কমলাক্ষ আবার বলল, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে অনু, যতটা পারো আমার হাত থেকে তুলে নাও। একদিন আমাকে ছাড়া তুমি আর নির্মল কিছু জানতে না, সে আমি ভুলিনি। আবার তুমি তাহলে ফিরে এসো আমার কাছে, আমি তোমার সব দায়িত্ব নেবো।

অনুপমার চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

কমলাক্ষ তৎক্ষণাৎ টেলিফোন তুলে ডায়াল ঘুরিয়ে নির্মলকে ডাকল। নির্মল সাড়া দিতেই কমলাক্ষ বলল, তুমি যে অবস্থাতেই থাকো, এখনই চলে এসো, নির্মল—বিশেষ দরকার।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে কমলাক্ষ বলল, কি জানো অনু, আমারও বড় একলা মনে হচ্ছিল, তুমি এক পাশে দাঁড়ালে একটু জোর পাই। কিন্তু সকলের আগে একটা কথা দাও, অনু। বলো, তুমি কোনদিন আমার অবাধ্য হবে না?

অনুপমা একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। বলল, এতকাল পরে আজ তোমার মুখে এ প্রশ্ন কেন?

তুমি আমার একান্ত আপন বলেই কথাটা তুলছি।

আমি তোমার অবাধ্য হয়েছি কোনোদিন? যা সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে হত একদিন, তাও কি তোমার মুখ চেয়ে সম্ভব করে তুলিনি?

কমলাক্ষ ওর মুখের দিকে একবার তাকাল। পরে বলল, সত্যিই বলেছ। এ কথা তোলাই আমার পক্ষে অন্যায়। আমার বিশ্বাসকে তুমি কোনোদিন নষ্ট হতে দাওনি!

দেবরায় তার গ্লাসে চুমুক দিল। তারপর একটা সিগারেট ধরাল। মুন্সী মনোহরলাল বললেন, মেয়েটি নিজের মৃত্যুর পরোয়ানা নিজের হাতেই সই করে দিল মনে হচ্ছে! পাথরে মাথা ঠুকতে এসেছিল।

হাসিমুখে দেবরায় বলল, হ্যাঁ, অনেকটা তাই বটে। কিছুক্ষণ পরে যখন নির্মল এসে কমলাক্ষর পায়ের ধুলো নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়াল, কমলাক্ষ বলল, আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কোরো না, নির্মল।

নির্মলের যৌবনশ্রীর প্রাণপ্রাচুর্য যেন ঠিকরে পড়ছিল এপাশে-ওপাশে। সহাস্যে সে বলল, কোনোদিন প্রত্যাখ্যান কি করেছি, কমলদা?

কমলাক্ষ একবার অনুপমার দিকে হাসিমুখে তাকাল। পরে বলল, অনুকে তুমি বিয়ে করবে, নির্মল! এই আমার একান্ত অনুরোধ।

উদ্যত গোখরো সাপের ফণা দেখে যেমন অতর্কিত পথিক আঁৎকে ওঠে, অনুপমা ঠিক সেইভাবে আর্তনাদ করে উঠল।

নির্মল বলল, আমি রাজি আছি। ওকে অনেকদিন থেকে আমার ভাল লাগছে, কিন্তু ব্রতভঙ্গ হবার ভয়ে আপনাকে বলিনি!

চুপ করো!—অনুপমা চেঁচিয়ে উঠল, বোকার মতন বাহাদুরি দেখিয়ো না, নির্মল।

ওই দেখুন, কমলদা।—নির্মল বলল, এখনই আমার সঙ্গে এই, বিয়ে হলে কি চেহারা হবে তাই ভাবুন। রোজ একখানা করে গয়না না দিলে অনু আমার মান রেখে কথা কইবে না! আপনি যদি বলেন আমি আজই ওকে বাড়ি নিয়ে যাই। মা দেখে খুব খুশী হবেন, কমলদা!

নন্‌সেন্স!—বলে অনুপমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পাশের ঘরে গিয়ে আর কোনখানে কোনও আশ্রয় না পেয়ে সে মেঝের উপর বসে পড়ে একখানা চেয়ারে হেলান দিয়ে সহসা ঝরঝরিয়ে কাঁদতে লাগল। সমগ্র জীবনটা তার যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

দেশমুখ বললেন, মেয়েটির ওপর বড় অবিচার হয়ে যাচ্ছে। কমলাক্ষকে ত' ঠিক নির্বোধ কিংবা অচেতন বলা চলে না, মিঃ রায় ?

আত্রে বললেন, এসব মানুষের চরিত্রের কোনও সংজ্ঞা নেই। এরা ব্রতধারী। অভাবনীয় এদের চিন্তার গতি, মিঃ দেশমুখ।

কিন্তু ভালবাসাটা বুঝতে চাইল না ?

মনোহরলাল বললেন, বোধ হয় ভালবাসার চেয়ে বিবেচনাটাকে বড় করে তুলল। ব্রত যেদিন সাঙ্গ হল, সেদিন সংযমকেই সর্বপ্রধান আদর্শ হিসাবে দেখল। একদিন যাকে স্বহস্তে লালন করেছি, অন্যদিন সে ভোগের পাত্র হবে,—এই ক্ষুদ্রতা হয়ত কমলাক্ষকে পেয়ে বসেনি !—আচ্ছা, তারপর ?

দেবরায় বলল, তারপর কিছু অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গেল। নির্মল চলে যাবার পর কমলাক্ষ উঠে এল এ-ঘরে। অফিসের চাকর ফটিক অনেকক্ষণ আগে তার কাজ সেরে চলে গেছে বলেই ঘরে আলো জ্বালা ছিল না। বারান্দাটা ছাড়িয়ে গেলে কলতলার ওদিকে রান্নাঘর। সেখানে লোকনাথ রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। কমলাক্ষ এ-ঘরে এসে দাঁড়াবার পর যে দৃশ্যের অবতারণা হল, সেটা আগাগোড়া আমার জানবার কথা নয়। তবে অনুপমা সেদিন অত্যন্ত অসামাজিক ছেলেমানুষের মতো আচরণ করেছিল।

সচকিত হয়ে দেশমুখ প্রশ্ন করলেন, মানে ?

দেবরায় বলল, মেয়ে উচ্চশিক্ষিত হলেও সে মেয়ে। তুমি যদি তার চিরকালের আশ্রয়টাকে এক কথায় ভেঙে দাও, তবে সে মরিয়া হয়ে ওঠে বৈকি। ওই আশ্রয়টাকে সে যে গড়ে তুলেছিল এতকাল ধরে তার হৃৎপিণ্ডের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে ? সকলের চেয়ে শক্ত অবলম্বনটাই সবচেয়ে বেশি নড়বড়ে প্রমাণ হল যে ! অনুপমা আর কত সইবে ? কার মুখ চেয়ে সে বেঁচে ছিল ওই কঠোর নিগ্রহের মধ্যেও ? কার মুখ চেয়ে পোড়ারমুখি মরেছিল তার প্রথম তারুণ্য থেকে ?

সে বোধ হয় অনেক কান্নাই কাঁদল ওই মেঝের উপর মুখ গুঁজে, কিন্তু তার হেতু কি হতে পারে সেটি কমলাক্ষ প্রথমটায় অনুমান করতে পারেনি। অতঃপর সম্ভবত অনুপমা আমার বন্ধুর পায়ের উপর পড়ে এই কথাটা বলতে চাইল, আমি তোমার হুকুম অমান্য করতে পারব না, তাই কি এত বড় শাস্তি তুমি আমায় দিলে ? কী করেছি আমি তোমার ? কেন, কেন এমন সর্বনাশ তুমি

আমার করলে ? কেন আমি তোমার পায়ে একটু জায়গা পেলুম না ? কেন আমার কপালে দ্বিচারিণীর কলঙ্ক তুলে দিলে ?

বোধ হয় অনুপমা কয়েকবার মেঝের উপর মাথা ঠুকেছিল।

মিনিট কয়েক পরে ওধার থেকে লোকনাথ কি যেন একটা সন্দেহ করে উঠে এসে বারান্দা পেরিয়ে দেখে গেল, কমলাক্ষর ঘর বন্ধ, এবং সেই ঘরে মেয়েলি কণ্ঠের কান্নাজড়িত প্রলাপোক্তি এবং থেকে-থেকে একটা দাপাদাপির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। লোকনাথ তার মনিবের কোনও সাড়া না নিয়েই আবার রান্নাঘরে ফিরে গেল।

কমলাক্ষ নিজের হাতে নির্মল এবং অনুপমাকে শরীরচর্চা ব্যায়াম শিখিয়েছিল। প্যারালাল বার, পীকক্, মুগুর ভাঁজা, চেস্ট এক্স্প্যানসন, ওঠ-বোস, ডামবেল, ডন-বৈঠক,—এসব ব্যায়ামে সেদিন অবধি মেয়েমহলে অনুপমার জুড়ি ছিল না। সেই সুদীর্ঘকাল ব্যায়ামের ফলে অনুপমার সর্বদেহে ও দুই হাতে যে পেশীর কাঠিন্য জন্মেছিল,—আজ বন্ধ ঘরের মধ্যে সম্ভবত তার ব্যাপক পরিচয় পাওয়া গেল। অনুপমা শুধু কান্না নিয়ে শান্ত থাকেনি।

এ-কথা বিশ্বাস করার কারণ আমার আছে যে, কমলাক্ষ আগাগোড়া নিষ্ক্রিয় এবং প্রশান্ত ছিল। তার শোবার ঘরটি সে মনের মতন করে বরাবরই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত, এবং যতদূর মনে পড়ছে তার এই শয়নকক্ষটিকে সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ সজ্জায় সুসজ্জিত করার কাজে অনুপমারও সাহায্য অনেকটা ছিল। কাচের বাসন, ফুলের পাত্র, চায়না ক্লে'র বিভিন্ন সামগ্রী, নানাবিধ পুতুল-সজ্জা, বহুপ্রকার কিউরিয়ো, কয়েকটি দুর্লভ ছবি, তিন-চারটি গ্লাস-কেস—ইত্যাদি মিলিয়ে কমলাক্ষর বৃহৎ শয়নকক্ষটি একপ্রকার পরিপূর্ণ ছিল। নির্মল সেবার দিল্লী গিয়ে জুমা মসজিদের পশ্চাদ্‌বর্তী আইভরি মার্কেট থেকে একটি মস্ত হাতির দাঁতের সেট এনে কমলাক্ষকে উপহার দিয়েছিল। সেটির মধ্যে রয়েছে, একজন দেশীয় নৃপতি লোকলশকর হাতি-হাওদা রাইফেল-বন্দুক নিয়ে অরণ্যের মধ্যে যখন প্রবেশ করেছিলেন, সেই সময় এক বিশালকায়া ব্যাঘ্রী সেই দলটিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। আইভরি-সেট্‌টি অতি মূল্যবান।

প্রায় আধঘণ্টা অবধি কমলাক্ষর অন্ধকার ঘরটির মধ্যে কাচের সামগ্রীর ঝনঝনা এবং বিভিন্ন প্রকার ভাঙনের বিচিত্র আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। ঘরের মধ্যে কমলাক্ষ যে উপস্থিত ছিল এবং সে যে আগাগোড়া ব্যাপারটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে বরদাস্ত করেছে, এর প্রমাণ ছিল বৈকি।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের কাছাকাছি সেই ফ্ল্যাটে কেউ উপস্থিত থাকলে লক্ষ্য করতে পারত, অত্যন্ত আহত অবস্থায় কমলাক্ষ তার আপিসঘরের মেঝেতে চোখ বুজে পড়ে রয়েছে। সমস্ত জামাকাপড়ে তার রক্তের দাগ, এবং একখানা ভাল শাড়ির ছেঁড়া টুকরো দিয়ে তার কপালটা ব্যাণ্ডেজ করা। কমলাক্ষ ঘুমিয়েছে।

পাশের ঘরে অন্ধকারে তখনও পায়চারি করছিল সেই সেকালের প্রাচীন বিপ্লবী গোবিন্দ ঘোষালের সেই সাংঘাতিক স্বাস্থ্যবতী এবং অক্ষত-কৌমার্য বিপ্লবী মেয়েটা—যার বয়স হয়ত এখন হবে বছর-পঁচিশেক। শাড়িখানা ছিন্নভিন্ন, ওখানা দিয়ে আর সমগ্র যৌবনের আব্রু রক্ষা করা চলে না। প্রতি পদক্ষেপে ঘরের মেঝের উপর আঁকা হচ্ছিল রক্তের দাগ,—নতুন বউ যেমন পায়ে পায়ে আলতার চিহ্ন রেখে যায়। কিন্তু এখানে পিঞ্জরাবদ্ধা ব্যাঘ্রীর উপমাই সহজে আসে—যে জন্তুটা তখনও ঘৃণায় ও ক্রোধে হাঁসফাঁস করছিল। অন্ধকারে ওর জ্বলজ্বলে, রক্তিম ও সজল দুটো চোখ ঠাহর করা গেলে বোঝা যেত, তার মুখের শিকার অথবা কোলের শাবক,—ঠিক কোন্‌টার থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে! একটা বৈপ্লবিক অগ্নিপিণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়,—ধক্‌ধক্‌ করছে তার আগুনের আভা!

বিয়ের পর কমলাক্ষর সঙ্গে অনুপমার আর দেখা হয়নি। নির্মলের সঙ্গে মধ্যে-মাঝে অবশ্য দেখা হয়ে যেত। পরাধীন ভারতে ওদের পরস্পরের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ছিল, স্বাধীন ভারতে বৃহৎ কর্মযজ্ঞের মধ্যে ওরা যেন হারিয়ে গেল।

বছর তিনেক পরে হঠাৎ অনুপমার খবর এসে হাজির হল।

বিয়ের পর সে সুখী এবং সুগৃহিণী হয়েছিল। মনের মতো স্বামী, সংসার-ভরা ভালবাসা, ধনাঢ্য পরিবারের বিলাস-বৈভব এবং আনন্দময় জীবন। শুধু তাই নয়, অনুপমার যেটি সর্বাপেক্ষা প্রিয়,—তার অবাধ গতিবিধি এবং চলাফেরার স্বাধীনতা—সেটি সে পরিপূর্ণভাবে পেয়েছিল। সংসারের বিরুদ্ধে তার কোনও নালিশ ছিল না।

একটি পরম রূপবান শিশুপুত্র তার কোলে জন্মগ্রহণ করেছিল। শিশুটির বয়স এখন বছর দেড়েক। নির্মলের রাতদিনের খেলার সঙ্গী সে।

তিন বছর পরে কমলাক্ষর কাছে অনুপমার একখানা চিঠি এল :

"এতদিন পরে আনন্দের সঙ্গে তোমাকে জানাচ্ছি, আমার সমস্ত জীবনের

ঋণ তোমার কাছে রয়ে গেছে। তোমার আশীর্বাদ মিথ্যে হয়নি। আমার পরম সৌভাগ্যক্রমে নির্মলের স্ত্রী হতে পেরেছিলুম। এমন ভদ্র, সংযত, মধুরস্বভাব স্বামী পাওয়া যে-কোনও মেয়ের পক্ষে গর্ব এবং সৌভাগ্যের কথা। নির্মল আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। কিন্তু কিছুকাল থেকেই কেন জানি আমার মনে হচ্ছিল, তোমার সকল কাজ আমার হাত দিয়ে এখনও ত' শেষ হয়নি! অত সুখের মধ্যেও আমার মনে যে অস্বস্তি ভরে উঠল, সে বোধ হয় তোমারই কাছে পাওয়া সর্বনাশা ইষ্টমন্ত্রের শক্তির গুণে। সেইজন্যে ভরা সুখের মধ্যেও ওটা আমাকে স্থির থাকতে দিল না। নির্মলকে ছুটি দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম…"

কমলাক্ষ চমকে উঠে চিঠির মাথার দিকটা লক্ষ্য করল। ঠিক আমার মনে নেই, ওটা মালদহ কিংবা বাঁকুড়া জেলার কোন্ গ্রাম, যেখান থেকে চিঠিখানা এসেছে। তারিখটা একটু পুরোনো, সেটাও আবার জলের ফোঁটা লেগে ঝাপসা হয়ে আছে। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কমলাক্ষ চিঠিখানার বাকি অংশটুকু পড়ে গেল :

"বছর খানেক প্রায় হতে চলল, আমি বাড়ি নেই। যেখান থেকেই আমার স্বামীকে চিঠি লিখি না কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে টাকা পাঠিয়ে দেন। তাঁর অকৃপণ উদারতা আমার জীবনকে সার্থক করেছে। অতঃপর ঘুরতে ঘুরতে আমি এখানে এসে এক চাষীপরিবারের ঘরে উঠেছি,—প্রায় মাস ছয়েক হল বৈকি। এদিকটা বড্ড অন্ধকার বড্ড অনড়, বাঁচবার মতো প্রাণশক্তির চিহ্ন কোথাও যেন খুঁজে পাইনি। কিন্তু তুমিই একদিন বলতে, মানুষ মরে না! তার শবদেহের উপরে কান পাততে জানলে জীবনের স্পন্দন শোনা যায়। সেইজন্য এখানকার সকল কাজে তুমিই আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে আছ। তোমার কাজই আমি করে যাচ্ছি। তোমার ভাবনাই আমার সব কাজে জড়ানো। তুমি আমার ভাগ্যবিধাতার আসনে বসে রয়েছ।

মাস দুই হতে চলল একটা নোংরা অসুখে ভুগছি। মাঝে মাঝে জ্বর এবং আমাশয়ে বেহুঁশ হই। এখানে ডাক্তার-বদ্যি তেমন কিছু নেই। হাসপাতালের কথা ছেড়েই দাও। আমার দুঃখ এই, আমি পড়ে থাকলে এখানকার রুগ্ণ আর নিরক্ষর ছেলেমেয়েগুলোকে দেখবার বিশেষ কেউ থাকবে না। এরা বলাবলি করছে, আমি নাকি বাঁচব না।

আজ ঝুলন-পূর্ণিমা। অনেকদিন পরে দেখছি আকাশটা পরিষ্কার হয়েছে।

বেশ মনে পড়ছে, আজকের দিনে তুমি আমাদের হাতে রাখী বেঁধে দিয়ে বলতে, আমাদের বন্ধুত্ব আর ভালবাসা চিরকাল যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু এই রাখী-বাঁধা হাত দিয়েই একদিন তোমার ঘরখানা রাগ করে তচনচ করেছিলুম, মনে আছে ত'? তখন তুমি ঘর ছেড়ে না গেলে নিশ্চয় দেখতে, আমার সমস্ত জীবনটা ওই ঘরেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল। জীবনে আমি সেই প্রথম পাপ করেছিলুম।

কমলদা, আমার সেই সর্বনেশে হাতখানা আজ দেখলে আর তুমি চিনতে পারবে না। এ হাতখানা বড় রোগা, শুধু হাড়ের একখানা সরু কঙ্কাল! তোমাকে এই প্রথম ও শেষ চিঠি লিখতে-লিখতে দেখছি, পরিশ্রম আর আবেগ সইতে না পেরে হাতখানা কাঁপছে। প্রণাম নিয়ো। ইতি—তোমার 'পোড়ারমুখী' —অনুপমা।"

দেশমুখ ঝুঁকে পড়ে চেঁচিয়ে বললেন, তারপর?

মদের পাত্রে শেষ চুমুক দিয়ে দেবরায় বলল, দিন পনেরো পরে টেলিফোনে নির্মল কমলাক্ষকে খবর দিয়েছিল, অনুপমার মৃত্যুতে সে উপস্থিত থাকতে পারল না, এজন্য সে বড়ই মর্মাহত হয়ে রইল!

গল্পটা ওখানেই শেষ। ততক্ষণে গোদাবরীর ওপারে সপ্তমীর চন্দ্র কখন যেন অস্তাচলে নেমে গিয়েছে।—

মনে রেখ

একটি জীবন

বুদ্ধদেব বসু

নবম শ্রেণীতে বাংলা সাহিত্যের ক্লাশে খুলনা জগত্তারিণী স্কুলের হেড-পণ্ডিত গুরুদাস ভট্টাচার্য, বাচস্পতির একটি অপঘাত ঘটলো।

'আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে তাহারে বড়ো করি মানে'—এই 'চেয়ে' কথাটায় খটকা লাগলো পণ্ডিতের। চেয়ে? অর্থাৎ, দৃষ্টিপাত করিয়া? না কি আকাঙ্ক্ষা করিয়া? একটু ভেবে তিনি ব্যাখ্যা করলেন—'রাজা বলছেন প্রজারা

তাঁকেই চায়, তাঁরই আশ্রয় কামনা করে, কিন্তু শ্রদ্ধা করে কোশলরাজকে। এখানে রচনার ব্যাকরণ একটু দুষ্ট হয়েছে।'

শুনে প্রথম বেঞ্চিতে কয়েকটি ছেলে মুখ-চাওয়াচাউয়ি করলে। একটু পরে একজন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'স্যর, এটা ঠিকই আছে। "চেয়ে" মানে এখানে 'হইতে', যাকে ইংরেজিতে বলে "than"। একটু পরেই আছে দেখুন—"আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান স্পর্ধা বাড়িয়াছে বড়ো!"'

'"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন!"' আবৃত্তি করলে পাশের ছেলেটি।

গুরুদাস কিছু বললেন না, ছাত্রদের সংশোধন নিঃশব্দে মেনে নিয়ে কবিতাটি পড়িয়ে গেলেন। ঘণ্টা বাজলো।

সেটাই শেষ ঘণ্টা, মাস্টারমশাইরা ছাতা, চাদর, খাতাপত্র সংগ্রহ ক'রে যে যাঁর বাড়িমুখো রওনা হলেন, গুরুদাস এলেন স্কুলের লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরি মানে শিক্ষকদের বসবার ঘরেরই এক কোণে তিন আলমারি বই—তার বেশির ভাগ বিনামূল্যে নমুনাস্বরূপ প্রাপ্ত পাঠ্যপুস্তক। অপেক্ষাকৃত মূল্যবানের মধ্যে আছে কয়েক সেট পুরোনো বাঁধানো 'প্রবাসী', কুড়ি বছর আগেকার ছাপা ফিলিপ্স অ্যাটলাস, একখানা চেম্বার্স ডিকশনারি, আর খান তিনেক বাংলা আর ইংরেজি-বাংলা ছাত্রব্যবহার্য অভিধান। গুরুদাস গলা-খাঁকারি দিয়ে ডাকলেন, 'ওহে নবকেষ্ট, এই আলমারিটা একটু খোলো তো।'

স্কুলের পণ্ডিতকে চাকররাও বেশি গ্রাহ্য করে না, তার উপর নবকেষ্টকে বেয়ারা, দরোয়ান, মালির কাজ সবই প্রায় এক হাতে করতে হয়। সে একটু উদ্ধতভাবে জবাব দিলে, 'লাইব্রেরি বন্ধ হ'য়ে গেছে, স্যর।'

'আহা, একটু খোলোই না। প্রয়োজন আছে।'

'আমাকে আবার এখনই রসুলপুরে যেতে হবে কিনা—মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে নেমন্তন্ন—'

'আচ্ছা, আচ্ছা—তুমি চ'লে যাও। চাবি থাক আমার কাছে।'

'তা-ই রইলো তবে—কেমন? চাবিটা কাল এগারোটার আগেই দেবেন কিন্তু আমাকে। নতুন হেডমাস্টার কেমন কড়া লোক জানেন তো। আর যাবার সময় ঘরের দরজাতেও তালা দেবেন—এই যে তালা—দেখছেন?'

গুরুদাস আলমারি খুলে দাঁড়ালেন; তাঁর পিঠের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে নবকেষ্ট টেবিলের তলা থেকে তার গামছায় বাঁধা পোঁটলাটা তুলে

নিলে—মেয়ের বাড়িতে তত্ত্ব নিয়ে যাচ্ছে স্কুলের গাছের কয়েকটা বাতাবি নেবু।

অভিধান বাড়িতে নিয়ে যাবার নিয়ম নেই; বাংলা অভিধান দুটোর পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলেন গুরুদাস। আলো ক'মে এলো, মফস্বলের সান্ধ্য স্তব্ধতা ঘন হ'য়ে নামলো ঘরের মধ্যে। তিনি বসতে ভুলে গেলেন, খিদে ভুলে গেলেন, সারি-সারি অক্ষরগুলোকে তাঁর অন্তরিন্দ্রিয় যেন লেহন ক'রে নিতে লাগলো। মনে তাঁর আঘাত লেগেছে আজকের ঘটনায়। এই 'চেয়ে' কথাটা—অসংখ্য মানুষ, বালক-বালিকা, প্রত্যহ যা অচেতনভাবে ব্যবহার করছে—তার অর্থটা তিনি ধরতে পারলেন না! কেমন ক'রে পারবেন —তিনি যে সংস্কৃতের পণ্ডিত। সংস্কৃত শিখেছেন, বাংলা শেখেননি। কিন্তু জাতে বাঙালি—বাংলাতেই কথা বলেন তো। হঠাৎ যেন এই প্রথম উপলব্ধি করলেন যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত নয়, এমনকি সংস্কৃতের একটা অপভ্রংশও তাকে বলা যায় না—সে একটা আস্ত, সজীব, পরিবর্তনশীল, বিবর্ধমান, স্বাধীন ভাষা, সাত কোটি মানুষের কথ্য ভাষা, মাতৃভাষা। 'জীবিত ভাষা, মাতৃভাষা'— মনে-মনে কয়েকবার উচ্চারণ করলেন কথাটা। কিন্তু মাতৃভাষা হ'লেই দক্ষতা জন্মায় না. তার জন্য প্রযত্ন চাই।

গুরুদাস লক্ষ করলেন কোনো অভিধানেই 'চেয়ে' কথাটা নেই। এই রকম আর-একটা কথাও তাঁর মনে পড়লো. 'থেকে'। 'এখান থেকে, ওখান থেকে'; 'দু-দিন থেকে যাও না।' 'দেখা. দেখা হওয়া, দেখা করা, দেখা পাওয়া'—সংস্কৃত উপসর্গের কাজ বাংলা ভাষা এইভাবেই করিয়ে নিচ্ছে। কিছুই নেই এ-সব অভিধানে। ভুল আছে: ভুল ব্যাখ্যা, এমনকি ভুল বানান। কী ক'রে শিখবে ছেলেরা? আর আমি—আমিই বা কেমন ক'রে শিখবো?

বাড়ি ফিরতে সন্ধে হ'লো গুরুদাসের। স্ত্রী হরিমোহিনী জিগেস করলেন, 'এত দেরি হ'লো?' গুরুদাস জবাব দিলেন না। রাত্রে নিঃশব্দে খেয়ে উঠলেন। 'তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে? ভালো ক'রে খাচ্ছো না!' 'শরীর খারাপ হয়নি।' তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন সে-রাত্রে।

জগত্তারিণী স্কুল এগারোটায় বসে, জিলা স্কুল সাড়ে-দশটায়। পরের দিন সওয়া-দশটা নাগাদ গুরুদাস জিলা স্কুলে গেলেন, সেখানকার লাইব্রেরিতে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে নিজের ক্লাশ ধরলেন সময়-মতো। পরের

দিন শনিবার, স্কুল থেকে গেলেন খুলনার একমাত্র কলেজে। সংস্কৃত অধ্যাপকের সঙ্গে মুখ-চেনা ছিলো (এখানেও তিনি বাংলা পড়ান); কিছু কথা হ'লো তাঁর সঙ্গে, লাইব্রেরিতে দু-চারখানা বই ঘাঁটলেন—কিন্তু মনের অস্থিরতা মিটলো না।

না—পেলেন না, যা খুঁজছেন তা পাওয়া গেলো না কোথাও। সম্পূর্ণ একটি বাংলা অভিধান কি হয় না—যাতে সংস্কৃত আর দেশজ সব শব্দই স্থান পেয়েছে, দেখানো হয়েছে সব শব্দবন্ধ, বিভিন্ন ব্যবহার, লৌকিক প্রয়োগ, যা থেকে বাংলা ভাষা শেখা যাবে, বোঝা যাবে তার প্রকৃতি, তার বিশেষ সৃষ্টিশীল প্রতিভা? কলেজের অধ্যাপক বললেন, এমন বই একখানাও নেই। যে-ক'খানা দেখলেন, তার মধ্যে ভালো আছে, কিন্তু কাজ-চালানো গোছের ভালো—রীতিমতো অধ্যয়ন করা যায় এমন গ্রন্থ কোথায়?

শহরের সবচেয়ে বড়ো বইয়ের দোকান ভিক্টরিয়া লাইব্রেরি। সন্ধেবেলা সেখানে এসে একটি বড়ো বাংলা অভিধান আর অক্সফোর্ডের ইংরেজি অভিধান দেখতে চাইলেন। দু-চার মিনিট দেখার পর নিচু গলায় বললেন, 'রেবতীবাবু, একটা কথা ছিলো।'

ছোটো শহর, প্রায় সকলেই সকলকে চেনে। দোকানের মালিক চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালেন।

'আজ তো শনিবার—এই বই দুটো একটু নিয়ে যাবো? সোমবার আপনার দোকান খোলার সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরিয়ে দেবো ঠিক।'

'বাড়ি নিয়ে যাবেন?'

'খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করবো—ময়লা হবে না—কিচ্ছু হবে না—যত্নে রাখবো আমি। একটু বিশেষ প্রয়োজন ঘটেছে কিনা।'

'বই দুটোর অর্ডার আছে, পণ্ডিত মশাই।'

'ও।' গুরুদাসের ফর্শা, রোগা মুখ একটু লাল হ'লো। কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার বললেন—'তাহ'লে কিনেই নিয়ে যাই।' প্রকাণ্ড একটা যুদ্ধ করতে হ'লো নিজের সঙ্গে, কিন্তু—যাক, বলা হ'য়ে গেছে, আর ফেরা যাবে না।

'ওরে—পণ্ডিত মশাইকে বেঁধে দে বই দুটো—' 'অর্ডারি' জিনিশ অন্যকে দেয়া বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করলেন না রেবতীবাবু।

'দাম কিন্তু মাস পড়লে দেবো।'

'ম্‌ম্‌—' এই ফাঁকে গুরুদাসের নিঃশব্দ প্রার্থনা উঠলো—'ভগবান, যেন রাজি না হয়!'—কিন্তু রেবতীবাবুর ঠোঁটের ভাঁজ নরম হ'লো।

'আচ্ছা, নিয়ে যান। ঠিক পয়লা তারিখেই—ভুলবেন না কিন্তু। বোঝেন তো—ছোটো কারবার আমাদের। এখানটায় একটা সই দিন।'

শিক্ষক ব'লে কিছু শস্তায় পেয়েছেন, তেরো টাকা চোদ্দ আনার বিল। তাঁর মাইনের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ।

অনেক রাত জেগে লণ্ঠনের আলোয় তাঁর নতুন সম্পত্তি নাড়াচাড়া করলেন সেদিন। ইংরেজিটা গুরুদাস কমই জানেন, কিন্তু দুটো বইয়ের ব্যবস্থাপনার তফাৎ বুঝতে দেরি হ'লো না। অথচ এটা তো ছোটো বই, অক্সফোর্ডের মস্ত বড়ো অভিধানও আছে, শুনেছেন।

ঘুমের আগে পাণিনির কথা ভাবলেন, সংস্কৃত শব্দকল্পদ্রুমের আয়তন চিন্তা করলেন, স্মরণ করলেন বিদ্যাসাগরকে। ব্যাকরণে বিরাট প্রতিভা, বিশ্লেষণে দুরন্ত উদ্যম, অফুরন্ত শব্দসম্ভার। সবই ছিলো। গেলো কোথায়?

ছোট্ট উঠোনের এক কোণে বেড়া দিয়ে কয়েকটা ফুলগাছ করেছেন হরি-মোহিনী, রবিবার সকালে মেয়েকে নিয়ে জল দিচ্ছেন তাতে, এমন সময় গুরুদাস হাসিমুখে সেখানে এসে দাঁড়ালেন।

'শিবানী, ত্যাখ তো, নিধুর মা দুধ নিয়ে এলো নাকি?'

'ও-সব পরে হবে। আমার একটা কথা শোনো আগে।'

হরিমোহিনী হাতের কাজ বন্ধ ক'রে তাকালেন।

'আমি একটা কাজে হাত দিতে যাচ্ছি।'

হরিমোহিনীর মুখে আশার ঝলক লাগলো। নিমতলার চাটুয্যে-বাড়িতে শিবানীর সম্বন্ধ কি স্থির হ'লো তাহ'লে? বড়ো মেয়ে ভবানী কুলীনের ঘরে পড়েছে—এই আর-একটা মেয়ে। পনেরোয় পড়লো, এখন বিয়ে না-হ'লে আর কবে?

'ওরা বুঝি ব'লে পাঠিয়েছে কিছু?'

'কারা?'

'নিমতলার চাটুয্যেরা?'

'না! সে-কথা না। আমি বাংলা ভাষার একখানা অভিধান রচনা করবো। কাল স্থির করলাম।'

কথাটা হরিমোহিনীর মুখে কোনো রেখাপাত করলো না।

'অভিধান বোঝো তো? শব্দকোষ। বাংলা ভাষার সমুদয় শব্দ, শব্দার্থ, শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি। এ-রকম গ্রন্থ একখানাও নেই, জানো তো।'

'একখানাও নেই? তুমি লিখবে সেই বই?' হরিমোহিনীর মনে-মনে গর্ব হলো। 'ঠাকুর-দেবতার কথা থাকবে তাতে?'

'সব থাকবে।'

হ্যাঁ, সব থাকবে। নিজের অজান্তেই একটি হাসি ছড়িয়ে পড়লো গুরুদাসের মুখে। এটা স্থির করা মাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন কাল রাত্রে—গভীর সেই নিদ্রা—আর আজ প্রাতে জেগে উঠে ছাখেন মন শান্ত, চিত্ত প্রফুল্ল, দেহ আরোগ্যস্নিগ্ধ—আর আকাশে রৌদ্রে তরুপল্লবে সর্বত্র একটা সমর্থন উদ্ভাসিত হচ্ছে। যেন তাঁর এই সংকল্পের জন্যই সারা প্রকৃতি অপেক্ষা ক'রে ছিলো এ-ক'দিন: তিনি এটি গ্রহণ করামাত্র প্রসাদ ছড়িয়ে পড়লো আকাশে, তাঁর দেহের অন্তর্গত ক্রিয়াকলাপও স্বচ্ছন্দ হ'লো। ঠাকুর-দেবতা—তাও দিতে হবে বইকি। কিন্তু সকল দেবতা? সকল নাম? কোনটা বিশ্বকোষের বিষয়, আর কোনটা অভিধানের, তা স্থির করা চাই। সংস্কৃত শব্দের মধ্যে বাংলা ব'লে গ্রাহ্য কোন-গুলো? ব্রজবুলির কী হবে? 'বাংলা ভাষা'—এই ধারণার লক্ষণ কী-কী? যে-সব শব্দ প্রচলিত নেই, অথচ প্রয়োজন হ'তে পারে, তার রচনা করে দিতে হবে কিনা। অনেক ভাববার আছে। ভাববার আছে—কিন্তু এদিকে এখনই আরম্ভ ক'রে দেবার জন্য হরিমোহিনীর গাছাপালা সুদ্ধ তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছে।

ছাত্রজীবনে একবার পুরী গিয়েছিলেন গুরুদাস: সেই কথা মনে পড়লো তাঁর। তেমনি সমুদ্র দেখতে পাচ্ছেন চোখের সামনে—ঢেউয়ের পর ঢেউ, গহ্বর, ঘূর্ণি, প্রয়াস—ঐ দূরে দিগন্ত। এই সাগরে ভেলা ভাসবে, এই সাগর পার হ'তে হবে। মুহূর্তের জন্য গায়ে কাঁটা দিলো গুরুদাসের।

দুপুরবেলা আহারের পরে স্ত্রীর কাছে আবার তিনি কথাটা পাড়লেন।

'সেই অভিধানের বিষয়টা ভাবছিলাম।'

'কী, বলো?'

'না—কথাটা কী—কিছু উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। মানে, কিছু বই-টই আরকি।'

'বেশ তো।'

'খুব মূল্যবান গ্রন্থ—অনেক দাম। ভাবছিলাম, দেশে চক্কোত্তি মশায় সেবার দু-বিঘে জমির জন্য আমাকে—'

'বেচে দেবে ?' হরিমোহিনীর মুখে ছায়া পড়লো। 'কী বা আছে—আরেক মেয়ে তো বড়ো হ'লো এদিকে।'

'যা আছে, তাতে এই একরকম চ'লে যাবে আরকি।' গুরুদাসের এই কথাটায় খুব প্রত্যয়ের স্বর লাগলো না, মোলায়েম একটু হেসে সেই ফাঁকটা যেন ভরাতে চাইলেন। 'মানে—আমার জীবন চ'লেই যাবে, তারপর তোমার ছেলে যোগ্য হ'লে তোমার আর ভাবনা কী।'

'কথার কী ছিরি! আমি তো আমার নিজের কথাই ভাবছি দিনরাত। তা নবুকে কিন্তু তোমার পণ্ডিতি পেশায় দেবো না আমি। নিতাই—আমার বোনপো—সে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে এই সেদিন রেলের চাকরিতে ঢুকলো। এরই মধ্যে ষাট টাকা মাইনে হয়েছে—তাছাড়া উপুরিও মন্দ পায় না।'

শেষের কথাটা গুরুদাসের ভালো লাগলো না, কিন্তু উদ্যত প্রতিবাদটাকে গিলে ফেলে আসল প্রসঙ্গে ফিরে এলেন।

'রেলের চাকরি কেন—হয়তো জ্যাঠার মতো ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটই হ'তে পারবে নবু,' ব'লে গুরুদাস আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। হিশেব ক'রে কথাটা বলেছিলেন স্ত্রীকে সুখী করার জন্য—তাঁর বৈমাত্রেয় দাদা শিবদাসের ডেপুটিগিরির প্রতি হরিমোহিনীর অসীম শ্রদ্ধার খবর তাঁর অজানা ছিলো না।

'আমার কি অত ভাগ্য! তবে লক্ষ্মীর কৃপা থাকলে কী না হয়, বলো! হ্যাঁ গো, সেদিন বেস্পতিবার তোমাকে লক্ষ্মীপুজোর শিন্নি পাঠিয়ে দিলুম, শিবানী বললে তুমি খাওনি ?'

'মাথায় ঠেকিয়েছিলুম—সে তো খাওয়ার বেশি হ'লো। তাহ'লে শোনো —ঐ বিঘে দুটো দিয়ে দিই চক্কোত্তি মশাইকে—কী বলো ?'

'দিয়ে দেবে ? কী বা আছে জমিজমা—এদিকে মেয়েটা গলায় ঝুলছে, আর আমার নবুর জন্যও কিছু রাখা চাই তো।'

'সব হবে। কিন্তু আমি তো এখন আর ফিরতে পারি না।'

'ফিরতে পারি না মানে ?'

'বিষয় মাত্রেই ক্ষণিক, কিন্তু—' বাচস্পতি ভাষার জন্য একটু হাৎড়ালেন, তারপর নিরুপায়ভাবে হৃদয়বৃত্তিতেই আবেদন পৌঁছিয়ে দিলেন, 'আমি মনস্থির ক'রে ফেলেছি—তুমি কি এখন বাধা দেবে ?'

দেশ নন্দীগ্রামে, লঞ্চে ঘণ্টাখানেকের পথ। জন্মাষ্টমীর ছুটিতে দু-দিনের জন্য গেলেন। কোঠাবাড়ি, আম জাম কাঁঠাল মাদার, একটি ছোটো পুকুর,

কিছু ধানের জমি। কিছু মানে—ঠাকুরদার আমলে ছু-শো বিঘে ছিলো, অনেক ভাগ-টাগ হ'য়ে গুরুদাসের অংশে পড়েছে পঁচিশ, বড়ো মেয়ের বিয়েতে পাঁচ বিঘে ছাড়তে হ'লো, আর এই ছুই। তা যাকগে, আপাতত হাতে-হাতে দেড়শো টাকা পাওয়া গেলো তো। বাড়ির পুঁথিপত্র ঘেঁটে বম্বাইতে ছাপা সংস্কৃত অভিধানটাও পাওয়া গেলো—তাঁর বাবার এটা—আর কী ভাগ্যে বটতলার 'শব্দমঞ্জরী'টা, যেটা তিনি টোলে পড়ার সময় আর-একটি ছাত্রের কাছে ধার নিয়ে ফেরৎ দিতে ভুলেছিলেন। খুলনায় ফিরে প্রথমেই কিনলেন সবচেয়ে শস্তা দামের ছু-দিস্তে বালি কাগজ, শিবানী ফুটো ক'রে খাতা তৈরি ক'রে দিলে।

মহালয়ার দিন থেকে স্কুলে পুজোর ছুটি আরম্ভ ; সেদিনই এলেন কলকাতায়, শেয়ালদার কাছে চেনা মেস্-এ দিন তিনেক থাকতে হ'লো। আরো ছুটো বাংলা অভিধান, সুনীতি চাটুয্যের বই, কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাতে আর চিৎপুরে ঘুরে-ঘুরে একটা আদ্যিযুগের (কিন্তু খুব ভালো) সংস্কৃত-বাংলা অভিধান, সাহেবদের লেখা বাংলা ব্যাকরণ, বসুমতীর টেকচাঁদ আর হুতোম প্যাঁচা, হিতবাদীর ছাপা কালী সিঙ্গির মহাভারত। রবিঠাকুরের লেখা 'শব্দতত্ত্ব' বই দেখে সেটাও বাদ দিতে ভরসা পেলেন না—কবিরাই তো ভাষার স্রষ্টা, কী বলেছেন দেখা যাক। এ-সবে প্রায় পঞ্চাশ টাকা বেরিয়ে গেলো। তারপর পুজোর শাড়ি-জামা, হরিমোহিনী আর ভবানীর জন্য ছু-জোড়া শাঁখা, জামাইয়ের ধুতি—নবুর জন্য একজোড়া তেরো আনা দামের রবারের চটি। বইয়ের জন্য ফিরতি পথে কুলি ভাড়ায় আট আনা পয়সা খরচ হ'লো—বড্ড গায়ে লাগলো সেটা।

পুজোর সময় দেশের বাড়িতে বেশ আনন্দে কাটলো সেবার। হরিমোহিনী ছেলেমেয়েদের নিয়ে থেকে গেলেন, গুরুদাস ফিরে এলেন লক্ষ্মীপুজোর পরের দিনই। নিজে রেঁধে খান, সারাদিন পড়েন। ইংরেজির জন্য অসুবিধে হয়, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারেন মোটামুটি, অভ্যাসে সহজও হ'য়ে আসে। শ্যামাপুজোর আগের দিন শিবানীর তৈরি একটা খাতা নিয়ে প্রথম পাতায় বড়ো অক্ষরে লিখলেন : অ। পঞ্চাশটা শব্দ লেখা হ'লো সেদিন। তিন দিন পরে স্কুল খুললো, ওরা ফিরে এলো, অবসর অনেক ক'মে গেলো।

গুরুদাস নিয়ম ক'রে নিলেন। ভোর পাঁচটায় উঠে ছু-ঘণ্টা লেখেন, তারপর বরাদ্দ ছুধটুকু খেয়ে টিউশনি সেরে, বাজার নিয়ে ফিরে আসেন। স্নানের

আগে আরো একটু সময় পাওয়া যায়। সন্ধেবেলায় আর-একটা টিউশনি থাকে—পরীক্ষা সামনে এখন—কিন্তু রাত্রেও ঘণ্টা দুই না-লিখে শুতে যান না। তরতর ক'রে অনেকটা লেখা হ'য়ে গেলো।

শীত পড়লো, ছ-টার আগে আলো ফোটে না, বার্ষিক পরীক্ষার খাতা দেখার চাপও এই সময়ে। কিন্তু বড়োদিনের ছুটি তো আছে।

বড়োদিনের ছুটিতে আবার কলকাতায় আসতে হ'লো। বিষয়টা দ্রৌপদীর শাড়ির মতো ভাঁজে-ভাঁজে খুলে যাচ্ছে, তার মধ্যে রহস্যের যেন অন্ত নেই, গভীর থেকে আরো গভীরে কেবলই তলিয়ে যেতে হয়। এর সমকক্ষ কেমন ক'রে হবেন তিনি—তিনি, নেহাৎই একজন গুরুদাস ভট্টাচার্য, টুলো পণ্ডিত? এমনকি, এর পথের নিশানাও তিনি জানেন না, ইমারতের চুন বালি সুরকি কোথায় পাওয়া যাবে তারও কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই তাঁর। কলকাতায় এসে ইম্পীরিয়ল লাইব্রেরিতে হানা দিলেন: দিন কেটে গেলো তুলনামূলক শব্দতত্ত্বের গূঢ় অরণ্যে পথ চিনে নিতে। অনেক বই জর্মন ভাষায় লেখা, তার মধ্যে আবার গ্রীক অক্ষরের ছড়াছড়ি, লাটিন, গথিক, পারসিকের উল্লেখের ভিড়, যেন অসংখ্য শাখা-প্রশাখা নিয়ে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর্যভাষার বিরাট বনস্পতি। শুধু সংস্কৃত প'ড়ে এই ধারণাটি তিনি কখনো পাননি—পশ্চিমের সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে এই আত্মীয়তাবোধ। এই প্রথম দেখলেন মনিয়র-উইলিয়্যামস-এর সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান, আবিষ্কার করলেন স্কীট-এর ব্যুৎপত্তিমূলক শব্দকোষ। খাতা-বোঝাই নোট নিয়ে-নিয়ে দশটা দিন কেটে গেলো।

গ্রীষ্মের ছুটিতে আবার যখন কলকাতায় যাত্রা করবেন, হরিমোহিনী একটু আপত্তি না-ক'রে পারলেন না।

'আবার কলকাতায় কেন?'

'প্রয়োজন আছে।'

'আমি খরচের কথা ভাবছিলাম। আবার মেস্-এও তো দণ্ড যাবে কিছু।'

সে-কথা গুরুদাসও ভেবেছেন। পরীক্ষার ঋতু অতীত, সংস্কৃত বেশি ছেলে পড়ে না আজকাল, হাতে টিউশনি নেই। দেশ থেকে কিছু চালডাল আসে ব'লে পঁয়তাল্লিশ টাকায় কুলিয়ে যায় কোনোরকমে—কিন্তু কোনোরকমেই কুলিয়ে যায়। মোটা ভাত-কাপড়টা জোটে, তার বাইরে একটু কিছু হ'লেই বেশামাল। কিন্তু—যেতেই হবে।

'তোমার মামা আছেন না কলকাতায়?' বললেন হরিমোহিনী, 'তাঁর বাড়িতে যদি—'

'না, না, একমাস কি পরের বাড়িতে থাকা যায়? আর মামা—মা-র খুড়তুতো ভাই তিনি—কত কাল দেখাশোনা নেই—সে হয় না। তা কুলিয়ে যাবে কোনোরকমে—ভেবো না তুমি।'

'তুমি বলো ভেবো না, কিন্তু আমি তো দু-চোখের পাতা এক করতে পারি না রাত্রে।'

'কেন বলো তো?'

'শিবানীকে তুমি কি আইবুড়ো ক'রে রাখবে, ঠিক করেছো?'

তাও তো বটে। কন্যার যৌবনের লক্ষণ প্রস্ফুট, তা মানতেই হয়। বিবাহ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু—কী করা যায়?

'এত ব্যস্ত কেন? এখনো তো পনেরো হয়নি ওর। অনেকে আজকাল আঠারোর আগে মেয়ের বিয়ের কথা চিন্তাই করে না।'

'তুমি এ-কথা বলছো? নন্দীগ্রামের বামুন পণ্ডিতের ছেলে তুমি, যাদের ঘরে দশ পেরোতো না মেয়েদের?'

'কেন বলবো না? রামমোহন রায় কি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বলেননি? বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেননি বিদ্যাসাগর? তাঁরাও তো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই ছিলেন।'

'যারা আঠারো-উনিশে মেয়ের বিয়ে দেয় তারা মেয়েদের স্কুলে-কলেজে পড়ায়—বুঝেছো? ঘরে বসিয়ে গলার কাঁটা ক'রে রাখে না। তোমার কি সে-মুরোদই আছে?'

গুরুদাসের রোগা, ফর্শা মুখ একটু ফ্যাকাশে হ'লো এ-কথা শুনে। সত্য কথা। জবাব দেবার কিছু নেই। বিবাহের চেষ্টা অবশ্যকৃত্য।

ঘটকের কাছে খবর পেলেন কলকাতায় হাটখোলার রামেশ্বর বাঁড়ুয্যের তৃতীয় পুত্রের জন্য পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। গুরুদাস যখন সংস্কৃত কলেজে পড়েন (মাত্র এক বছরই পড়েছিলেন), তখন রামেশ্বর সেখানে অধ্যাপক। স্থির করলেন, এবার কলকাতায় গিয়ে ধ'রে পড়বেন মেয়েটাকে পার করার জন্য।

চেনা মেস্-এর একতলার সবচেয়ে শস্তা ঘরটিতে একটা 'সীট' ভাড়া নিলেন মাসিক সাড়ে-চার টাকায়। আহার সেরে নেন 'পাইস হোটেলে' (এ-ব্যাপারটা তিনি আগের বারে আবিষ্কার করেছিলেন); সেখানে চার পয়সায়

ভাত-ডাল-তরকারির পরিমাণ এতটা পাওয়া যায় যে একবেলার বেশি খেতেই হয় না। দিন কাটে ইম্পীরিয়ল লাইব্রেরিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে, পুরোনো বইয়ের দোকানে ঘুরে-ঘুরে, নামজাদা অধ্যাপকদের দর্শনের প্রার্থনায়। এই একটা নতুন প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে : কোনো নির্দেশ, পরামর্শ, আলোচনার। বালি-কাগজের খাতা ক'টি সঙ্গেই এনেছেন। যদি কোনো উপকারী মন্তব্য করেন কেউ। দেখা পাওয়া সহজ হয় না ; কেউ দার্জিলিং গেছেন, কারো বা সময় নেই। মাত্র দু-জনের সঙ্গে দেখা হ'লো : দু-জনেই বালি-কাগজের খাতাগুলোকে ঈষৎ সভয়ে স্পর্শ ক'রে নেড়ে-চেড়ে বললেন, 'তা বেশ, বেশ হচ্ছে, শেষ করুন।' কিছু বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হবে কিনা, জিগেস ক'রে জানলেন যে উভয়েই বি. এ. পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক-রূপে নিযুক্ত আছেন, উপস্থিত তাঁদের মৃত্যুরও অবকাশ নেই।

একদিন কলেজ স্কোয়ারের এক বইয়ের দোকানে একটি যুবকের কথায় তাঁর কান গেলো। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বই খুঁজছিলো যুবকটি ; দুটো-তিনটে নাড়াচাড়া করার পর যে-শব্দটা নির্গত করলে সেটা স্পষ্টত বিবমিষায় ভারাক্রান্ত।—'মরা ! সব মরা ! বাসি হ'য়ে প'চে-গ'লে পোকায় কিলবিল করছে, আর তাই খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে প্রোফেসরের পাল। জ্যান্ত সাহিত্য দেখলে আঁৎকে ফিট হ'য়ে প'ড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বৃথাই জন্মালেন !' ব'লে স্যাণ্ডেল ফটফট করতে-করতে যুবকটি বেরিয়ে গেলো।

দোকানের লোকটি মুচকি হেসে বললে, 'সুব্রত সেনের লেখা যেমন, কথাও তেমনি।'

'কে ইনি ?' গুরুদাস এগিয়ে এলেন। 'কী নাম বললেন ?'

'সুব্রত সেন। এঁর লেখা পড়েননি ? খুব জোরালো।'

মেস্-এ ফিরে এক ঘটি কলের জল খেয়ে শুয়ে পড়েন রোজ—ক্লান্তির চাপে তখনই চ'লে যান খিদের বাইরে, গরমের বাইরে, দুর্গন্ধের বাইরে। কিন্তু সে-রাতে তাঁর সহজে ঘুম এলো না। যুবকটির কথা ফিরে-ফিরে কানে বাজতে লাগলো। আর তুমি—গুরুদাস ভটচায্যি, বাংলা ভাষার অভিধান-রচনায় নিযুক্ত আছো—কী জানো তুমি বাংলা সাহিত্যের, বলো তো ? বঙ্কিম, ঈশ্বর গুপ্ত, কিছু মাইকেল—ওখানেই শেষ। রবীন্দ্রনাথের নাম করলে যুবকটি—কেউ-কেউ বলে তিনি বাংলা ভাষার জন্মান্তর ঘটিয়েছেন, তুমি তাঁকেও জানো না, কিছুই পড়োনি। আর এই নতুন লেখকরা—এই সুব্রত সেনকেই ধরা

যাক—যুগে-যুগে নতুন হয় ব'লেই ভাষা বেঁচে থাকে, সে-শক্তি হারিয়ে ফেললেই ম'রে যায়। আর অভিধান যদি সেই বিবর্তনের ছবি দিতে না পারে, তাহ'লে অভিধানের অর্থ কী ?

সারা ব্যাপারটাকে আবার নতুনভাবে ভাবতে হ'লো। ছাত্রদের 'মানে-বই' নয়, তালিকা নয়, ভাণ্ডার নয়, অচল অনড় দুর্বহ কোনো পদার্থ নয়, অভিধান। তারও আসল কথাটা স্রোত, গতি, ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশ, ভাষায় যে-সৃষ্টিকর্ম লেখকরা অনবরত ক'রে যাচ্ছেন, তা-ই থেকে আহরণ ক'রে তাকেই আবার এগিয়ে দিতে হবে। ভরা থাকবে আভাসে, ইঙ্গিতে, পরামর্শে, এমনকি কল্পনায়—ঝর্না যেমন চলতে-চলতে আলো লেগে ঝলকে ওঠে। সাহিত্য পড়া চাই, জীবিত সাহিত্য, বর্তমান, পরিবর্তমান সাহিত্য—বাংলা ভাষায় যা-কিছু লেখা হচ্ছে, পড়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে, শোনা হচ্ছে—সবই তাঁর উপাদান।

নতুন আলো নিয়ে ফিরে এলেন। বাড়িতে পা দেবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে হরিমোহিনী জিগেস করলেন, 'রামেশ্বর বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা করেছিলে ?'

'করেছিলাম।'

'কী হ'লো ?'

'বলছি।' গুরুদাস মাদুরে ব'সে দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিলেন। 'অনেক দাবি-দাওয়া ওঁদের। অবস্থা ভালো তো।'

'তা তোমার মেয়ের মুখ দেখে কে আর নেবে তাকে।'

'এক হাজার টাকা নগদ। পঁচিশ ভরি সোনা। খরচপত্র সব। অবশ্য মেয়ে দেখে যদি পছন্দ হয়। কিন্তু—এত কি পারবো আমরা ? বরং চারদিকে আরো খোঁজ-খবর নিয়ে—'

হরিমোহিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে গেলেন। সন্ধ্যা নামলো।

এবার কলকাতা থেকে এক রীম ফুলস্কেপ নিয়ে এসেছেন গুরুদাস—কলকাতায় শস্তা, আর রীম কিনলে পাইকেরি দরে পাওয়া যায়। আগের খাতাগুলো ফুরিয়ে এলো। অনেক নোট নিতে হয়—কাটাকুটি, অদল-বদল, নতুন তথ্য দিনে-দিনে জ'মে উঠছে—এদিকে 'অ' অক্ষর এখনো শেষ হ'লো না।

শান্তভাবে কাজে লাগলেন। তার মধ্যে পড়ার অংশ অনেকটা। এত বয়স অবধি খবর-কাগজটাকে এড়িয়েই চলেছেন ; কিন্তু সন্ধেবেলা পাব্লিক

লাইব্রেরিতে রোজ দু-খানা বাংলা দৈনিকেও চোখ বোলাতে হয়, আর বাংলা বই যেখানে যা পান কিছুই বাদ দেন না। দৈবাৎ 'ঘরে-বাইরে' প'ড়ে অবাক হ'য়ে গেলেন: বাংলা ভাষা এ-রকমও হয়? এ তো হুতোম প্যাঁচা নয়, কালিদাস। কালিদাসও নয়, অন্য কিছু।

খাতা-পেন্সিল পকেটেই থাকে। রাশি-রাশি নোট নেন। তার বেশির ভাগই কাজে লাগবে না, কিন্তু কখন কোনটা লেগে যাবে ঠিক মুহূর্তটির আগে কি কেউ বলতে পারে?

বাঙালি জাতি কেমন ক'রে আত্মপ্রকাশ করে, এটাই তাঁর আবিষ্কারের বিষয় হয়ে উঠলো। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে যখন কথা বলে, খুব মন দিয়ে শোনেন; এত বেশি মন দেন যে প্রসঙ্গটা অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারেন না, জবাব দিতে ভুলে যান। কী বলছে তা নয়, জানতে চান কেমন ক'রে বলছে। স্কুলে টিফিনের সময় নিচু ক্লাশের ছেলেরা যখন হল্লা করে, অলক্ষিতে তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ান। বাজারে গিয়ে কান পাতেন গেঁয়ো লোকের বুলিতে। মুসলমান চাষিদের সঙ্গে অকারণে অনেক আলাপ করেন ছুটি-ছাটায় যখন দেশে যান। তাদের আবার বিশেষ একটি ভঙ্গি আছে।

আর প্রত্যেক বড়ো ছুটিতে কলকাতায় যেতেই হয়। গ্রীক অক্ষর চিনে নিতে হ'লো, সেণ্ট জেভিয়ার্স-এর ফাদারকে ধ'রে লাটিন ব্যাকরণের সূত্রগুলি বুঝে নিলেন, আরবি-ফারসির জন্য মাদ্রাসায় ধন্না দিতে হ'লো। মফস্বলে বাংলা বই-ই বা কী পাওয়া যায়—তার জন্যেও কলকাতাই জায়গা।

কেমন ক'রে পারেন এ-সব? শস্তা মেস্, পাইস-হোটেল: তবু? গুরুদাস ব্যবস্থা করতে ভোলেননি; আরো দু-বিঘে জমি খসিয়েছেন—এবার স্ত্রীকে না-ব'লে। কলকাতায় কাউকে বড়ো একটা চেনেন না তিনি, ইংরেজি বলতে হ'লে বিপন্ন বোধ করেন, মলিন বস্ত্র সম্ভ্রমের উদ্রেক করে না। খুঁজে-খুঁজে সব বের করতে হ'লো—সেই একমাত্র সনাতন চেষ্টা দ্বারা, যে-মূলধনটুকু ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই দিয়ে থাকেন। চেষ্টা, অপেক্ষা, ধৈর্য, অধ্যবসায়। এক ঘণ্টার কাজে চার ঘণ্টা লেগে যায় তাঁর—অন্ধকার ঠেলে-ঠেলে সারি-সারি জোনাকি জ্বেলে চলেছেন।

কিন্তু মোড়ে-মোড়েই আলো পাওয়া যায়; অন্ধকারে রেলগাড়ির জন্য সিগনেলের মতো আলো।

আবার গ্রীষ্মের ছুটি, আবার বর্ষা। বর্ষা বড়ো প্রবল হ'য়ে নামলো সেবার।

রান্নাঘরের মাটির মেঝে ফুঁড়ে কেঁচো উঠলো শ্রাবণ মাসে। উঠোনে জোঁক। মাঝে-মাঝে সাপ। টিনের চালের ফাঁক দিয়ে দরদর ধারে জল পড়ে কোনো রাত্রে—ছেলেমেয়ে দুটোকে শুকনোতে রেখে মা বাবা জেগে ব'সে থাকেন। এমনি একবার সাতদিন ধ'রে প্রায় অবিরাম বৃষ্টির পর গুরুদাস একদিন সিন্দুক খুলে চমকে উঠলেন। যেখানে কয়েকখানা ভালো-ভালো বই রাখা ছিলো সেখানে কিলবিল করছে লক্ষ-লক্ষ উইপোকা। সুনীতি চাটুয্যের পঞ্চাশ পৃষ্ঠা নেই, মহাভারতের তৃতীয় খণ্ডটাকে পাতায়-পাতায় ফেঁড়ে দিয়েছে, বাবার আমলের সংস্কৃত অভিধানটা হাতে তোলামাত্র ঝুরঝুর ক'রে খ'সে পড়লো। উইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বেলা কেটে গেলো—চার আনার কেরোসিন ঢাললেন।

এই দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই একটি সুখের সম্ভাবনা দেখা দিলো; এতদিনে শিবানীর বুঝি বিয়ে হয়। পাত্রের দেশ বরিশালে, এই খুলনাতেই স্টিমার-ঘাটে নতুন মালবাবু হ'য়ে এসেছে। পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখে পছন্দ করলেন, কোনো দাবিদাওয়াও উত্থাপন করলেন না। শুধু বিয়ের খরচ, শাঁখা-সিঁদুর। তা ভাবনা কী—হরিমোহিনীর এখনো কিছু গয়না আছে।

অঘ্রানের আগে বিয়ে হবে না, কিন্তু খবর পেয়েই আনন্দে অধীর হ'লো ভবানী। বহুদিন পরে মা-র কাছে আসতে পারবে একবার। মাদারিপুরে শ্বশুর-শাশুড়ি পরিবেষ্টিত মস্ত সংসার তার—পুজোর সময়ও আসতে পায় না।

বর্ষার শেষে শিবানীর জ্বর হ'লো। সাতদিনেও যখন জ্বর ছাড়লো না, গুরুদাস কবিরাজ ডাকলেন। লাল আর কালো বড়ি অনেক খাওয়ানো হ'লো —জ্বর ছাড়ে না।

একুশ দিনের দিন সরকারি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন প্রতুল ডাক্তার এলেন। চার টাকা তাঁর ফী, বুট পায়ে মশমশ ক'রে চলেন। দেখে বললেন, টাইফয়েড। গ্লুকোজ ছাড়া কিছু খাবে না। আর জল। দু-বেলা মাথা ধুইয়ে দেবেন। আর এই সব ওষুধ লিখে দিচ্ছি। চার ঘণ্টা পর-পর টেম্পারেচার লিখে রাখবেন। খবর দেবেন তিন দিন পরে।

ওষুধপত্র ধারে আসতে লাগলো; সপ্তাহে একদিন ডাক্তার আসেন, সেই ফী জোগাতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। বাড়িতে দুধ, মাছ বন্ধ হ'লো; হরিমোহিনীর লক্ষ্মী ঠাকরুন রোজ চারখানার বদলে একখানা ক'রে বাতাসা পান।

শিবানী রোগা হ'য়ে গেলো, মুখের মাংস ঝ'রে গেলো তার, বিবর্ণ দাঁতগুলো ক্রমশ বড়ো-বড়ো আর কুৎসিত হ'য়ে উঠলো। তারপর এমন দিন এলো যেদিন ডাক্তারের আদেশে কেটে ফেলতে হ'লো তার মাথার চুল। জল চাই মাথায়, যত পারেন জল। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় মাথা ধোয়ান হরিমোহিনী, কিন্তু মেয়ে শুধু প্রলাপ বকে।

যখন মারা গেলো, তখন তার হাত-পাগুলো কাঠির মতো হ'য়ে গেছে, বুকটা যেন সাত বছরের ছেলের মতো। আর এই মেয়েরই ষোলো বছর বয়স ছিলো, স্বাস্থ্য ছিলো, লাবণ্য ছিলো। সেই বিয়ের জন্য তুলে-রাখা গয়না বেচেই ডাক্তারখানার দেনা শোধ হ'লো পরে।

দাহ শেষ ক'রে রাত দশটায় ঘরে ফিরলেন গুরুদাস। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তখন, শীত পড়ি-পড়ি করছে। শীত একটু বেশি মনে হ'লো গুরুদাসের, গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে লুটিয়ে-পড়া স্ত্রীর পাশে বসলেন। ব'সে-ব'সেই রাত কেটে গেলো।

দীর্ঘ রাত, কিন্তু ভোর হ'লো। হরিমোহিনী এতক্ষণে ঘুমিয়েছেন, নবুটা ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে আছে। গায়ের চাদরখানা বিছিয়ে দিলেন ছেলের গায়ে, হরিমোহিনীর মাথার নিচে আস্তে বালিশ দিলেন। তারপর দাওয়ায় এসে মাদুর পেতে খাতা খুলে বসলেন। এই শেষ খাতাটিও শিবানীর হাতের তৈরি। সব অক্ষর ঝাপসা হ'য়ে গেলো মুহূর্তের জন্য। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে সেই অক্ষরের পাশেই অন্য অক্ষর বসালেন।

আরো পাঁচ বছর কেটে গেলো, অভিধান সাত বছরে পড়লো; 'ঠ' পর্যন্ত লেখা হয়েছে।

এখন আর তরতর করে লেখা হয় না। প্রথমে যা ছিলো একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চময় মুখ, এখন তা হ'য়ে উঠেছে কাজ। কাজ, কর্তব্য, দায়িত্ব, বাধ্যতা। আবিষ্কারের উন্মাদনা আর নেই, সংগ্রহের উত্তেজনা ফুরিয়ে এলো। বিপুল উপাদান এখন হাতের কাছে তৈরি, সব পথ চেনা হ'য়ে গেছে। এখন কাজ, শুধু কাজ। দৈনিক কাজ, সাপ্তাহিক কাজ, মাসিক, বাৎসরিক, অবিরাম। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়, অবিরাম। ভালো লাগা নেই, মন্দ লাগা নেই, ইচ্ছা নেই, অনিচ্ছাও নেই: এই এক নিরঞ্জন জগৎ, যেখানে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি ম'রে যায়।

সে-বছর জগত্তারিণী স্কুলের বহুকালের একটি চেষ্টা সফল হ'লো: সরকার

সাহায্য মঞ্জুর করলেন। শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি হ'লো; গুরুদাসের মাসিক আয় এক লাফে পঞ্চান্ন টাকায় পৌঁছলো—কালক্রমে নাকি সত্তর-পঁচাত্তর পর্যন্ত হ'তে পারে। আর সেইবারেই নবেন্দু অর্থাৎ নবু, বেরিয়ে এলো ম্যাট্রিকের বেড়া ডিঙিয়ে। শুধু বেরিয়ে এলো তা নয়, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই চাকরিও জুটে গেলো তার। সেই রেলেরই চাকরি, মা যা আশা করেছিলেন।

এর কয়েক মাস পরেই একটি মর্মান্তিক খবর পাওয়া গেলো: ভবানী বিধবা হয়েছে। আর তার দু-মাসের মধ্যেই চব্বিশ বছরের ভবানী খাটো চুলে থান-ধুতি প'রে তিনটি ছেলেমেয়ের হাত ধ'রে বাপের উঠোনে এসে দাঁড়ালো। যে-বৌকে ছাড়া শ্বশুরবাড়ির এক দণ্ড চলতো না, এখন তার ভার বইতে নারাজ তাঁরা। অবস্থাও প'ড়ে এসেছে, ভাসুর-দেওরের বিস্তর ছেলেপুলে, উনিও তো কিছু রেখে যেতে পারেননি, বাবা।

বাপ বললেন, 'ভাবিসনে। নবুর চাকরি হয়েছে; আমি দেখবো তোদের।'

সেবারে গ্রীষ্মের ছুটিতে গুরুদাস কলকাতায় এলেন। মাঝে দু-বছর আসেননি; কিন্তু আর ফেলে রাখা যায় না, ছাপাবার চেষ্টা করতে হয়।

ক্যাম্বিসের জুতো, ধূসর একটা ছাতা, হাতে টিনের তোরঙ্গ-ভরা পাণ্ডুলিপি, গোলদিঘি থেকে হেদো পর্যন্ত জ্যৈষ্ঠের রোদে দুই দিকের ফুটপাত চ'ষে ফেললেন। অবশেষে সুকিয়া স্ট্রীটের গলির মধ্যে ভারত প্রেসের সন্ধান পাওয়া গেলো। এঁরা সংস্কৃত, বাংলা পুরোনো বই ছাপেন, অভিধানের দিকে ঝোঁক আছে। কিন্তু স্বত্বাধিকারী বিপিনবাবু বললেন, 'আপনার অভিধান কেমন হয়েছে, আমরা তো বুঝবো না। তেমন কারো সুপারিশ আনতে পারেন তো ভেবে দেখবো।'

'যেমন? কার···?' 'সুপারিশ' কথাটা মুখে আনতে লজ্জা করলো।

বিপিনবাবু তিন-চারটে নাম করলেন। তার মধ্যে প্রথমটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের।

তাঁরই ভবনে গুরুদাস উপস্থিত হলেন পরের দিন। ছোটো একটা ঘরে দশ-বারো জন অপেক্ষা করছে। বেলা বাড়লো, সামনের খোলা চত্বর প্রত্যাশীর ভিড়ে ভ'রে উঠলো। ধুতি-চাদর, সাহেবি স্যুট, মান্দ্রাজি, পাঞ্জাবি, গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী। কেউ পাইচারি করছে, কেউ রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ কাটা দরজার উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে ঝপ ক'রে গলাটা নামিয়ে নিচ্ছে। ছোকরা, বৃদ্ধ, মহিলা, বেচারা আর ভারিক্কি গোছের চেহারা, কিন্তু সব মুখই একই রকম

যাচনার দ্বারা পীড়িত। টাইপরাইটারের খটাখট, টেলিফোনের ক্রিংক্রিং, চাপরাশি কেরানির ছুটোছুটি—এই ভিড়ের মধ্যে কে কখন ঢুকে যাচ্ছে, দেখা ক'রে বেরিয়ে আসছে, কে-ই বা প'ড়ে থাকছে নিরাশ হয়ে—কিছুই বোঝা যায় না। সাতটা থেকে এগারোটা বাজলো—আজ আর দেখা হবে না।

ফেরার পথে ট্র্যাম থেকে নামতে গিয়ে প'ড়ে গেলেন, আঘাত লাগলো। ছ'ড়ে-যাওয়া কয়েকটা জায়গায় টিঞ্চার আওডিন ঘ'ষে দিয়ে মেসের তক্তায় প'ড়ে রইলেন সারাদিন। সকালে উঠে কোমরে বেশ ব্যথা। তবু তোরঙ্গটি হাতে নিয়ে আবার সেকেণ্ড ক্লাশ ট্র্যামে উঠে বসলেন।

সেদিনও কিছু হ'লো না ; চার ঘণ্টা ব'সে-দাঁড়িয়ে কেটে গেলো। এমনি পর-পর চারদিন।

পঞ্চম দিনে আরো অনেক সকালে গেলেন, অন্য কারো আগে পৌঁছতে পারেন যদি। গিয়ে ত্যাখেন দুটি মাত্র লোক ব'সে আছে। চত্বর পার হ'তে-হ'তে ফতুয়া গায়ে সৌম্য চেহারার একটি ভদ্রলোক হঠাৎ তাঁকে দেখে থামলেন।

'ব্যাপার কী? আজ আবার?'

আজ্ঞে আবার আসতে হ'লো, কেননা—'

'দেখা হয়নি এখনো? ক-দিন ধ'রে রোজই যেন আপনাকে দেখছি। তা কী দরকার?'

'আমি একখানা বাংলা অভিধান রচনা করছি। সেই সম্পর্কে কিছু—'

'ও, অভিধান? বাংলা অভিধান?' ভদ্রলোকটি গুরুদাসকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন একবার, টিনের তোরঙ্গটাকেও বাদ দিলেন না। 'একেবারে লেখাটা ব'য়েই এনেছেন সঙ্গে ক'রে?'

'মানে—উনি যদি দেখতে চান—অর্থাৎ, সময় হয় যদি।'

'আচ্ছা, বসুন। উনি নামলেই চ'লে যাবেন। সোজা চ'লে যাবেন এই দরজা দিয়ে—কোনো ভয় নেই।'

সত্যি দেখা হ'লো সেদিন, এবং এক টুকরো স্বাক্ষরিত কাগজ পাওয়া গেলো : 'এই পুস্তক আমি প্রকাশের জন্য অনুমোদন করিতেছি।'

ছোটো-ছোটো খণ্ডে পাঁচশো ক'রে কপি ছাপা হবে, এক টাকা ক'রে দাম। বাঁধাই হবে না। খরচ উঠে গিয়ে যা থাকবে তার অর্ধেক গ্রন্থকারের, কিন্তু এক বছরের মধ্যে খরচ না-উঠলে গ্রন্থকার প্রকাশককে খেসারৎ দেবেন।

এই চুক্তি হ'লো। অ থেকে দীর্ঘ ঈ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি রেখে দিলেন বিপিনবাবু, খুলনায় ফেরার সাতদিনের মধ্যে গুরুদাস প্রুফ পেলেন।

এক বছরের মধ্যে ছয় খণ্ড ছাপা হ'লো; স্বরবর্ণ শেষ। কিন্তু পরের গ্রীষ্মে বিপিনবাবু কিছু গম্ভীরভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। বই কিছুই বিক্রি হয়নি। সব প'ড়ে আছে, ঐ দেখুন। দশ টাকায় পুরো অভিধান পাওয়া যায়, ছ-টাকায় শুধু স্বরবর্ণ কিনবে কে। আর অত খুঁটিনাটি নিয়ে কারই বা কী মাথাব্যথা। খরচ ওঠেনি মশাই, কিন্তু খেসারৎ আপনি দিতে পারবেন না জানি। এটুকু লোকশান আমার সইবে, কিন্তু এর পরে ছাপতে চান তো আপনাকে অর্ধেক খরচ দিতে হবে। যদি বিক্রি হয়—আমার খরচ আগে তুলে নেবো, তার উপর তিরিশ পার্সেণ্ট কমিশন। বাকি সব আপনার।'

'অর্ধেক খরচ? কত পড়বে?'

'এক-এক খণ্ড ছাপার খরচ ছু-শো থেকে আড়াইশো। বিল পাবেন।'

সেবার আরো ছয় খণ্ড নাগাদ পাণ্ডুলিপি রেখে এলেন গুরুদাস। এক-এক খণ্ড ছাপা হয়, আর এক-এক বিঘে জমি বেচেন। তারপর ভদ্রাসনটুকু ছাড়া কিছুই রইলো না, তারপর তাও গেলো।

ততদিনে আরো দশ বছর কেটে গেছে: 'ব' অক্ষরও প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন গুরুদাস; দন্ত্য 'ন' পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর চুলের রং ধূসর হয়েছে, চোখে উঠেছে পুরু কাচের, নিকেল-ফ্রেমের চশমা—কিন্তু চশমা সত্ত্বেও রাত্রে লণ্ঠনের আলোয় ঝাপসা লাগে। হরিমোহিনীকে বাতে ধরেছে, কাজকর্ম তেমন আর পারেন না, সারা সংসারটিকে আগলে আছে কৃশ দেহে ক্লান্তিহীন ভবানী। বাপের প্রতি বিশেষ একটু মনোযোগ তার; একটু দুধ, একটু ফল—যখন যা পারে এগিয়ে দেয় হাতের কাছে, মিছরির জল ক'রে দেয়, কোনোদিন বা বেলপানা, অবসর হ'লে বাপের অভিধানের পাতা ওল্টায়। যৌবনের প্রথম সন্তান এই কন্যাকে গুরুদাস একটু সংস্কৃত আর বাংলা শিখিয়েছিলেন; ষত্ব-ণত্ব জ্ঞান আছে তার, প্রুফ দেখার কাজেও আস্তে-আস্তে সে তৈরি হ'য়ে উঠেছে। কখনো-কখনো এমন সময় আসে—হয়তো কোনো ছুটির দিনের সকালে—যখন গুরুদাস দাওয়ায় ব'সে-ব'সে লেখেন আর ভবানী ব'সে থাকে তাঁর কাছে, এটা-ওটার পাতা ওল্টায়, কিছু বলে না—কোনো কথা হয় না—কিন্তু ভালো লাগে, দু-জনেরই ভালো লাগে।

নবেন্দু আজকাল পঁচাত্তর টাকা মাইনে পায়; তাকে থাকতে হয় কলকাতায়,

শেয়ালদা থেকে যে-সব গাড়ি ছাড়ে তাতে টিকিট চেক করা তার কাজ। ঘুরে-ঘুরে দিন কাটে, কিন্তু ফাঁক পেলেই বাড়ি আসে ছুটে-ছুটে, আর বাবার হাতে ভালো টাকাই দেয়। তার ভরসা আছে ব'লেই শিবানীর তিনটি বাড়ন্ত সন্তান নিয়ে চ'লে যায়, গুরুদাসও কলকাতায় যেতে পারেন মাঝে-মাঝে, আর হরিমোহিনীও জানতে পারেন না যে দেশে তাঁদের কিছুই আর নেই, চাল ডাল সবই কিনতে হয়।

সাতাশ বছরের ছেলের বিয়ের জন্য হরিমোহিনী উঠে-প'ড়ে লাগলেন এবার। নবেন্দুর মত ছিলো না, বলেছিলো স্টেশন-মাস্টার হবার চেষ্টা করছে, তখন একটা স্থিতি হ'লেই তো বিয়ে করা ভালো। আসলে সংসারের অবস্থা ভেবেও সে এক্ষুনি ভার বাড়াতে চায়নি। কিন্তু হরিমোহিনী জোর করলেন, সেবারে বৈশাখ মাসে তার বিয়ে হ'য়ে গেলো।

নতুন লেপ-তোশক, রং-করা হাত-বাক্সে সিঁদুর, হেজেলিন স্নো আর এসেন্সের গন্ধ নিয়ে নতুন বৌ আনন্দের হাওয়া আনলো বাড়িতে। পনেরো বছরের ঢলঢলে মেয়ে। সেই সঙ্গে একটু বেদনাও এড়ানো গেলো না; শিবানীকে মনে প'ড়ে গেলো, হরিমোহিনী আড়ালে চোখ মুছলেন।

বিয়ের ন-মাস পরে নবেন্দু চলতি ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা ফসকে প'ড়ে গেলো। পড়লো একেবারে লাইনের মধ্যে। যখন টেনে তুললো তার থেঁৎলানো দেহে তখনো প্রাণ ধুকধুক করছে। কিন্তু হাসপাতাল অবধি পৌঁছনো গেলো না।

তার বৌয়ের তখন সাত মাস চলছে। খবর পেয়ে ফিট হ'লো তার; চার ঘণ্টা পরে একটি মৃত, অপরিণত সন্তান প্রসব করলে। সে নিজেও আর উঠতে পারলো না বিছানা ছেড়ে; আস্তে-আস্তে স্থতিকায় ধরলো তাকে, ছ-মাস ভুগে-ভুগে এক টুকরো পাৎলা ছায়ার মতো ছায়ালোকে মিলিয়ে গেলো।

নবেন্দুর প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের দেড় হাজার টাকা, 'ক্ষতিপূরণ' বাবদ আরো দু-হাজার টাকা রেল-কোম্পানির আপিশ থেকে গুরুদাসের নামে পৌঁছলো। আর তার কয়েক মাস পরেই, পুজোর মুখে, খবর পাওয়া গেলো ইংলণ্ড আর জর্মনিতে লড়াই বেধেছে।

'পঞ্চমবাহিনী' থেকে 'অণুবিদারণ' পর্যন্ত—যুদ্ধের ছ-বছরে অনেক নতুন শব্দ সংগ্রহ হ'লো গুরুদাসের। এইগুলো পরিশিষ্টে দিতে হবে। কিন্তু এ-ক'বছরে কাজ তেমন বেশি দূর অগ্রসর হ'লো না; মাত্র 'ল' পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন

ছাপাও 'ফ'-এর পরে আর এগোলো না ; ছাপার দাম চার গুণ, কাগজ পাওয়া যায় না ;—কিছুই হবার উপায় নেই। এদিকে এতকাল ধ'রে যে-বাড়ির ভাড়া দিচ্ছিলেন মাসিক সাড়ে-সাত টাকা, তার জন্য বাড়িওলা হঠাৎ সতেরো টাকা দাবি ক'রে বসলো, চালের মন চার টাকা থেকে লাফাতে-লাফাতে চল্লিশে পৌঁছলো, কেরোসিনের দামের জন্য লণ্ঠন জ্বালার উপায় রইলো না। তাছাড়া তাঁর চোখ নিয়েও কষ্ট পেতে লাগলেন। ডাক্তার বললেন, একটা চোখে ছানি পড়ছে, অপারেশন না-করালে সারবে না। তার জন্য কলকাতায় যাওয়া দরকার ; শ' দেড়েক টাকা খরচ। প্রস্তাবটা শোনামাত্র উড়িয়ে দিলেন মন থেকে, অন্তত একবেলা খেয়ে বেঁচে থাকাটা অনেক বেশি দরকারি।

নবেন্দুর সাড়ে-তিন হাজার টাকা ছিলো ব'লেই টিকে থাকতে পারলেন। ও থেকেই ভবানীর মেয়েটার বিয়ে দিলেন, শ' পাঁচেক গেলো তাতে। বাকিটা, এই যুদ্ধের ক-বছরে, অনেক টিপে-টিপেও রোদ-লাগা বরফের মতো গ'লে যেতে লাগলো। পুত্রবধূর অলংকারাদি তিনি তার বাবাকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধের মধ্যেই হরিমোহিনী প্রথম জানলেন যে দেশে তাঁদের মাথা গোঁজার ঠাঁইও আর নেই। কিন্তু বিচলিত হলেন না ; বিচলিত হবার শক্তিই আর ছিলো না তাঁর। ছেলে মরবার পর থেকে কেমন নিঃসাড় হ'য়ে গেছেন মানুষটা—একটু মাথা-খারাপ মতো। ভালো-মন্দ কিছুই বলেন না, খান, শুয়ে থাকেন, বাতে কষ্ট পান। দাঁত প'ড়ে গেলো, বুড়ো হ'য়ে গেলেন।

স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে ভবানী। তার দুই ছেলে, অমল আর বিমল, স্কুলে পড়ছে। বড়োজন ম্যাট্রিক পাশ ক'রে খুলনার কলেজেই ভর্তি হ'লো, সেখানে তার মাইনে লাগবে না, গুরুদাস প্রিন্সিপ্যালকে ধ'রে ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। বিমল হঠাৎ একদিন পড়া ছেড়ে দিয়ে নিজের বুদ্ধিতেই র‍্যাশনের দোকানে চাকরি নিয়ে সেখানে চুরি শিখলে। টের পেয়ে জ্বালানি কাঠ দিয়ে ষোলো বছরের ছেলেটার পিঠের চামড়া ছিঁড়ে দিলে তার মা।

যখন যুদ্ধ থামলো তখন গুরুদাসের হাতে আর কিছুই নেই। স্কুলের মাইনে আর ভাতা নিয়ে তেষট্টি টাকা পান, কিন্তু বয়স হ'য়ে গেছে ব'লে অবসর নেবার জন্য পিড়াপিড়ি করছেন স্কুলের কর্তৃপক্ষ। অনেক মিনতি ক'রে আর দু-বছর মেয়াদ পেলেন ; কিন্তু তার পর ছাড়তেই হবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে এই স্কুলের সমস্যা হঠাৎ খুব ছোটো হ'য়ে গেলো। রক্তের

স্রোত ব'য়ে গেলো ভারতে, তারপর দেশ স্বাধীন হ'লো। খুলনা পড়লো পাকিস্তানে। কিছুদিন দেখার পর গুরুদাসও চ'লে এলেন সকলকে নিয়ে।

কী ক'রে এলেন সে-কথা না-বলাই ভালো। কিছু হেঁটে, কিছু ট্রেনে, মাঝে-মাঝে নৌকোতে নদী পার হ'য়ে। জিনিশপত্র (কী-ই বা ছিলো)—সবই প'ড়ে রইলো ; নেহাৎ না-হ'লেই-নয় কাপড়-চোপড়, ছু-একটা বাসন, আর তাঁর বইয়ের বাক্স। ছাপানো বইগুলো, হাতে লেখা খাতাগুলো, আর··· আর প্রায় কিছুই না। কত কষ্টে কতকালের চেষ্টায় সংগ্রহ-করা সব বই—প্রায় সবই রেখে আসতে হ'লো।

অমন নির্ভার হ'য়েও সহজ হ'লো না যাত্রা। বয়স হয়েছে, চোখে ভালো ছাখেন না। স্ত্রী পঙ্গু। অমল-বিমলকে তাদের দিদিমাকে কোলে ক'রেও নিতে হ'লো মাঝে-মাঝে—কিন্তু একজন বয়স্ক ভারি মানুষকে নিয়ে কতটা পথ হাঁটা যায়? গাছতলায় বসতে হয়, বাতের ব্যথায় আর্তনাদ করেন হরিমোহিনী। বৃষ্টি। রোদ। ধুলো। বিষ্ঠা। মাছি। আর দলে-দলে অসহায় মানুষ। রানাঘাট স্টেশনে ভিড়ের চাপে ছুটো শিশু থেঁৎলে ম'রে গেলো।

দশ দিন লাগলো কলকাতায় পৌছতে। শেয়ালদা স্টেশনে মুড়ি খেয়ে সাতদিন কাটলো, তারপর লরি বোঝাই হ'য়ে চালান হলেন বনগাঁর ক্যাম্পে। সেখানে রোজ বেলা ছুটোর সময় চাল-ডাল-মেশানো একটা মণ্ডের মতো পদার্থ দিয়ে যায়। তা-ই খেয়ে গুরুদাস একটু সুস্থ বোধ করলেন, কিন্তু হরিমোহিনীর আর্তনাদের আর বিরাম নেই।

অবশেষে ঈশ্বর হরিমোহিনীকে দয়া করলেন। ক্যাম্পে কলেরা লাগলো, কয়েকবার ভেদ-বমি ক'রেই নাড়ি ছেড়ে এলো। মৃতদেহ নিজেরা সৎকার করা গেলো না ; সরকারি লোক এসে পাইকেরি হিশেবে কালো রঙের মোটর-গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলো।

কাঁচড়াপাড়ার কাছে রেফিউজী-কলোনিতে আস্তানা পেলেন মাস ছুই পরে। সারি-সারি বাঁশের ঘর, রান্নার একটু জায়গাও আছে। কাছে পুকুর, একটু দূরে টিউব-ওয়েল। ভবানী ওরই মধ্যে গুছিয়ে নিলে। কাছে একটা সুরকির কলে কাজ জুটলো অমলের, তাতেই চলে কোনোরকমে। বিমলটা ব'খে গেলো, সারাদিন বাইরে ঘোরে, বিড়ি ফোঁকে, সিনেমা দেখার পয়সা পায় কোথায় কেউ জানে না।

গুরুদাস আবার তাঁর খাতাপত্র বের ক'রে বসলেন। একটা চোখে সম্পূর্ণ

ছানি প'ড়ে গেছে, আর-একটা চোখও নিষ্প্রভ। সূর্যালোকের প্রতিটি মুহূর্ত এখন মহামূল্যবান তাঁর কাছে। ভোরের আলো ফোটা মাত্র ছোট্ট দাওয়ায় এসে বসেন, ভবানী তাঁর সামনে এনে রাখে গরম এক পেয়ালা চা, আর এক মুঠো মুড়ি। ভবানীকেও চা খেতে হয় তাঁর সামনে ব'সে—নয়তো বাপ ছাড়েন না। এই চা জিনিশটাকে গুরুদাস আবিষ্কার করেছিলেন যুদ্ধের শেষের দিকে—সত্যি এতে উদ্যম দেয়, আর খিদেটাকেও দমিয়ে রাখে খুব। সেই প্রথম-ফোটা আলো থেকে আরম্ভ ক'রে, সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত কাজ করেন। আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসেন, খাতাপত্র থাকে জলচৌকিতে, আশে-পাশে দু-তিনটে মাত্র বই—খুলনা থেকে যা আনতে পেরেছিলেন। যখন পিঠ খুব টনটন করে, কোমরের নিচে ওরই একটা বই রেখে মিনিট পাঁচেক শুয়ে নেন। তাতে আরাম হয়।

পরের মাসে ভবানী একটা তাকিয়া তৈরি ক'রে দিলে তাঁকে। আর সেদিনই ভারত প্রেসের বিপিনবাবুর নামে তিনি একখানা পোস্টকার্ড লিখে দিলেন।

দু-দিন পরেই চিঠির জবাব এলো। বিপিনবাবু কুশলসম্ভাষণ জানিয়েছেন, বহুকাল পরে তাঁর সংবাদ পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিধানের সম্প্রতি কিছু চাহিদা হয়েছে, আগের কয়েকটা খণ্ডের সংস্করণ প্রায় নিঃশেষ। এমতাবস্থায় পরবর্তী খণ্ডগুলো প্রকাশ হওয়া দরকার। পূর্বেকার খণ্ডগুলোর বাবদ তাঁর যা প্রাপ্য হয়েছে, সেই অর্থেই নূতন খণ্ডগুলো ছাপানো যায়, তাঁকে আর-কিছু দিতে হবে না। নূতন পাণ্ডুলিপি কবে পাওয়া যাবে, জানালে তিনি বাধিত হবেন।

আরো কয়েকটা চিঠিপত্রের পরে বিপিনবাবু তাঁকে মাসিক পনেরো টাকা ক'রে 'সাহায্য' করতেও রাজি হলেন। সেই টাকা থেকে বাঁচিয়ে আস্তে-আস্তে আবার কিছু বই আনালেন গুরুদাস। দু-বছরের মধ্যে পর-পর অনেকগুলো খণ্ড বেরিয়ে গেলো : লেখায় দন্ত্য 'স' পর্যন্ত পৌঁছলেন।

তার পরের বছর অভিধান রচনা শেষ হ'লো তাঁর, সবগুলো প্রকাশিত হ'তে আরো দু-বছর কেটে গেলো। ছাপার অক্ষরে সবগুলো পড়তে হ'লো একবার : শুদ্ধিপত্র, পরিশিষ্ট, কিছুই বাকি থাকলো না। 'বৃহৎ বঙ্গীয় অভিধান' : বাহান্ন খণ্ডে সমাপ্ত। তিরিশ বছর লাগলো। যখন আরম্ভ করেছিলেন তখন তিনি চল্লিশ বছরের যুবক। আজ তাঁর মাথার চুল ধবধবে শাদা, পিঠ বেঁকে গেছে,

গাল দুটো গহ্বরের মতো দেখায়, লোলচর্মে শিরা-উপশিরা ফুলে উঠেছে। একটা চোখ অন্ধ, আর-একটাতে অতি কষ্টে ছাখেন।

এর কয়েকদিন পরেই গুরুদাস বিছানা নিলেন। তাঁর শেষ তিলপরিমাণ উদ্যমটুকু যার জন্য সঞ্চিত রেখেছিলেন, সে-কাজ শেষ হ'য়ে গেলো, আর প্রয়োজন নেই। মনে পড়লো শিবানীকে, নবুকে, নবুর বৌটাকে। স্ত্রীকে মনে পড়লো। ভবানীকে বললেন, 'আমার কোনো শ্রাদ্ধ করিসনে, ভবানী। আমি ও-সব মানি না।'

বিছানায় শুয়েও বহুদিন ধুঁকলেন। মৃত্যু তো বললেই আসে না।

কিন্তু ইতিমধ্যে কলকাতায় তাঁর অভিধানের কথা রাষ্ট্র হ'তে লাগলো। কে একজন গুরুদাস ভট্টাচার্য—তিনি নাকি মস্ত অভিধান লিখেছেন, একটা কাজের মতো কাজ হয়েছে। মুখ থেকে মুখে ছড়ালো কথাটা : বিশ্ববিদ্যালয়ে, সাহিত্যিকদের আড্ডায়, খবর-কাগজের আপিশে। যাঁরা কিনলেন তাঁরা ভালো বললেন, যাঁরা কিনলেন না তাঁরা আরো বেশি।

শেষটায় একদিন জীপে চ'ড়ে এক ছোকরা সাংবাদিক এসে উপস্থিত হ'লো, সঙ্গে ভারত প্রেসের বিপিনবাবু। গুরুদাস বেশি কথা বললেন না—শক্তি ছিলো না তাঁর। ঈষৎ ঘোমটা টেনে গুনগুন ক'রে তাদের সব প্রশ্নের জবাব দিলে ভবানী। পরের দিনের কাগজে গুরুদাস ভট্টাচার্যের বিষয়ে এক লোম-হর্ষক গল্প বেরোলো · তাতে 'ত্যাগ', 'নিষ্ঠা', 'তপস্যা' ইত্যাদি বড়ো-বড়ো কথার ছড়াছড়ি।

এই ভাবে গুরুদাস বিখ্যাত হলেন।

স্বাধীনতার পর পঞ্চম বর্ষ চলছে তখন। সরকারি তরফ থেকে সাহিত্যের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হ'লো। কমিটিতে কেউ একজন গুরুদাসের নাম তুললেন। গুরুদাস ভট্টাচার্য? ও, সেই অভিধান? তা—তা একটা কাজ তো ক'রে উঠেছেন যা-ই হোক, অনেকগুলো পৃষ্ঠা তো লিখতে হয়েছে। আর, কষ্টে পড়েছেন শুনেছি, রেফিউজী কলোনিতে কোনোরকমে—একটা জেশ্চার হিশেবে ভালোই হয়। সামথিং টু ক্যাপচার দি পপুলার ইমাজিনেশন উইথ। 'স্বদেশী বাজার' কী-রকম জোর লিখছে, দেখছেন তো।

গুরুদাসকেই পুরস্কার দেয়া স্থির হ'লো।

সরকারি চিঠির উত্তরে ভবানী লিখলে তার পিতা এখন পীড়িত, কোনো-প্রকারেই কলকাতায় যাওয়া সম্ভব নয়।

মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁদের বয়স কিছু কম, তাঁদের একজন বললেন, 'আচ্ছা, আমরাই যাই তাঁর কাছে। ভালো দেখাবে।'

অতএব একদিন সকাল দশটায় কাঁচড়াপাড়া রেফিউজী কলোনিতে একখানা বিরাট গাড়ি এসে দাঁড়ালো। সামনে জীপ, পথ দেখিয়ে এনেছে। গাড়ি থেকে নামলেন স্বাধীন রাষ্ট্রের একজন মন্ত্রী, দু-জন উঁচুদরের রাজপুরুষ, লাল উর্দি-আঁটা জমকালো দুই চাপরাশি। জীপ থেকে সেই ছোকরা সাংবাদিক, সরকারি কেরানি, ক্যামেরা-সমেত ফোটোগ্রাফার। গাড়ি দরজা অবধি পৌঁছয় না; দু-সারি বস্তির মতো কুঁড়েঘরের মাঝখানকার সরু পথ দিয়ে, দুই দিকের বালক-বালিকা স্ত্রীলোকদের নয়ন বিস্ফারিত ক'রে দিয়ে, গুরুদাসের ঘরে এসে উঠলেন তাঁরা। ছোট্ট বেড়ার ঘর হঠাৎ ভ'রে গেলো।

বসবার জায়গা নেই; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই অনুষ্ঠানটি সারতে হ'লো। মন্ত্রী-মশাই দু-চার কথা বললেন। গুরুদাসের বিছানার উপর রাখা হ'লো গরদের জোড়, একরাশ ফুল, সিল্কের ফিতেয় বাঁধা একশো টাকার নোটে পাঁচ হাজার টাকা। ক্যামেরার খুটখুট আওয়াজ হ'লো, ফ্ল্যাশ-বাল্‌বের আকস্মিক ঝলকে গুরুদাসের ক্ষীণ চোখটা স্পন্দিত হ'লো কয়েকবার।

তিনি শুয়ে ছিলেন চিৎ হ'য়ে, অসাড় হ'য়ে, বুকে হাত রেখে। কী হচ্ছে, তা বুঝতে পারছেন কিনা মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু অভ্যাগতেরা যখন বিছানার ধার থেকে স'রে গেছেন, মুখে তাঁদের যাই-যাই ফুটে উঠেছে, শুধু কী-রকম একটা চক্ষুলজ্জার দায়ে আরো একটু দাঁড়িয়েছেন, তখন গুরুদাস ক্ষীণ স্বরে স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে বললেন, 'ভবানী, আমাকে পাশ ফিরিয়ে দে। বড়ো হাসি পাচ্ছে আমার, আমি হেসে ফেললে এঁদের অসম্মান হবে। আমাকে মুখ ফিরিয়ে দে।' ছানি-পড়া চোখটা স্থির হ'য়ে রইলো, অন্য চোখটায় কৌতুকের ঝিলিক দিলো হঠাৎ। ভবানী আস্তে-আস্তে তাঁকে পাশ ফিরিয়ে দিলে।

সেদিনই বিকেলে তিনি মারা গেলেন। সেই গরদ-জোড়ে ঢেকে, সেই ফুল দিয়ে সাজিয়ে, তাঁকে নিয়ে গেলো নাতিরা আর পাড়ার ছেলেরা।

মরবার আগে আর-একটি কথা শুধু বলেছিলেন, 'টাকাটা তুলে রাখ, ভবানী। তোর কাজে লাগবে।'

ফে রি ও লা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

. . . .

বর্ষাকালটা ফেরিওলাদের অভিশাপ।

পুলিশ জ্বালায় বারোমাস। ছ'মাসে বর্ষা হয়রানির একশেষ করে। পথে ঘুরে ঘুরে যাদের জীবিকা কুড়িয়ে বেড়ানো তাদের প্রায় পথে বসিয়ে দেয়।

না ঘুরলে পয়সা নেই ফেরিওলার। তার মানেই কোনমতে পেট চালানোও বরাদ্দ নেই।

আকাশ পরিষ্কার দেখেই জীবন বেরিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক ঘুরতে না ঘুরতে বৃষ্টি নেমে এসেছে।

পুরানো জীর্ণ বাড়িটার ঢাকা বারান্দায় আশ্রয় নিয়ে মনে মনে সে বর্ষাকে অভিশাপ দেয়।

কিন্তু দেহটা যেন সায় দিতে রাজী হয় না। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার সুযোগটাকে সাগ্রহে বরণ করতে চায়। দিন দিন যেন আরও বেশী বেশী দুর্বল মনে হচ্ছে শরীরটা।

বর্ষা বাদ সেধেছে রোজগারে, খাওয়া আরও কমে গেছে আপনা থেকে, সেইজন্য কি ?

এক কাঁধের শাড়ি-চাদর আর অন্য কাঁধের গামছাগুলির ওজন খুব বেশী নয়। ভারি হওয়ার মত বেশী মাল সে কোথায় পাবে ? এই সেদিন পর্যন্ত শুধু গামছাই ফেরি করত, কয়েক মাস যাবৎ কিছু শাড়ি আর বিছানার চাদর নিয়ে বেরোয়।

তবু এইটুকু ওজন কাঁধে নিয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুরেই যেন গায়ের জোর ফুরিয়ে আসে, হাঁটতে রীতিমত কষ্ট হয়। 'শাড়ি চাদর গামছা চাই' বলে হাঁক দিতে যেন দমে কুলোয় না, বুকে লাগে, কাসি আসে।

—শাড়ি আছে ?

পাশের দরজার একটা পাট খুলে দাঁড়িয়েছে ছ'-সাত বছরের হাফপ্যাণ্ট পরা একটি মেয়ে। কিন্তু জিজ্ঞাসাটা তার নয়। দরজার আড়াল থেকে মেয়েলি গলায় প্রশ্নটা এসেছে।

—শাড়ি আছে মা। নেবেন ?

—কই দেখি।

একদিকে মিশ্‌কালো অপরদিকে টুকটুকে লাল পাড়ওলা মিহি শাড়িটা জীবন ছোট মেয়েটির হাতে তুলে দেয়। তার সাধারণ মোটা তাঁতের শাড়ির মধ্যে এখানাই সবচেয়ে সেরা এবং সবচেয়ে দামী কাপড়। আজ প্রায় দশ-বারো দিন কাপড়টা নিয়ে ঘুরছে, বিক্রি হয়নি। দাম শুনে সবাই ফিরিয়ে দেয়। দরদস্তুর পর্যন্ত করে না।

এখানেও তাই ঘটে। দাম শোনার পর ফিরে আসে কাপড়টা।

—কম দামের নেই?

তিন-চারখানা রঙীন তাঁতের শাড়ি মেয়েটির হাতে ভিতরে যায় আসে, আসল দরদস্তুর শুরু হয় লালপাড়, ফিকে সবুজ জমির শাড়িখানা নিয়ে। জিনিসটার গুণকীর্তন করতে করতে জীবন দশ টাকা থেকে নামে, অপর পক্ষ চার টাকা থেকে অল্পে অল্পে ওঠে, রফা হয় ছ' টাকায়।

দর করতে পাকা হয়ে উঠেছে মেয়েরা। ফেরিওলাকে একেবারে অর্ধেকের চেয়ে কম দাম বলে বসতে পুরুষের সঙ্কোচ হয়, মেয়েদের একবার ভাবতেও হয় না।

একটি টাকা আর সিকি দুয়ানিতে মিলিয়ে মেয়েটি দু'টি টাকা তুলে দেয় জীবনের হাতে।

—বাকীটা দু'দিন পরে নিও।

—ধারে তো দিতে পারব না মা। সামান্য কারবার, দাম ফেলে রাখলে পোষায় না মা।

বাকীতে মাল দিতে হয় জীবনকে। দুপুরবেলা ঘরের মেয়েদের সঙ্গে বেচা-কেনা, মেয়েদের হাতে শুধু টাকা না থাকার জন্যই নয়, টাকা থাকলেও অনেক সময় কর্তাকে দিয়ে কেনাটা আগে মঞ্জুর করিয়ে নেবার জন্যও বাকীতে নেওয়া দরকার হয়। মঞ্জুর না হলে যাতে ফিরিয়ে দেওয়া চলে পরদিন।

অচেনা বাড়ি অচেনা মানুষ হলেও এটা মেনে নিতেই হয় ফেরিওলাকে। দুয়ারের কাছে বসে ঘরসংসার যেটুকু দেখা যায় দেখে আর সামনে এসে যে মানুষটা জিনিস পছন্দ করে কেনে তার বেশভূষা চালচলন থেকে ফেরিওলা আঁচ করে নিতে পারে ধারে মাল রেখে যাওয়া নিরাপদ কি না।

কিন্তু এভাবে ফেরিওলার সামনে বেরোতে লজ্জা করাটা রহস্যজনক অস্বাভাবিক ব্যাপার। ফেরিওলাকে মেয়েরা লজ্জাও করে না, ভয়ও করে না।

এ-অবস্থায় টাকা বাকী রাখা যায় না। কালপরশু এসে হয়তো শুনবে, কই,

এ-বাড়িতে কেউ তো কাপড় রাখেনি তোমার কাছে! কাকে তুমি কাপড় দিয়েছিলে, কে রেখেছে তোমার কাপড়?

ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় আবার মিনতি-মেশানো উপরোধ আসে, দু'দিন বাদে এলেই ঠিক পেয়ে যাবে।

—বাকী দিতে পারব না মা।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটে। তারপর দরজার দু'টি পাট খুলে দাঁড়ায় শ্যামবর্ণা একটি বৌ। লালপাড় ফিকে সবুজ জমির নতুন শাড়িটিই সে পরেছে।

করুণ কণ্ঠে বলে, মা বলে ডেকেছ, বাকী না রেখে গিয়ে পারবে না বাবা। গা থেকে খুলে নিতে হবে। তোমার সামনে আসতে পারিনি, তোমার কাপড়টি পরে তবে এলাম।

এ-জুলুমের প্রতিকার নেই। আধঘণ্টা পরে বৃষ্টি ধরলে জীবন বিরস মুখে পথে নেমে যায়। শহরতলির শহরে আর গেঁয়ো পথে ধীরে ধীরে হাঁটে আর মাঝে মাঝে হাঁক দেয়। শহর আর গ্রাম শহরতলিতে একাকার হয়ে যায়নি এখনো, পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে এসেছে। এখানে-ওখানে শুধু মিশে গেছে খানিকটা। শুধু একটা ইটের প্রাচীরের ব্যবধান হলেও পানাপুকুরটা খাপ খায়নি নতুন ঝকঝকে সিনেমা হলটার সঙ্গে।

কত রকমারি জিনিসের কত ফেরিওলা যে পথে নেমেছে এই শহরতলির। কিন্তু জীবন জানে তার হাঁক শুনলে, ছিটকাপড় সায়া-ব্লাউজওলার হাঁক শুনলে, সবচেয়ে বেশী উৎসুক মুখ উঁকি দেয় জানালা দিয়ে, তারাই আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশী লুব্ধ দৃষ্টি।

সন্ধ্যার আগে শ্রান্ত অবসন্ন দেহে জীবন শহরতলির সীমান্তে তার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। এলুমিনিয়ামের বাসনের ঝাঁকা মাথায় একজন এগিয়ে আসছিল তারই মত শ্রান্ত পায়ে; দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করে, শাড়ির কেমন দাম ভাই?

—তের-চোদ্দ জোড়া হবে।

—তের-চোদ্দ!

—এগার টাকার নীচে নেই।

সে নীরবে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়।

বীণা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, কি রকম হল?

—সুবিধে নয়।

প্রায় ছেঁড়া ন্যাকড়া হয়ে গেছে বীণার কাপড়টা। ঘরে সে এটাই পরে। চৈতনবাবুর বাড়ি খাটতে যাওয়ার জন্য একমাত্র সম্বল একখানি আস্ত কাপড় যে সযত্নে তুলে রাখে। আপিসে যাওয়ার জন্য ওদিকের ঘরের অঘোরের মত একটি ধুতি, একটি পাঞ্জাবি আর একটি গেঞ্জির সেটটি প্রাণপণে বাঁচিয়ে চলার মত। টেনেটুনে যতদিন চালানো যায়।

গামছা আর শাড়ি-চাদরের বোঝা নামিয়ে জীবন চৌকিতে সটান শুয়ে পড়লে বীণা ভূমিকা শুরু করে দেয়, শুনলে তো তুমি রাগ করবে, কিন্তু কি করব বল, উপায় ছিল না—এলুমিনিয়ামের একটা হাঁড়ি কিনেছি ফেরিওলার কাছে।

একটু থেমে বলে, আগের হাঁড়িটা ফুটো হয়ে গেছে ক'দিন, তোমার রকম-সকম দেখে আমি বাপু বলতে ভরসা পাইনি। ভাত তো রাঁধতে হবে, পিণ্ডি? মাটির হাঁড়িটাতে চাল রাখতাম, ক'দিন সেটাতে ফুটিয়েছি। আজ সকালে সেটাও ফেঁসে গেছে।

জীবন কিছু বলে কিনা শোনার জন্য খানিকটা থেমে আবার বলে, একটু চালাকি করে বাকীতে রেখেছি! ওইটুকু হাঁড়ি, তার দাম সাতসিকে। দরদস্তুর করে পাঁচসিকেয় রাজী করালাম। তা পাঁচসিকে পয়সাই বা দিই কোত্থেকে? বললাম, ফুটোফাটা আছে কিনা দেখে কাল দাম দেব। কিছুতে বাকীতে দেবে না। কি করি? উনুনটা ধরেনি তখনো ভাল করে। হাঁড়িটা চটপট মেজে জল আর চাল দিয়ে ধোঁয়ার মধ্যেই চাপিয়ে দিলাম। ভেতরে ডেকে এনে দেখালাম। বললাম, কি করি বল, উনুনে চাপিয়ে দিয়েছি, ধারে না দিলে উনুন থেকে নামিয়ে নিয়ে যেতে হয়। গজর গজর করতে করতে চলে গেল।

নতুন হাঁড়িতে ভাত রান্না হয়েছে। ভাতে কি একটু নতুনত্ব লাগবে? বোঁটকা গন্ধটা একটু কেটে যাবে, ঠাণ্ডা হয়ে আসতে আসতে কড়কড়ে হয়ে যাবে না?

অবসাদ কল্পনাতেও কেমন ছেলেমানুষী রঙ লাগিয়ে দেয়! বাচ্চা দুটোর সঙ্গে বসে ট্যাড়সচচ্চড়ি আর ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে জীবন ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে মুষলধারে বৃষ্টি।

শেষ রাত্রে নেমেছে। টুপটাপ জল পড়ে পড়ে ঘরের ভিতরটা অর্ধেক ভেসে গিয়েছে। ছাতটা একটু কাত হ'য়ে আছে একদিকে। কে জানে এভাবেই তৈরী হয়েছিল কিনা অথবা এটা প্রাচীনত্বের ফল। ধ্বসে পড়ুক আর যা-ই হোক, ভাগ্যে ছাতটা একটু কাত করা! এপাশে জল চুইয়ে এলেও সরাসরি ঝরে না

পড়ে ছাত বেয়ে খানিকটা গড়িয়ে গিয়ে ঝরে—তাই চৌকিটা রক্ষা পায়। রক্ষা পায় ছেঁড়া তোশক বালিশ জামাকাপড়ের সঙ্গে নতুন শাড়ি চাদর গামছা—আর বাচ্চা দুটো।

জীবন ভেবেছিল খুব ভোরে বেরিয়ে পড়বে মাল নিয়ে সরাসরি। গিয়ে বৌটির স্বামীকে পাকড়াও করে কাপড়ের বাকী দামটা আদায় করে ছাড়বে।

কিন্তু সবদিক দিয়ে শত্রুতাই যদি না করবে তবে আর বর্ষাকাল কিসের!

কে জানে সারাদিনে আজ এ-বৃষ্টি ধরবে কিনা?

বীণা গোমড়া মুখে বলে, এর মধ্যে কি করে কাজে যাই? কামাই করলে গিন্নী আবার ক্ষেপে যায়।

বীণার গায়ের রঙ শ্যাম, হাজায় হাজায় হাত আর পায়ের আঙুলগুলি সাদা হয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় হাতে পায়ে বুঝি মরণ-দশার পচন ধরেছে।

জীবন বলে, গিন্নী ক্ষেপে যান যাবেন, বর্ষা হলে মানুষ করবে কি?

চৌকিতে গুছিয়ে রাখা নতুন শাড়িগুলির দিকে চেয়ে বীণা বলে, তুমি তো বলে খালাস, গিন্নী এদিকে এবার পুজোয় কাপড় না দেবার ফিকিরে আছে। পরশু একবেলা কামাই করলাম, তাতেই শাসিয়ে দিয়েছে—কামাই করলে পুজোর কাপড় পাবে না বাছা, বলে রাখলাম।

—না দেয় না দেবে। আমরা ভিখিরি নই।

—ভিখিরি কিসের? সব ঝি পায়। সারা বছর কাজ করলেই দু'খানা কাপড় দিতে হবে।

জীবন মৃদু হেসে বলে, এ তো আগের নিয়ম গো, এবার ক'জনে পায় দেখো। নিয়ম বলে কিছু আছে দেশে? নইলে লেখাপড়া শিখে গামছা ফিরি করি, তোমায় ঝিগিরি করতে হয়?

বীণা নিশ্বাস ফেলে বলে, জানো, মাগী টের পেয়েছে তুমি আমায় অন্য বাড়ি খাটতে দেবে না। নইলে এত তেজ দেখাতে সাহস পেত না। অন্য ঝিরা কথায় কথায় কাজ ছাড়ছে, আজ এ-বাড়ি কাল ও-বাড়ি করছে।

মূক আবেদনের ভঙ্গিতে বীণা চেয়ে থাকে। কিন্তু জীবনের কাছ থেকে কোন সাড়া-শব্দ মেলে না, অন্য ঝিদের মত এ-বাড়ি ও-বাড়ি কাজ করে বেড়াবার অনুমতি সে বীণাকে দিতে পারবে না। ঘরের কাছে হারাধনবাবুর বাড়ি, বুড়ো হারাধন ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ নেই। বৌকে এখানে কাজ করতে দিতে হয়েছে তাই যথেষ্ট। তাকে পুরোপুরি ঝি বানিয়ে আর কাজ নেই।

অঘোরের আট বছরের ছেলে ভোলা এসে বলে, বাবা একটা বড় গামছা চাইল। মাসকাবারে দাম দেবে।

—ধারে দিতে পারব না।

ভোলা ফিরে যায়। আবার এসে গামছার দামটা জিজ্ঞাসা করে যায়। তারপর কোমরে ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে অঘোর নিজেই আসে।

বলে, জানো হে জীবন, বন্ধুর দোকানে চিরকাল বাকীতে গামছা কিনেছি। আজ বিপাকে পড়ে তোমার কাছে নগদ দামে কিনতে হল। গামছা পর্যন্ত চুরি যায়, অ্যাঁ? তাও একমাসের ওপর ব্যবহার করেছি?

—চুরি গেছে?

—তবে কি? কাজে যাবার একটি কাপড় সম্বল, গামছা পরে নাইতে যাই। কে মেরে দিয়েছে কে জানে! আমার গামছা ব্যবহার করে তোরও যেন গেঁটে বাত হয় বাবা! ভাবলাম, দুত্তেরি, ন্যাংটো হয়েই নাইতে যাই! তা কেমন লজ্জা করতে লাগল!

অঘোর ফোকলা মুখে হ্যা হ্যা করে হাসে।

—আপনার লুঙ্গিটা কি হল?

—সেটাও চুরিই গেছে বলতে পার। ঘরের মানুষ চুরি করেছে এই যা তফাত। লুঙ্গিটা কি জান ভায়া, ইস্তিরির লজ্জা নিবারণ করছে। ভাল একটা শাড়ি তোলা ছিল, বড্ড পাতলা, সেইটে পরতে হল—তা, বলে কিনা লজ্জা করে। তোমার লুঙ্গিটা দাও, সায়ার মত পরব। এক মেয়ে পার করেছিস, আরেক মেয়ের বিয়ের বয়স হল, তোর অত লজ্জা কিসের? ওসব পাট চুকিয়ে দিলেই হয়! তা লজ্জাবতীরা মরলেও কি তা বুঝবে?

অঘোর আবার শব্দ করে হাসে। জীবনের শাড়ি-কটার দিকে চেয়ে থেকে বলে, বাকী দিলে একটা শাড়ি নিতাম। তা, বাকী তো তুমি দেবে না ভায়া!

জীবন খানিক চুপ করে থেকে প্রশ্ন করে, আপিস থেকে ফিরে পরবেন কি?

—গিন্নী যদি লুঙ্গিটা ফেরত দেন, সেটা পরব। নইলে তোমার এই গামছা। ততক্ষণে শুকিয়ে যাবে।

অঘোর চলে গেলে বীণা শুধোয়, ঘরে বসে কত রোজগার হল?

—রোজগার কোথা হল? এক বাড়িতে থাকি, পড়তা দামেই দিতে হল।

—অ কপাল! আমি ভাবলাম ঘরে বসে বউনি হল। বিষ্টিটা আজ ধরলে হয়, আজ বেরোলে সব মাল বিকিয়ে যাবে।

জলের ফোঁটা বাঁচিয়ে উনানটা পাতা হয়েছে। পুঁইশাক কুটতে বসে নিজের গা-টা একেবারে বাঁচাতে পারেনি, টপ টপ করে বাঁ কাঁধে জল পড়ছে।

এবেলা শুধু পুঁইশাকের চচ্চড়ি। বাড়িতে ডাল নেই এক দানা। হাত একেবারে শূন্য নয় জীবনের। ক'দিনের মাল বেচার টাকা বাক্সে জমা আছে। টাকা আছে কিন্তু ডাল ও তরকারি এমনভাবে একটু বেশী কেনার উপায় নেই যাতে আকাশ ভেঙে বর্ষা নামলে একটা বেলা চলে যায়।

ওই টাকায় মাল কিনতে হবে।

টাকা আছে—খরচ করা যায় না। এ অবস্থায় এ যে কি অসহ্য সংযম মানুষের, জীবন ছাড়া কে বুঝবে!

দুপুরে বৃষ্টি থামে। মেঘ সরে গিয়ে বেরিয়ে আসে নীল আকাশ। রোদ ওঠে কড়া।

জীবন বেরোবার জন্য তৈরী হয়। বীণা বলে, ভাতের হাঁড়ির দামটা রেখে যাও। আজ দাম না পেলে গাল দিয়ে যাবে।

হাঁড়ির দামটা তার হাতে দেবার সময় জীবন ভাবে, সেও যদি বাকী টাকার জন্য গাল দিতে পারত ওই বৌটিকে!

কাঁধে পসরা চাপিয়ে সে বেরিয়ে যাবে, অঘোরকে জামা পরে ঘর থেকে বার হতে দেখে জিজ্ঞাসা করে, আপিস যাননি দাদা?

—যা বিষ্টি, কি করে যাই বল?

অঘোরের তবে ভাল আপিস, বৃষ্টির দোহাই মানে!

—কোন্ দিকে যাবেন?

—আপিসেই যাচ্ছি।

ফেরিওলাকে পাড়া বদলাতে হয় রোজ। একদিন যে পাড়াটা চষে, ক'দিন বাদ দিয়ে তবে আবার সে পাড়ায় আসতে হয়।

সকাল থেকে বৃষ্টির কৃপায় বিশ্রাম পেয়েছে, জীবন পা চালিয়ে দেয় দূরের সবচেয়ে ঘনবদ্ধ পাড়ার দিকে। ওখান থেকে বাজার খানিকটা কাছে হয়, কিন্তু সেজন্য কিছু আসে যায় না। মেয়েরা কাপড় গামছা কিনতে দোকানে যায় বটে আজকাল, এ এলাকার মেয়েরা কমই যায়।

বসতি খুব ঘন, গাদাগাদি করা মধ্যবিত্তের অনেকগুলি অন্তঃপুর।

হাঁক শুনে এক দোতলা বাড়ি থেকে জীবনকে ডেকে চার-পাঁচটি মেয়ে

বৌ কাপড় দেখছে, বাইরে আরেক জনের হাঁক শোনা যায় : ছিট কাপড়—সায়া ব্লাউজ চাই। তাকেও ডেকে আনে মেয়েরা। কাঁধে ছিটের থান আর পিঠে সায়া ব্লাউজ ফ্রকের পুঁটলি নিয়ে আপিসের কেরানী অঘোরকে ফেরি-ওলাদের দুপুরবেলার আসরে নামতে দেখে জীবন হাঁ করে চেয়ে থাকে।

অঘোর হেসে বলে, অবাক হয়ে গেছ ভায়া ? বলব'খন সব বলব'খন।

দু'জনেরই বিক্রি হয়। জীবনের লাল-কালো পাড়ের শাড়িটা কিনে নেয় মাঝবয়সী একটি বৌ, ভালই লাভ থাকে জীবনের। অঘোর বেচে দুটি ব্লাউজ, তার রকমসকম দেখে বেশ বোঝা যায়, আজকেই সে হঠাৎ ফিরি করতে নামেনি। সেও পাকা ফেরিওলা।

একসাথে পথে নেমে অঘোর বলে, ক'মাস চাকরি গেছে। চাকরি জোটে না, কি করি, ভাবলাম তোমার রাস্তাই ধরি। বসে খেলে চলবে কেন ?

—তা গোপন করেছেন কেন ? ফিরি করেন বলতে লজ্জা হয় নাকি দাদা ?

—লজ্জা না কচুপোড়া, যার পেট চলে না তার আবার লজ্জা! কি জান, মেয়েটার একটা সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে। শ্রাবণের শেষ তারিখে বিয়ে। আপিসে কাজ করি জেনে মেয়েটাকে পছন্দ করেছে, জামা ফিরি করি শুনলে যদি পিছিয়ে যায় ? এই ভয়ে ফাঁস করিনি কিছু। যাবার সময় বন্ধুর দোকানে মালপত্র রেখে যাব, ঘরে নিই না। তুমি যেন আবার পাঁচজনের কাছে ফাঁস করে দিও না ভায়া।

—জেনেও কি তা করতে পারি দাদা ?

—ভদ্দরলোক সেজে থেকেই মেয়েটাকে পার করি, তারপর দেখা যাবে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সামনে গিয়ে ছিটকাপড় সায়া ব্লাউজ হাঁকব।

দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় নেই। দু'জনেই দু'দিকে পা চালায়।

আরেকটা দিন শেষ হয়ে আসে। বর্ষাকালের আধখানা বৃষ্টিহীন দিন।

ঘরের দিকে পা বাড়ায় জীবন। শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে এলেও, একটু ঘুর-পথ ধরে খানিকটা বেশী হাঁটতে হলেও অবসন্ন শরীরে সেই বৌটির বাড়িতে একবার সে তাগিদ দিয়ে যাবে।

ওর স্বামী যদি কাজ থেকে ফিরে থাকে তবে তো কথাই নেই।

বারান্দার মাঝামাঝি বাড়ির প্রধান দরজাটা খোলাই ছিল। বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিল খালি গায়ে পাজামা-পরা একটি যুবক।

পাশের দিকের বন্ধ দরজাটা দেখিয়ে জীবন বলে, এ ঘরের বাবু আছেন ?

সে উদাসভাবে বলে, আছে বোধ হয়, ডেকে ছাখো।

কড়া নাড়তে দরজা খুলে উঁকি দেয় সেই ছোট মেয়েটি।

—তোমার বাবা ঘরে আছেন খুকী?

—বাবা তো বেরোয়নি। বাবার জ্বর।

ভেতর থেকে পুরুষের গলা শোনা যায়, কে রে রাধি?

—সেই কাপড়ওলাটা।

গায়ে একটা জীর্ণ শতরঞ্চি জড়িয়ে ভেতরের মানুষটা জীবনের সামনে এসে দাঁড়ায়। এলুমিনিয়ামের বাসনের সেই ফেরিওলাকে রক্তবর্ণ চোখ নিয়ে সামনে দাঁড়াতে দেখে নিজের পাওনা টাকাটার বদলে প্রথমেই জীবনের মনে আসে এই কথা যে লোকটার খুব জ্বর, কয়েকদিনের মধ্যে বীণার কাছে হাঁড়ির দামটা সে চাইতে যেতে পারবে না।

ফেরিওলা

দ ধী চি

আশাপূর্ণা দেবী

. . . .

ধ্বনিটা শুধু একবার উছলে উঠেই থেমে গেল না, অনেকক্ষণ ধরে তরঙ্গে তরঙ্গে ভেঙে যেন বাতাসের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ছড়াতে ছড়াতে সিঁড়িতে এসেও ধাক্কা দিল মুক্তিকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মুক্তি।

সেরেছে! মায়ের আবার এই ভরদুপুরে এত হাসির ঘটা কেন? কে এসেছে? ছোট মাসী? রাঙা মামী? বোলনদা? যাদের যাদের সঙ্গে মার এত উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসা সম্ভব, তাদের সকলের নামই এক মুহূর্তে মনের দেয়ালে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনটা দমেও গেল।

বাড়িতে অতিথি। তার মানে যে আশায় দুটো ক্লাস না করে বাড়ি চলে এল মুক্তি সে আশায় ছাই! বিশ্রাম আর হবে না! অথচ তৃষ্ণার্ত পথিকের মরুভূমি পার হওয়ার অবস্থা নিয়েই মুক্তি ইউনিভার্সিটি থেকে ওদের এই পদ্ম-পুকুরের বাড়ি পর্যন্ত ছুটে এসেছে। রাস্তাটা একবার শেষ হলে হয়। বাড়ি গিয়েই একটা সারিডন ট্যাবলেট, একটা অন্ধকার ঘর, আর একখানি নরম বিছানা।

হায়! সব ভরসাই ফর্সা।

মা যা বেহুঁশ, মুক্তিকে অসময়ে কলেজ থেকে আসতে দেখেও কিছুমাত্র চিন্তিত না হয়ে ঠিক ফট্ করে বলে বসবেন, "ওমা, মুক্তি এসে গেছিস? ভালই হ'ল। চট্ করে হীটারটা জ্বেলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিগে তাহলে। আর দেখ, খানকতক কচুরিও করে ফেল অমনি।"

মুক্তি যদি চুপি চুপি এমন প্রশ্ন করে—'চট্ করে খানকতক কচুরি করা এখন সম্ভব হয় কি করে, তার তো কিছু উপকরণের প্রয়োজন আছে', সঙ্গে সঙ্গে মা ঠিক বলবেন, 'এক কাজ কর না, ও বেলার জন্যে ডিম আনানো আছে, সেগুলো কাজে লাগা, আবার আনিয়ে নিলেই হবে।'

মোট কথা ছাড়ান নেই।

মায়ের কাছে ছাড়ান নেই। বাইরের লোকের সামনে সৌষ্ঠব বজায় রাখতে তিনি অবুঝ হবেন, বেহুঁশ হবেন, মমতাহীন হবেন, তেমন প্রয়োজন পড়লে নীচ হবেন, ছোট হবেন।

'ছোট' হয়ে বড় হবার মূল্য কি? অনেকদিন ভেবেছে মুক্তি, উত্তর পায়নি। মাকে জিগ্যেস করতে সাহস হয় না। অতিথি-অভ্যাগতের সামনে মা-র যা মূর্তি, ঘরোয়া জীবনে সে মূর্তি থাকে না। বাইরের লোক বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই এই বেহুঁশ বেহিসেবী এলোমেলো আলগা হাস্যময়ী 'তরুণীর' খোলস থেকে বেরিয়ে আসে এক রুক্ষ ক্লান্ত বিরস প্রৌঢ়া। সেখানে কথা চলে না, তর্ক চলে না। তখন শুধু দিনাতিপাতের প্রয়োজনে ছাড়া যেন কথা কইতে সাহসই হয় না।

চমকে স্তব্ধ হয়ে গেল মুক্তি।

আর-একবার হাসির হর্‌রা উঠেছে, লহরে লহরে আর গমকে গমকে। সম্মিলিত হাসি। কিন্তু হাসিটা কার? হাসির স্বরেরও পরিচয় আছে, এ স্বর মুক্তির অপরিচিত।

কে? কে? কে? কিন্তু যে-ই হোক, এমন হিম-হিম অনুভূতি আসছে কেন? ভয় আসছে কেন? সন্দেহ আসছে কেন? তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখতে দ্বিধা আসছে কেন? মুক্তি কি ভুলে গেছে তার মার বয়েস বেয়াল্লিশ পার হয়-হয়?

দৃঢ় পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল মুক্তি, আরও দৃঢ় হাতে মায়ের ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে ডাকল, "মা!"

ঘরে অবস্থিত মানুষ তিনটে যেন ভূত দেখল। হ্যাঁ, তিনটে মানুষই ছিল ঘরে। সেদিনকার সেই রগের চুলে পাকধরা অমার্জিত চেহারার লোকটা, যাকে দেখে বিরক্তি এসেছিল মুক্তির, সেই লোকটা আর মুক্তির মা মনোরমা, এবং মুক্তির ছোট বোন শুক্তি।

শুক্তি ক্লাস টেনের ছাত্রী। টুকটুকে ফুটফুটে ফুলটি। এই অসভ্য হাসির সঙ্গে তাল দিয়ে সেও খুকখুক করে হাসছে। দেখে পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে গেল মুক্তির, কারণ-কার্য বিবেচনা না করেই। বাকী দুটো মানুষকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে শুক্তিকেই আসামী বানিয়ে কঠোর স্বরে বলে উঠল, "এ সময় বাড়ি রয়েছিস যে? স্কুলে যাসনি?"

দিদিকে দেখেই শুক্তির মুখ শুকিয়ে চুন। সে শুধু মার মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল। আর অভ্যাগত ভদ্রলোক কালচে মুখ লালচে করে, সহসা পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করলেন, এবং অযথা সেটা নিয়ে ঠুকে নেড়ে কর্মব্যাপৃত হয়ে উঠলেন।

উত্তরটা দিলেন মনোরমা।

নিতান্ত হালকা আলগা স্বরে বলে উঠলেন, "স্কুলে যাবে কি, ওর যে আজ ভীষণ শরীর খারাপ! তুই কলেজে গেলি, আর ও বেচারীও—"

কোথা থেকে যে সাহস এল মুক্তির কে জানে। সে সাহস যোগাল কি ওই অমার্জিত চেহারার লোকটার অকারণ বিব্রত ভাব, না মায়ের এই বোকাটে কৈফিয়ৎ? কে জানে কে, তবু হঠাৎ যেন দুঃসাহসের জোয়ার এল মুক্তির, তাই স্পষ্ট অবজ্ঞার স্বরে মাকে বলে বসল, "যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তাকেই উত্তরটা দিতে দাও না।···বল্ শুনি, কী ভীষণ শরীর খারাপ হয়েছে তোর? জ্বর হয়েছে?"

শুক্তি অস্ফুট স্বরে যা বলে তার মর্মার্থ বোধ হয় 'খুব মাথা ধরেছিল।'

"মাথা ধরা?" ভয়ানক একটা বিদ্রূপের হাসি মুখে ফুটে ওঠে মুক্তির, তারপর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে নিজের জন্যে সংরক্ষিত সারিডন ট্যাবলেটটা বার করে এগিয়ে দিয়ে বলে, "খা, খেয়ে ও-ঘরে গিয়ে শুগে যা।"

শুক্তি আর-একবার মার মুখের দিকে তাকাবার বৃথা চেষ্টা করে আস্তে আস্তে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল। মার চোখে চোখ রাখবে কি, মনোরমা তখন চোখের ভাষা ব্যবহার করছেন সামনের ভদ্রলোকের সঙ্গে।

"আচ্ছা, তাহলে ওই কথাই রইল, আজ উঠি।" বলে ভদ্রলোক যেন

গর্বিত পদক্ষেপে উঠে দরজার কাছে এগোলেন। ক্ষণপূর্বের বিব্রত ভাব আর নেই তাঁর। থাকবেই বা কেন? স্বয়ং গৃহকর্ত্রীর চোখের আশ্বাস পেয়ে গেছেন তিনি, কাজেই তুচ্ছ একটা বালিকার ধৃষ্টতাতে কাবু হবার প্রশ্ন আর নেই। তবে নাকি—ধাষ্টামো করে পাছে কাজে খানিকটা অসুবিধে ঘটায়, সেই কারণেই তাকে বেশি উত্তপ্ত না করে পাশ কাটানো।

ওর ওই জুতোর মসমস, পদক্ষেপের গর্বিত ভঙ্গী, আরও একবার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়ে দিল মুক্তির, তবু সে কষ্টে আত্মসংবরণ করে মুখোমুখি-এসে-পড়া ভদ্রলোককে একটু পাশ দিয়ে কঠিন স্বরে বলল, "আপনি নিচের তলায় বসবার ঘরে একটু অপেক্ষা করবেন, একটু কথা আছে।"

ভদ্রলোক এবার শোধ নিলেন, গম্ভীর মুখে একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন, "কিন্তু আমার যে এখন কথা শোনবার সময় নেই মিস চক্রবর্তী। আচ্ছা নমস্কার!"

ভদ্রলোক নেমে গেলেন জুতো মসমসিয়ে, আর দুই বাঘিনী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। মিস আর মিসেস।

জুতোর মসমস মিলিয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরে বাঘিনীরা তাদের চোখের পল্লব ফেলল। তারপর মিসেস যেন খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে তিক্তকণ্ঠে বললেন, "মুক্তি, এ প্রশ্ন আমিও তোমায় করতে পারি, তুমিই বা এমন অসময়ে কলেজ থেকে পালিয়ে বাড়িতে কেন? আমার ওপর পাহারা দিতে?"

'মিস'-এর গলা থেকে ঝরে পড়ল আগুন, "খুব মিথ্যে নয়। এর আগে পর্যন্ত ওটার দরকার বোধ করিনি, এইমাত্র করছি। কে ও? এ সময় কেন এসেছে? কী মতলবে বারে বারে আসছে?"

মনোরমা প্রায় লাফিয়ে ওঠেন, "কোন্ সাহসে আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারছ তুমি? ভেবেছ কী? তুমি আমার গার্জেন? আমার বাড়িতে যে খুশি আসবে, তোমার একটি কথা বলার রাইট নেই, বুঝলে?"

"না, বুঝিনি!" মুক্তি চেঁচিয়ে ওঠে, "বাড়ি তোমার নয় মা, বাড়ি আমার বাবার। উইলে দেখো—শুধু বাস করতে পাওয়া ছাড়া তোমার আর কোন অধিকার নেই।"

ধপ করে বসে পড়লেন মনোরমা, শিথিলভাবে বললেন, "তুই—তুই আমাকে এতবড় কথাটা বলতে পারলি?"

"বলতে পারবার কথা নয় মা, তুমি বলিয়ে ছাড়লে! আমার কাছে তোমায় বলতেই হবে, ও কে? কেন এসেছিল সেদিন? কেন আজ এমন সময়, যখন একজন মহিলা একটা বাড়িতে সম্পূর্ণ একা, এবং যেটা তাঁর নির্জন বিশ্রামের সময়? কেনই বা নিচের তলায় বসবার ঘরে না বসে ওপরে শোবার ঘরে উঠে এসেছে?"

অপরাধবোধ মানুষকে গুটিয়ে আনেই। এতগুলো কথার উত্তরে মনোরমা শুধু মুখের তেজটা বজায় রেখে বলেন, "একা ছিলাম না আমি, শুক্তি ছিল।"

আবার বিদ্রূপ-হাসি! "থাকবার কথা নয় শুক্তির। তাহলে ওকে রাখাই হয়েছিল, মাথা ধরাটা পরিকল্পিত?"

"মুক্তি! তোমার এ ধরনের কথা সহ্য করব না আমি। বেশ, শুনতে চাও বলছি, হ্যাঁ, আমি শুক্তিকে ইচ্ছে করেই বাড়িতে রেখেছি, হ্যাঁ, মিথ্যে ছুতো করেছি, বেশ, কী করবে তুমি আমার? ফাঁসি দেবে?"

"নাঃ, সেটা আর তোমায় দেবার ক্ষমতা কোথায় আমার মা?" ক্ষুব্ধ বিচিত্র এক হাসি ফুটে ওঠে মুক্তির মুখে, "বরং আমার জন্যেই ও ব্যবস্থাটা করে ফেলা সহজ।"

চটি ফটফটিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় মুক্তি।

হ্যাঁ, নিজের বলতে ঘর একখানা আছে তার। শুক্তিরও আছে। কারণ বাড়িখানা চক্রবর্তী সাহেবের আমলের। অবস্থাপন্ন শৌখীন মানুষ ছিলেন তিনি, বাড়িখানি করিয়েছিলেন ছবির মতো, আর সাজিয়েছিলেন মনের মতো করে।

তা বেশিদিন আর ভোগ করতে পাননি ভদ্রলোক। বাড়ি তৈরির কিছুদিন পরেই মারা গেলেন। মারা গেছেন যখন, তখন মুক্তির বয়েস বারো। তারপর এই আট বছর ধরে চালিয়ে আসছেন মনোরমা দুটি মেয়েকে অবলম্বন করে। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য তাঁর শুধু যে মেয়ে দুটিকে মানুষ করে তোলা তা নয়, সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ঠাট বজায় রেখে চলা।

গৃহসজ্জা জীর্ণ হয়ে এসেছে, যে জিনিসটা ছিঁড়ছে, ভাঙছে, ক্ষয় হচ্ছে, সেগুলো আর হয়ে উঠছে না। তবু নিজেকে ভেঙে ছিঁড়ে ক্ষয় করেও ঠাট বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর মনোরমা। তাই নিতান্ত অবস্থাপন্নরাও আজকাল অনায়াসে যা করছে, সেটা পারছেন না তিনি। পারছেন না বাড়িতে ভাড়াটে বসাতে। অথচ সেটা পারলে দিন চলার সমস্যাটা অনেক সহজ হয়ে আসত।

নিজেদের জন্যে মাত্র দু'খানি ঘর রেখে, দোতলার অর্ধেকটা আর নিচের তলাটা সম্পূর্ণ ভাড়া দিলে কমগুলি টাকা তো ঘরে আসত না!

কিন্তু যখনই কোন হিতৈষী বন্ধু, অথবা ঘরের অভাবে ভেসে-বেড়ানো লুব্ধ আত্মীয়, মনোরমাকে এদিকে দৃষ্টি পড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, তখনি মনোরমা হেসে গড়িয়ে পড়ে ভেঙে খানখান হয়ে গিয়ে বলেছেন, "বাড়িতে ভাড়াটে! বাবারে বাবা, ভাবতেই পারিনে আমি! কী করে যে রাখে লোকে! বুঝলাম, নয় দুটো-চারটে টাকা ঘরে আসবে, কিন্তু নিজেরা গড়ের মাঠে গিয়ে থাকব নাকি? নিচের তলাটা ছেড়ে দেব? ড্রয়িংরুম, ডাইনিং রুম, স্টোর, কীচেন, এ-সমস্তই যদি অন্যলোকে কেড়ে নেয়, নিজেরা তিন-তিনটে মানুষ করব কি? না বাবা, ভাড়াটেকে বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে কীভাবে যে চালায় লোকে, আমার তো বুদ্ধির অগম্য।"

অথচ লোকেরও বুদ্ধির অগম্য কীভাবে মনোরমা ড্রয়িংরুম স্টোর কীচেন ইত্যাদি সব-কিছু ঠায় ঠিক রেখে চালিয়ে চলেছেন এখনও। নগদ টাকা কিছু ছিল অবশ্য চক্রবর্তীর, কিন্তু সে তো আর অফুরন্ত নয়? কতদিন চলতে পারে?

মুক্তিও একদিন বলেছিল, "কী করে চলছে?"

মনোরমা বিরক্ত হয়েছিলেন, "সে খোঁজ করবার সময় তোমার এখনও আসেনি, তুমি স্টুডেণ্ট, তোমাকে ভালভাবে পাশ করতে হবে মনে রেখো।"

কিন্তু সময় কি এখনও আসেনি?

নিজের ঘরে রগ টিপে শুয়ে পড়ে চিন্তা করছিল মুক্তি, সময় কি এখনও আসেনি? হঠাৎ শুক্তি এসে ঘরে ঢুকল নিঃশব্দে অপরাধীর ভঙ্গীতে।

"দিদি!"

মুক্তি সাড়া দিল না, শুধু চোখ খুলল। লাল লাল চোখ, রুক্ষ রুক্ষ দৃষ্টি।

"দিদি, এটা নাও। তোমার তো দরকার লাগবে।"

তুচ্ছ সেই ট্যাবলেটটা।

শুক্তি এত বোকা নয় যে ভাববে দিদি অকারণ ওটা সংগ্রহ করে বয়ে বেড়াচ্ছিল।

মুক্তি ওর মুখের দিকে চেয়ে একটু নরম স্বরে বলে, "তোকে যে খেয়ে ফেলতে বললাম?"

"আমার লাগবে না—" কষ্টে অশ্রুভার সংবরণ করে বলে শুক্তি, "আমার তো সত্যি মাথা ধরেনি!"

"হুঁ! তা মিথ্যে মাথাটা ধরেছিল কে? একেবারে চুলের মুঠি ধরে।"

শুক্তি নীরব।

মুক্তিও।

একটু পরে মুক্তিই ফের বলে, "লোকটা কে?"

"লোকটা—" শুক্তি ঢোক গিলে বলে, "ও একজন প্রোডিউসার।"

"প্রোডিউসার? সিনেমার?"

শুক্তি সমর্থনসূচক মাথা নাড়ে।

"বটে! তা ও কী করতে এসেছিল? মা সিনেমায় নাববেন?"

শুক্তি এত ভয়ের মধ্যেও হেসে ফেলে ফিক করে। তারপর বলে, "মা? ধ্যেৎ! ও বলছিল—ইয়ে—আমায় একটা চাকরি দেবে।"

"তোকে? তোকে চাকরি দেবে ও? সিনেমা করার চাকরি?"

শুক্তি মাথা নিচু করে। ওর এই মাথা নিচুর মধ্যেই মুক্তি উত্তর পায়।

"আর কোনদিন এসেছিল ও?"

"আসে মাঝে মাঝে, তুমি যখন থাকো না।"

"তুই থাকিস তখন?"

শুক্তি আর-একবার মাথা নিচু করে।

"কি, তুই বুঝি আজকাল স্কুলে-টুলে যাস না!"

"এই মাস থেকে!" চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে শুক্তির, "দু' মাস মাইনে দেওয়া হয়নি।"

দু' মাস মাইনে দেওয়া হয়নি! স্তব্ধ হয়ে যায় মুক্তি।

স্তব্ধ হয়ে গিয়েও বুঝি সম্পূর্ণ হয় না, পাথর হয়ে যেতে ইচ্ছে করে ওর।

কই, তার ওপর তো কোন ধাক্কা আসেনি? তার কলেজের মাইনে তো ঠিকই যোগান দিয়ে যাচ্ছেন মনোরমা।

আর জীবনযাত্রার উপকরণে?

কোথাও কোন ত্রুটি চোখে পড়েছে কোনদিন? আজও তো তারা দামী বিস্কুট ছাড়া খায় না, দামী সাবান ছাড়া মাখে না, দামী শাড়ি ছাড়া পরে না।

হঠাৎ কখন কোন্ ছিদ্র দিয়ে জল ঢুকে সংসার-তরণীখানা এমন ভরাডুবি হতে বসেছে?

উঠে বসে একবার শুক্তির ওপর চোখ বুলোল মুক্তি।

সত্যিই যেন ফুল। তাজা সুন্দর পবিত্র। একে হাত ধরে পৌছে দিতে চাইছেন মনোরমা জাহান্নমের পথে!

মনোরমার নিজের সন্তান এ! যে মনোরমা মুক্তিরও মা!

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটুক্ষণ থেকে বলল, "আমায় এতদিন বলিসনি কেন?"

"মা বারণ করেছিল।"

"হুঁ! ওই লোকটার সঙ্গে কী কথা হয়েছে?"

শুক্তি ফের মাথা নিচু করে। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, "ও বলছিল, কাল এই সময় এসে আমায় স্টুডিওতে নিয়ে যাবে, ডিরেক্টর দেখবে।"

"খবরদার!" ফেটে পড়ল মুক্তি, "কাল সকালেই তোকে নিয়ে গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাড়ি রেখে দেব।"

শুক্তি নিতান্ত ভয়ে ভয়ে বলে, "সংসার যে আর চলছে না দিদি?"

"উচ্ছন্ন যাক সংসার!" মুক্তি উঠে দাঁড়ায়,—"সংসার মানে তো তুই, আমি আর মা? এত খরচ কেন আমাদের? গরিবের মতন থাকতে পারিনে আমরা? কেন আমাদের তিনটে লোকের জন্যে ঝি চাকর রাঁধুনী তিন-তিনটে লোক? কেন আমাদের ইলেক্‌ট্রিক বিল পঞ্চাশ টাকা, ধোবার খরচ ষাট টাকা? কেন বাড়িতে লোকজন বেড়াতে এলেই তাকে আট টাকা পাউণ্ডের চা খাওয়াতে হয়? বল্, কেন আমাদের এত নবাবি? বল্, কেন আমরা বাড়ির নিচতলাটা ভাড়া দিতে পারি না? আর কী দরকার আমাদের ড্রয়িং রুমে, যদি উটকো লোক এসে শোবার ঘরেই উঠে আসতে পারে?"

বেচারা শুক্তি এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে?

"এ-সব বন্ধ করতে হবে।" বলল মুক্তি। দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকল। যে ঘরে এই একটু আগেও হাসির লহরা উঠছিল, আর এখন মৃত্যুপুরীর মতো স্তব্ধ পাষাণ হিম! সেই একইভাবে চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন মনোরমা।

মুক্তি গিয়ে বিনা ভূমিকায় বলল, "শুক্তির ঠিকমত পড়াশোনা হচ্ছে না; ওকে আমি স্কুল-বোর্ডিঙে ভর্তি করে দেব।"

শুক্তি!

স্কুল বোর্ডিং!

মুহূর্তে বুঝলেন মনোরমা, সব ফাঁস হয়ে গেছে! কে ফাঁস করল? আর কে, শুক্তি নিজেই। দিদির জেরায় অথবা তাড়নায়। উঃ, এই বড় মেয়েটা যেন মনোরমার সতীন-ঝি। কখনও মার পক্ষে নয়।

তবু একটু ভীতু-ভীতু ছিল, অনিচ্ছেতেও মনোরমার মতে চলত, হঠাৎ আজ কোথা থেকে কি হয়ে গেল! কে দিল ওকে এই দুঃসাহস? কিন্তু না, এ স্পর্ধা বাড়তে দেওয়া হবে না, তাই রুক্ষ গলায় বলে উঠলেন, "বটে! দেবে! একেবারে ঠিক, তুমিই তাহলে বাড়ির কর্তা?"

"কেন, বাড়ির কর্তা না হলে আর ছোট ভাইবোনের পড়ার ভালমন্দ দেখতে নেই?"

"থাকবে না কেন, খুব আছে, মুরোদ থাকলে আছে। বোর্ডিঙের খরচটা চালাবে কে? বলে—"

চুপ করলেন মনোরমা। মাইনে জোটে না কথাটা বলা সমীচীন কিনা ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না। কিন্তু সেই অসমীচীন কথাটা মুক্তিই উচ্চারণ করল, "হ্যাঁ, মাইনেই জোটে না তার বোর্ডিং খরচা। তাই বলছি বাড়ির নিচতলাটা ভাড়া দিয়ে দেওয়া হোক।"

হঠাৎ মনোরমা স্থৈর্য হারালেন, যে কথা মনের সাত কৌটোর এক কৌটোয় ভরে লুকিয়ে রেখেছিলেন, কোনদিন প্রকাশ হতে দেননি, রাগের মাথায় বলে বসলেন সেই কথা। "ভাড়া দেওয়া হোক! ভাড়া দেওয়া হোক! কার বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে? বাড়ি কি তোদের আছে নাকি?"

"আমাদের নেই!" মুক্তি অপলক নেত্রে খানিকক্ষণ মা-র মুখের দিকে চেয়ে বলে, "বাঁধা দিয়েছ?"

"বাঁধা? বাঁধা-ই আর আছে নাকি? বাঁধা দিয়ে সুদ দিয়েছে কে? বাড়িতে রোজগার আছে এক পয়সা? বিক্রি হয়ে গেছে। বিক্রি করে ফেলা বাড়িতে বাস করছি আমরা, বুঝলে?" মনোরমা হিংস্র হয়ে উঠেছেন, মরীয়া হয়ে উঠেছেন, তাই বলেই চলেন, "যে লোকটাকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে সে কে জানো? এই বাড়ির মালিক! ওর দয়াতেই এখানে মাথা গুঁজে পরে থাকতে পাচ্ছি আমরা। ও যদি নালিশ করে, এখুনি পুলিশের পেয়াদা এসে আমাদের রাস্তায় বার করে দেবে, বিনি ভাড়ায় মাসের পর মাস পরের বাড়িতে বাস করার খেসারতে এই জিনিসপত্র ফার্নিচার-টার্নিচার সব ক্রোক্ করে নেবে। বুঝলে? বুঝতে পারছ?"

মুক্তি এত কথার মধ্যে শুধু এইটুকুই বোঝে বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে, তাই সেই কথাটাই উচ্চারণ করে, "বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে!"

"হ্যাঁ! হ্যাঁ! নইলে কিসে সংসার চলছে? কচি খুকী নও তুমি যে বোঝ না বাঁচতে হলে টাকা লাগে!"

"কচি খুকী করে রেখেছ মা, বুঝতে দাওনি যে বাঁচতে হলে টাকা লাগে, জানতে দাওনি সে টাকা কোথা থেকে আসে। কিন্তু বাড়িটা বিক্রি করে ফেলবার আগে আমাদের কি একবার জানানও দরকার মনে করনি?"

"না, করিনি! আমিই সব ম্যানেজ করছি, আমিই সব ম্যানেজ করব। তোমাদের জানিয়ে লাভ? তুমি কি কখনও আমার দুঃখ বোঝ?"

"তোমার সৃষ্টি করা দুঃখ বোঝবার মতো জোরাল সহানুভূতি আমার নেই মা! কিন্তু তোমার ম্যানেজ করার পদ্ধতিটা কি? বাঁচবার জন্যে বাড়িটা নষ্ট করেছ, আত্মসম্মান নষ্ট করেছ, এবার বুঝি মেয়েটাকে নষ্ট করে বাঁচতে চাও?"

"আত্মসম্মান নষ্ট করেছি? মেয়ে হয়ে এই কথা বলছিস তুই আমায়?" হঠাৎ কেঁদে ফেললেন মনোরমা। বড্ড মর্মান্তিক জায়গায় ঘা দিয়েছে মুক্তি।

নষ্ট করছেন বৈকি, প্রতিনিয়তই নষ্ট করছেন, সম্ভ্রম আত্মসম্মান। ওই কদর্য লোকটাকে অবিরত প্রশ্রয় দিতে হচ্ছে তাঁকে, হাসি গল্প সমাদর আর চালশে-ধরা চোখের বিলোল কটাক্ষ ঘুষ দিয়ে দিয়ে। বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকতে পাবার আর উপায় কি? এই প্রশ্রয়ের সুযোগেই না ওই শয়তান লোকটা তাঁর কিশোরী কুমারী মেয়ের দিকে হাত বাড়াতে সাহস করেছে!

"তুমি বলাচ্ছ মা!" মুক্তি নরম গলায় বলে, "কী দরকার ছিল আমাদের এত নবাবিতে? গরিবের মতো থাকতে পারতাম না আমরা?"

"গরিবের মতো? চিরদিন মাথা উঁচু করে থেকে?" মনোরমা বিহ্বলভাবে বলেন, "আত্মীয় সমাজের চোখের সামনে সেই উঁচু মাথা হেঁট করে? জান, আজ যদি ওই লোকটাকে তাড়াই, কাল আমাদের একবস্ত্রে এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তোমার মামার বাড়ি কিংবা কাকাদের বাড়ি গিয়ে উঠতে হবে? পারবে? তোমরা পারতে পার, জেনে রেখো আমাকে তাহলে আত্মহত্যা করতে হবে।"

"কিন্তু মা, তাই বলে শুক্তিকে হত্যা করবে?" মুক্তি রুদ্ধস্বরে বলে, "তুমি কি বুঝতে পারছ না ওর পরিণাম?"

মনোরমা সমুদ্রে তৃণ ধরার মতো বলেন, "আজকাল তো কত কত ভদ্র

মেয়েরাই যাচ্ছে। একটা মেয়ে হতেই একটা সংসার তরছে, এ একটা চাকরির মতই ধর না কেন?"

"ধরা যায় না মা, ধরা যায় না। শুক্তিকে কি জান না তুমি? ওর কোন শক্তি আছে? দু'দিনে নষ্ট হয়ে যাবে ও। আর সংসার তরার কথা বলছ? একটা মেয়েকে ধরে যদি গোটা সংসারটা তরতে চায়, না-ই বা তরল সে সংসার? যাক না নিঃশেষ হয়ে। সমস্যা সমাধানের এই সহজ পথটাই তোমার চোখে পড়ল মা?"

মনোরমা হতাশভাবে বলেন, "তবে কি করব বল? আমাকে নষ্ট করলে যদি সব দিক বাঁচত হয়তো তাও করতাম, কিন্তু এখন আমার আর—"

"থামো মা থামো," মুক্তি চীৎকার করে ওঠে, "আমি পড়া ছেড়ে দেব, চাকরি করব।"

"ক' টাকার চাকরি?" বিদ্রূপের স্বরে বলে ওঠেন মনোরমা, "যাতে পনেরো দিনের মধ্যে এই বাড়ির দেড় বছরের ভাড়া শোধ হতে পারে আর বাজারের বিরাট দেনা মেটে?"

"বাজারেও দেনা?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। জান না আজ আট বচ্ছর বাড়িতে আয় নেই, শুধু ব্যয় আছে—" আবার কেঁদে ফেলেন মনোরমা।

মুক্তি কিছুক্ষণ সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেই অলক্ষ্যে একটু প্রসাধন ছোঁওয়ানো বয়সের ছাপ আঁকা কান্না-কুৎসিত মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ বলে, "আচ্ছা, তুমি ভেবো না মা। ম্যানেজ করার ভারটা আমার হাতেই ছেড়ে দাও এবার।"

হ্যাঁ, নিজের হাতেই এ সংসারের ভার তুলে নেবে মুক্তি। মাকে বাঁচাবে প্রতিনিয়ত মৃত্যু থেকে। বাঁচাবে শুক্তিকে আগুনের হাত থেকে।

আর নিজেকে? নিজেকেও বাঁচাবে।

নিজেকে সে চেনে। নিজেকে সে বোঝে।

পরদিন দুপুরে যখন সেই রগের চুলে পাকধরা অমার্জিত চেহারার লোকটা এসে হাজির হ'ল প্রকাণ্ড এক গাড়ি চড়ে, তখন আতঙ্কগ্রস্ত মনোরমা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন শরীর অসুস্থ বলে, কারণ শুক্তি নেই। শুক্তিকে মুক্তি তাদের পিসির বাড়ি রেখে এসেছে।

কী করবেন মনোরমা, কী বলবেন তাকে ?

"তোমায় কিছু বলতে হবে না," মুক্তি কলেজ যায়নি, বাড়িতেই ছিল বাড়ির পক্ষে একটু বেশী প্রসাধিত হয়েই। "যা বলবার আমিই বলছি, আমার দেরি হলে ভেবো না," বলে নেমে গেল নিচের তলায় ড্রইংরুমে। নেমে গিয়ে দুই হাতে নমস্কারের ভঙ্গী করে কোমল হাস্যে বলল, "আপনি বেজায় রাগী তো!"

লোকটা থতমত খেল, স্পষ্টই থতমত খেল। আর সেই অবকাশে মুক্তি আর-একবার দিল একটু হাসির ঘা, "কাল বললাম কথা আছে আপনার সঙ্গে, ব্যস, চলেই গেলেন। কাল অসম্ভব শরীর খারাপ লাগছিল বলে চলে এসেছিলাম কলেজ থেকে। আজ এখনও বেরোইনি, বেরোবার আয়োজন করছি। আপনি কোন্‌দিকে যাবেন ? একটু লিফ্‌ট্‌ দিন না ?"

'রগের চুলে পাকধরা' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে, "কিন্তু আমার যে এখানে কাজ রয়েছে—"

"ওঃ, সেই আমার বোনকে কিসে যেন ইণ্টারভ্যু দিতে না ? চাকরিটা কি বলুন তো ? অতটুকু বাচ্ছা—"

"মানে—আর কি—আপনার মা নিজেই বলেছিলেন," তোতলাতে থাকেন ভদ্রলোক। শুক্তিকে দেখেছেন, শুধু উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা ছবি। কিন্তু শুধু ছবি। এ ছবির বহু বর্ণ, বহু ভঙ্গিমা।

মুক্তি নিতান্ত সহজে বলে, "কিন্তু কাল থেকে বেজায় জ্বরে পড়েছে বেচারা, আজ তো পারবেই না। কি আর করা যাবে! চলুন, আপনার সঙ্গে যেতে যেতেই শুনি, কাজটা কি। আমার দ্বারা হয় না ?"

ভদ্রলোককে একরকম ঠেলে নিয়েই গাড়িতে গিয়ে উঠে বসে মুক্তি, সিল্কের শাড়ির আঁচলটা গায়ে টেনে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি নিজেকে টেনে রাখতে পারবে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে ? মুক্তি নিজেকে চেনে, কিন্তু বাইরের হিংস্র পৃথিবীকে কি চেনে ?

উত্তরা, আশ্বিন ১৩৬৬

স্ব স্ত্য য় ন

সুবোধ ঘোষ

পাহাড় পরেশনাথের পায়ের কাছ থেকে ঢালু ধ'রে ধ'রে আমলকির বন যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে বেশ ঘন ছায়া জমিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিশু আর সেগুনের ছোট একটা ভিড়; তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে হলদে রঙের ডাকবাংলো; এবং এই ডাকবাংলোরই হাতার লতা-জড়ানো বেড়ার কাছাকাছি এসে বাঁ দিকে ঘুরে গিয়েছে কাঁকর-ছড়ানো গিরিডি রোড।

ছোট ডাকবাংলো। বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায়, পরেশনাথের পাথুরে মাথা জড়িয়ে একটা কালো মেঘ ধোঁয়াটে হয়ে ঝুলছে। বৃষ্টি হবে বোধ হয়।

বাংলোর মধ্যে পাশাপাশি মাত্র চারটি কামরা; তিনটি কামরাই খালি। শুধু একটি কামরার দরজার কড়াতে, আজ তিনদিন হ'ল, সুতো দিয়ে বাঁধা কার্ড ঝুলছে। কার্ডের উপর লাল পেনসিলে লেখা—মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস চক্রবর্তী।

কিন্তু বৃষ্টি হ'ল না। আজ তিনদিন হ'ল রোজ সকালে যেমন হয়, আজ সকালেও তেমনি, হঠাৎ ঝড়ের হাওয়া ছুটতে আরম্ভ করে, মেঘের ঘোর কেটে যায়, আর ঝলক দিয়ে রোদ ছড়িয়ে পড়ে আমলকির বনের উপর। যেমন এই তিনদিন, তেমনি আজও বেড়াতে বের হয়ে যান মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস চক্রবর্তী। অর্থাৎ, এন চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী স্বস্তিকা চক্রবর্তী।

বাংলোর গাড়ি-বারান্দা থেকে ছুটে বের হয়ে যায় চক্রবর্তী-দম্পতির মোটর গাড়ি, নতুন মডেলের একটি টুরার। গাড়ির নম্বর হ'ল পাঞ্জাব জলন্ধরের একটি নম্বর।

ড্রাইভার এই সময় বাংলোর খানসামার ঘরে খাটিয়ার উপর প'ড়ে ঘুমোতে থাকে। গাড়ি ড্রাইভ করেন স্বয়ং এন চক্রবর্তী। স্বামীর পাশে, স্বামীর সঙ্গে বড় বেশি গা ঘেঁষে ব'সে থাকেন স্বস্তিকা চক্রবর্তী। স্বস্তিকার মাথাটা সুন্দর একটি নেট জড়ানো খোঁপা নিয়ে আধভাঙা বোঁটার ফুলের মত এলিয়ে পড়ে এন চক্রবর্তীর কাঁধের উপর।

গাড়ি চালান এন চক্রবর্তী, কিন্তু গাড়ি থামে স্বস্তিকা চক্রবর্তীর ইচ্ছায়। পৃথিবীর বুকের উপর এমন একটি ভাল জায়গায় এসে কিছুক্ষণ থামতে আর

থাকতে চায় স্বস্তিকা, যেখানে আরও অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেকে স্বামীর বুকের কাছে আরও আপন ক'রে দিতে পারা যায়।

এন চক্রবর্তী হঠাৎ গাড়ির স্পীড মৃদু ক'রে দিয়ে বলেন, এই তো একটা ভাল জায়গা, এর চেয়ে নির্জন জায়গা আর হতে পারে না স্বস্তি।

স্বস্তিকা বলে, ধেৎ!

এন চক্রবর্তী আশ্চর্য হন : ধেৎ কেন ?

স্বস্তিকা। দেখছ না, একটা রাখাল ছোঁড়া গাছটার তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে।

এন চক্রবর্তী। তাতে কি হয়েছে ?

স্বস্তিকা। না, এখানে থেমে কোন লাভ হবে না। এর চেয়ে বরং ডাক-বাংলোটাই ঢের বেশি ভাল জায়গা। চলো, ফিরে যাই।

এই হ'ল এন চক্রবর্তীর আর স্বস্তিকা চক্রবর্তীর বেড়াতে যাওয়া আর বেড়িয়ে আসা। এবং এই ছোট হলদে রঙের ডাকবাংলোটাও সত্যিই বেশ ভাল জায়গা। তাই তো মাত্র এক ঘণ্টার জন্য থাকতে এসে এই ডাকবাংলোতে তিন দিন ধ'রে থেকেই গিয়েছে দু'জনে। স্বস্তিকারই ইচ্ছা, আরও কটা দিন থেকে যেতে হবে। তিনটি কামরাই খালি, ডাকবাংলোর বুক জুড়ে বড় সুন্দর আর বড় মিষ্টি একটা নির্জনতা যেন থমথম করে। বারান্দার উপর প'ড়ে আছে একটি মাত্র চেয়ার এবং ওই এক চেয়ারের উপর স্বামীর সঙ্গে ইচ্ছামত আর যেমন খুশি তেমনি ক'রে ব'সে থাকতে পারে স্বস্তিকা। কোন বাধা নেই। ঘণ্টা না বাজলে খানসামাও কখনো হঠাৎ এদিকে এসে পড়ে না।

আজ তিন দিন হ'ল যেমন রোজ সকালে তেমনি আজও সকালে বেড়িয়ে ফিরে আসেন এন চক্রবর্তী ও স্বস্তিকা, স্বামী আর স্ত্রী, জলন্ধরের সব চেয়ে বেশি নামকরা সার্জন এন চক্রবর্তী ও লুধিয়ানার সব চেয়ে বড় ফার্মাসির মালিক এস ভট্টাচার্যের শ্যালিকার মেয়ে স্বস্তিকা।

আজ মাত্র এক মাস হ'ল বিয়ে হয়েছে স্বস্তিকার। যে বয়সে বিয়ে হ'লে ভাল হয়, তার চেয়ে বেশ একটু বেশি বয়স হয়েছে স্বস্তিকার। স্বস্তি পেয়েছে, ধন্য হয়েছে, সুখী হয়েছে স্বস্তিকার জীবন। মনে হয়েছে স্বস্তিকার, আট বছর ধ'রে লুধিয়ানাতে এসে লুকিয়ে প'ড়ে-থাকা জীবনের একমাত্র আশা এতদিনে সফল হয়েছে। ব্যর্থ হয় নি তার বয়সের প্রতীক্ষা।

ডাকবাংলোর বারান্দার উপর উঠেই স্বস্তিকার এতক্ষণের উল্লাস-চঞ্চল দুটি চোখের দৃষ্টি হঠাৎ অপ্রসন্ন হয়ে একটি কামরার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে

থাকে। কেউ একজন এসেছে। লোকটাকে একটু বেহায়া ব'লেই মনে হয়। আরও দুটো কামরা খালি প'ড়ে থাকতে, লোকটা বেছে বেছে ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশার নীড় এই সবুজ রঙের কামরাটিরই পাশের কামরায় এসে ঠাঁই নিয়েছে। কার্ড ঝুলছে বন্ধ দরজার কড়াতে—পরিতোষ গাঙ্গুলী, টিম্বার মার্চেণ্ট।

এন চক্রবর্তীর চোখে কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে : কি ভাবছ স্বস্তি? এ জায়গার চেয়ে সেই জায়গাটাই তো ভাল ছিল, কেমন?

উত্তর দেয় না স্বস্তিকা। এন চক্রবর্তী হেসে ফেলেন : আর ক'দিন এখানে থাকতে চাও স্বস্তি?

স্বস্তিকার মনের অপ্রসন্নতা যেন ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে : আর এক মিনিটও না।

পাশের কামরার বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলে যায়। দু'বার জোরে জোরে গলা কেশে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ান এক ভদ্রলোক। সিল্কের গেঞ্জি গায়ে, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, তাঁতের ধুতি পরা এক ভদ্রলোক।

কে জানে কেন, বোধ হয় আলাপ করার জন্য ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। কিন্তু বের হয়েই যেন থমকে গিয়েছেন। কোন কথা বললেন না ভদ্রলোক। স্বস্তিকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন, তার পরেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বোধ হয় পরেশনাথের চূড়ার আলো-ঝলসানো রূপ আরও ভাল ক'রে দেখবার জন্য বারান্দার ওই প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন টিম্বার মার্চেণ্ট পরিতোষ গাঙ্গুলী।

এক হাত দিয়ে এন চক্রবর্তীর একটা হাত বড় বেশি শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধ'রে থাকে স্বস্তিকা। আস্তে আস্তে বলে : ঘরের ভেতর চলো।

এন চক্রবর্তী আবার হাসেন : কি হ'ল?

স্বস্তিকা বলে, না, সত্যিই আর এক মিনিটও না। চলো, এখুনি এখান থেকে স'রে পড়ি।

এন চক্রবর্তী। এখুনি মানে আজকের দিনটা কাটিয়ে কাল সকালে, এই তো?

স্বস্তিকা ছটফট ক'রে ওঠে : না না, এখুনি, এইমাত্র চ'লে যেতে হবে। ড্রাইভারকে ডাকো, জিনিসপত্র গাড়িতে তুলুক। খানসামাকে ডেকে বিল চুকিয়ে দাও।

ঘরের ভিতরে ঢুকে ঝুপ ক'রে একটা চেয়ারের উপর ব'সে পড়েন

এন চক্রবর্তী। মুখের পাইপে ছোট ছোট টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়েন, মাঝে মাঝে শিস দেন আর পা দোলাতে থাকেন।

ঘরের ভিতরেও ওই একটি মাত্র চেয়ার। ওই চেয়ারে স্বামীর সঙ্গে গা ঘেঁষে বসবার জন্য দু' পা এগিয়ে যাবার আগেই স্বস্তিকার পা দুটো যেন ট'লে ওঠে। দরজার কপাট বন্ধ ক'রে দিয়ে, বন্ধ কপাটের উপর পিঠ ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন শ্রান্ত ক্লান্ত ও ভীত দেহের আলস্যভার কোনমতে সামলে রাখবার চেষ্টা করেছে স্বস্তিকা।

এন চক্রবর্তী বলেন, কিন্তু আমার যে আজই সন্ধ্যায় একবার গিরিডি পর্যন্ত দৌড়ে আসবার কথা।

শিউরে ওঠে স্বস্তিকার চোখের পাতা. হঠাৎ গিরিডিতে কিসের দরকার হ'ল ?

এন চক্রবর্তী। আমার বন্ধু লেফটেন্যাণ্ট জয়সোয়ালের বিয়ে।

স্বস্তিকা আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে : না, আমি একা থাকতে পারব না।

এন চক্রবর্তী। তা হ'লে তুমিও চলো।

স্বস্তিকা। না, না, তুমি তো জানই যে আমি লোকজনের ভিড় সহ্য করতে পারি না, তবে মিছে কেন ওসবের মধ্যে আমাকে যেতে বলছ ?

এন চক্রবর্তী। কিন্তু···।

স্বস্তিকা। কিন্তু-টিন্তু কিছুই নেই। এখান থেকে এখুনি সোজা ফিরে চলো জলন্ধরে। আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, এদিকে বেড়াতে এসো না, ঈস্ট ইণ্ডিয়া আমার মোটেই ভাল লাগে না।

—এটা একটা নতুন কথা বটে, এই প্রথম শুনলাম। হাসি-মুখেই স্বস্তিকার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তারপর হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকেন এন চক্রবর্তী এবং বোধ হয় ভাবতে থাকেন, স্বস্তিকার মনে তা হ'লে আরও একটা বাতিক আছে। বিয়ে হবার পর এই এক মাসের মধ্যে স্বস্তিকার মন আর মেজাজের অনেক কিছু জানবার সঙ্গে সঙ্গে এন চক্রবর্তী শুধু এইটুকুই জেনেছেন যে, লোকের চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না স্বস্তিকা। ভিড়ের চোখের সামনে পড়লেই যেন ছটফট করে স্বস্তিকা, লোকের চোখের দৃষ্টি সত্যিই যেন ওর গায়ে বিঁধছে। অনেক ঠাট্টা ক'রেও স্বস্তিকার মনের এই বাতিক আজও সারাতে পারেন নি এন চক্রবর্তী।

—বড় বেশি তাড়াতাড়ি করতে বলছ স্বস্তি। এখন মাত্র সকাল নটা, না খেয়েদেয়ে এখুনি রওনা হ'লে—।

স্বস্তিকার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চমকে ওঠেন এন চক্রবর্তী। ভয়-পাওয়া রোগীর চোখের মত চোখ, স্বস্তিকা অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে তাঁরই মুখের দিকে।

—কি? জ্বর-টর হ'ল নাকি?

—জ্বরের মতনই লাগছে। খুব মাথা ধরেছে।

—তাই বল। শুয়ে পড়ো এখুনি। আমি মনে করলাম, তুমি তোমার মনের বাতিকে ওই একটা বাজে লোকের তাকানিতে রাগ ক'রে আর ভয় পেয়ে একেবারে একটা···ইয়ে হয়ে গেলে···বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়েই ফেললে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে, তার পরেই শরীরটাকে যেন ঝুপ ক'রে হঠাৎ একটা আছাড় খাইয়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়ে স্বস্তিকা। আঁচলটা টেনে মুখের উপর আলগা ক'রে ছড়িয়ে দেয়। কী ভয়ানক সত্য কথা স্বস্তিকার স্বামী এন চক্রবর্তীর মুখে নতুন একটা আদালতের রায়ের মত ধ্বনিত হয়েছে! ওই লোকটা সত্যই যে সেই বাজে লোকটা, আট বছর আগে যে লোকটা স্বস্তিকার মুখের দিকে শেষবারের মত তাকিয়েছিল। সেই রকমই সিল্কের গেঞ্জি; সেই রকমই তাঁতের ধুতি, আর সেই ধরনেরই হরিণের চামড়ার চটি। আট বছরের মধ্যেও কোন অপঘাতে মরে যায় নি লোকটা।

কেমন ক'রে এখানে এল লোকটা? লোকটা কি দৈববাণী শুনেছিল যে, আলিপুরের সেই দোতলা বাড়ির মেয়েকে একদিন এই হলদে রঙের ডাক-বাংলোর ভিতরে পাওয়া যাবে?

মাটির একটা রঙিন পুতুলকে যত সহজে গুঁড়ো ক'রে আর ধুলো ক'রে দিতে পারা যায়, আজ স্বস্তিকার এই সুখের জীবনকে তার চেয়েও সহজে ধুলো ক'রে দিতে পারে লোকটা। তার জন্য স্বস্তিকার গায়ে একটা টোকা দিতেও হবে না, শুধু কয়েকটা কথা এন চক্রবর্তীর কানের কাছে ব'লে দিয়ে চ'লে গেলেই হ'ল। আট বছর আগের আলিপুর দায়রা-জজের আদালতের একটি মামলার রায়। বাস্, তার পর মুখের উপর থেকে এই আঁচল সরিয়ে তাকালে স্বামীকে এই ঘরের মধ্যে আর কি দেখতে পাবে স্বস্তিকা? এই বিছানার উপর স্বস্তিকাকে এই ভাবেই একটা দুঃস্বপ্নের দুঃসহ ক্লেদের মত ফেলে রেখে এন চক্রবর্তী তাঁর টুরার নিয়ে ছুটে চ'লে যাবেন জলন্ধর।

আসছে বোধ হয়; হরিণের চামড়ার চটি বাংলোর বারান্দার উপর উল্লাস

ক'রে শব্দ ছটফটিয়ে ছুটে আসছে। সেই শব্দ শুনে স্বস্তিকার কানের কাছে ঘাম হয়ে ফুটে উঠেছে শরীরের ভয়ার্ত রক্তের কণাগুলি।

স্বস্তিকার আঁচল-ঢাকা মুখটা আস্তে একবার ফুঁপিয়ে ওঠে। হাতের বইয়ের উপর থেকে চোখ তুলে স্বস্তিকার দিকে তাকিয়ে এন চক্রবর্তী বলেন: ঘুমোবার চেষ্টা করো স্বস্তি। বেশ ভাল একটা স্বপ্ন দেখলে সব মাথাধরা সেরে যাবে।

না, কেউ এল না। বন্ধ দরজার কড়া শব্দ ক'রে বেজে উঠল না। বোধ হয় আর-একটু পরেই আসবে। অসহায়ের মত সব পরিণাম দৈবের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে শান্ত হতে চেষ্টা করে স্বস্তিকা, এবং ঘুমোতেও চেষ্টা করে। ঘুম আসে না ঠিকই, কিন্তু আট বছর আগের সেই ঘটনার ছবিগুলি যেন টুকরো টুকরো স্বপ্নের মত চোখের উপর ভাসতে থাকে।

পরিতোষ গাঙ্গুলী নয়, ওর নাম হ'ল রতন গাঙ্গুলী। পুরনো নাম ফেলে দিয়ে নতুন নামের আড়ালে জীবনটাকে লুকিয়ে বোধ হয় পৃথিবীর এই দিকের গোপন আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করে লোকটা।

স্বস্তিকা নামটাও যে নিতান্ত নতুন একটা নাম, নামটার বয়স আট বছরের বেশি নয়। আট বছর আগের সেই আলিপুরের দোতলা বাড়ির মেয়ে রেবা মজুমদারই নতুন নামের আবরণ জীবনের উপর জড়িয়ে নিয়ে আর স্বস্তিকা মজুমদার হয়ে লুধিয়ানার মেসোমশাইয়ের বাড়িতে এতদিন ছিল। মাত্র এক মাস হ'ল স্বামীর পাশে দাঁড়াবার পর স্বস্তিকা মজুমদার হয়েছে স্বস্তিকা চক্রবর্তী।

আলিপুরের সেই দোতলা বাড়িতে মামা-মামীর আদরে বেশ ভালই তো কাটছিল বাপ-মা-মরা মেয়ে রেবা মজুমদারের জীবন।

বাইশ বছর বয়সের সব অহংকার আর কল্পনা নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে আর বি. এ. ফাইন্যালের পড়া প'ড়ে প'ড়ে, মুখটাকে সুন্দর ক'রে রাঙিয়ে আর শরীরটাকে নানা ছাঁদে সাজিয়ে সুখের দিনগুলি তরতর ক'রে পার হয়ে যাচ্ছিল। তার পরেই হঠাৎ সেই ঘটনা।

ঘরের ভিতরের নীরব স্তব্ধতাকে সন্দেহ ক'রে চমকে ওঠে আর ধড়ফড় ক'রে বিছানার উপর উঠে বসে স্বস্তিকা! লোকটা কি সত্যিই এরই মধ্যে ঘরের ভিতরে এসে এন চক্রবর্তীর কানে কানে সেই হিংস্র গল্পটা ফিসফিস ক'রে শুনিয়ে দিয়ে চ'লে গিয়েছে?

না, আসে নি লোকটা। দেখতে পায় রেবা, এন চক্রবর্তী তেমনি মন দিয়ে বই পড়ছেন, আর দরজাটা তেমনি বন্ধ আছে। কিন্তু বুঝতে পারে না

রেবা, রেবার উপর প্রতিশোধ না নিয়ে থাকতে পারবে কেমন ক'রে ওই রতন গাঙ্গুলী?

কল্পনা করতে পারে রেবা, এই ঘরের দরজার বাইরে বারান্দার উপর এখন পা টিপে টিপে ঘুরছে প্রতিশোধের একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা। এন চক্রবর্তী এই ঘরের বাইরে যাওয়া মাত্র ওই প্রতিজ্ঞা হেসে হেসে এগিয়ে এসে এন চক্রবর্তীর কানের কাছে সেই রাক্ষুসে ঘটনার গল্পটা ব'লে দেবে। এই ঘরের ভিতরে আসবার দরকার হয় না, রেবার জীবনের ভালবাসার মানুষটাকে শুধু একটু একা আর আড়ালে পেতে চায় রতন গাঙ্গুলী।

এন চক্রবর্তী বই বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ান। চেঁচিয়ে ওঠে রেবা, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

এন চক্রবর্তী। যাই, ড্রাইভারকে ব'লে দিয়ে আসি, গাড়ির ইঞ্জিনটাকে একটু ভাল ক'রে চেক ক'রে রাখুক।

রেবা। না, যেতে হবে না। কখ্খনো যেয়ো না।

এন চক্রবর্তী আশ্চর্য হন: তার মানে?

রেবা। তুমি এখানেই আমার কাছে ব'সে থাকো, লক্ষ্মীটি। দেখেও বুঝতে পারছ না কেন, মাথাধরাটা আমাকে কি রকম জ্বালাচ্ছে?

চেয়ারের উপর ব'সে আবার বই হাতে তুলে নিলেন এন চক্রবর্তী। তারপর বলেন, এতটুকু ঘুমোলে ভাল স্বপ্ন দেখা যায় না, আর মাথাধরাও ছাড়ে না স্বস্তি।

স্বপ্ন না দেখলেও আট বছর আগের সেই জীবনকে এখন যে স্বপ্নেরই মত মনে হচ্ছে রেবার।

বসিরহাটের অত বড় বাড়িটা বিক্রি ক'রে দিয়েও সব দেনার দায় মিটাতে পারেন নি মামা। বিক্রি করবার আর কিছুই ছিল না। দেউলে হয়ে গিয়ে আর বসিরহাট থেকে সবাইকেও সঙ্গে নিয়ে চ'লে এসে আলিপুরের সেই দোতলা বাড়িতে যেদিন উঠলেন মামা, সেই দিন মামী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এত বড় বাড়ির ভাড়া আসবে কোথা থেকে আর দিন চলবেই বা কেমন ক'রে?

বিছানার উপর ব'সে ব'সেই টলতে থাকেন মামা। বিছানার উপরেই মামার হাতের কাছে কাঠের একটা ট্রে, তার উপর হুইস্কির বোতল আর গেলাস। গেলাসে আর-একটা চুমুক দিয়ে, আর কোলের উপর একটা বালিশ

টেনে নিয়ে মামা এলোমেলো স্বরে বলতে থাকেন, আমি সেই সুখময় চৌধুরী, আমি জানি কি ক'রে দিন চালাতে হয় মঙ্গলা।

চুপ ক'রে থাকেন মঙ্গলা। সুখময় চৌধুরী আবার বলেন, আমার বাবার মুহুরী ছিল যার বাবা, ওই বিনোদ গাঙ্গুলী যদি এত স্টাইল আর চটক দেখিয়ে দিন কাটাতে পারে, তা হ'লে আমিই বা পারব না কেন?

মঙ্গলা জানেন, এর মধ্যে একটা সত্য কথা বলেছেন তাঁর স্বামী। এই দোতলা বাড়ির চোখের সামনেই রাস্তার ওপারে ওই মস্ত চারতলা বাড়িতে থাকেন যে বিনোদ গাঙ্গুলী, তাঁর বাবা একদিন এই সুখময় চৌধুরীর বাপের মুহুরী ছিলেন। কিন্তু সেই গাঙ্গুলীরাই দিন দিন উঠেছে আর এই চৌধুরীরা পড়েছে। একই গ্রামে ওদের দেশ। মুহুরীর ছেলে বিনোদ গাঙ্গুলীই বিলেত থেকে পাস ক'রে এসে ত্রিশ বছর ধ'রে বড় বড় চাকরি করেছে, আর নিজের রোজগারের টাকায় এত বড় বাড়ি তুলেছে। কিন্তু মুহুরীর বড়-বাবুর ছেলে সুখময় চৌধুরী বাপের আমলের বাড়ি বেচে দিয়ে আর দেউলে হয়ে দোতলা বাড়ির ভাড়াটে হয়েছে।

প্রথম মাসটা কষ্টেই কেটেছিল। কিন্তু তার পরেই আর নয়। সুখময় চৌধুরী সত্যিই প্রমাণ ক'রে দেখিয়ে দিলেন যে, এক পয়সা রোজগার না ক'রেও স্টাইল ক'রে থাকবার আর নিত্য হুইস্কি খাবার বিজ্ঞান তিনি জানেন। তেজ বাহাদুর, ভীম বাহাদুর আর বংশীলাল—তিন চাকরের কোন চাকরকেই বিদায় দিতে হ'ল না। নতুন রেডিও আর গ্রামোফোন কিনলেন, একটা বিলিতী কুকুরও কিনে ফেললেন। কুকুরের জন্য চৌরঙ্গীর দোকান থেকে বিস্কুট কিনে আনতে যায় ভীম বাহাদুর।

রেবা বলে, আমি তা হ'লে বি. এ. ফাইন্যালের জন্য তৈরী হই মামা?

সুখময় চৌধুরী বলেন, নিশ্চয়ই।

রেবার জন্য প্রাইভেট টিউটরও রেখে দিলেন মামা। প্রতি মাসে একশো টাকা নেন প্রাইভেট টিউটর।

রবিবারের সন্ধ্যায় সিনেমা ছবি দেখতে যায় রেবা। কিন্তু যেতে আসতে বড় কষ্ট হয়। মামার কাছে এসে অভিযোগ করে রেবা, ট্রাম-বাসে যাওয়া-আসা করতে বড় বিশ্রী লাগে মামা।

সুখময় চৌধুরী বলেন, এবার থেকে ট্যাক্সি ক'রে যাবি, সঙ্গে যাবে তেজ বাহাদুর।

রেবা একদিন বলে, ট্যাক্সিও একটা ঝঞ্ঝাট। একটা গাড়ি কিনে ফেলো না মামা?

সুখময় চৌধুরী বলেন, এইবার কিনেই ফেলব বোধ হয়।

সুখময় চৌধুরীর ডাইনে বাঁয়ে সর্বক্ষণ গেলাস-ভর্তি হুইস্কি ছলছল করে, মাথাটা সর্বক্ষণ ঝুঁকেই রয়েছে, যেন গ'লে গিয়েছে মেরুদণ্ডটা। এক মুহূর্তের জন্যও বাড়ির বাইরে যান না। কিন্তু এই বাড়ির সব ক্ষুধা তৃষ্ণা আর দরকারের দাবী পূর্ণ করবার জন্য তাঁর হাতের কাছে থোকা থোকা নোট এসেই যাচ্ছে। আদরের ভাগনী রেবার সব স্টাইলের আশা ও আবদার মিটিয়ে দিচ্ছেন সুখময় চৌধুরী।

রেবা হেসে হেসে বলে, আমি যদি বিলেত গিয়ে পড়াশুনা করতে চাই মামা?

সুখময় চৌধুরী বলেন, বেশ তো, তার ব্যবস্থাও ক'রে দেব।

রেবা মজুমদারের জীবনের অনেক আশা ও অনেক কল্পনা মত্ত হয়ে রেবার মনটাকেও মাতিয়ে রাখে সর্বক্ষণ। এই সুখের জীবনের মধ্যে শুধু একটা উপদ্রব দিনের মধ্যে অন্তত তিন-চারবার রেবার মনটাকে দুঃসহ যন্ত্রণা দিয়ে উত্যক্ত করে। সামনের চারতলা বাড়ির বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে রতনের চোখের দৃষ্টি। সারা দিনের মধ্যে অন্তত একবার এই বাড়ির ভিতরে আসবেই রতন, আর অন্তত দুবার এই বাড়ির ফটকের কাছে এসে দাঁড়াবে ও চ'লে যাবে। ওর চোখ দুটো যেন সারাক্ষণ একটা পিপাসার রোগে ভুগছে; দিনের মধ্যে তিন-চারবার রেবা মজুমদারের সুন্দর মুখটার দিকে তাকাতে না পারলে ওর চোখের রোগের জ্বালা যেন শান্ত হয় না।

রেবা মজুমদারের মনটাও জ্ব'লে ওঠে। মামার উপরেও রাগ হয়। গল্প করবার জন্য পৃথিবীতে আর লোক পান নি মামা। থার্ড ক্লাস না ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে, বিদ্যা আর এগোয় নি; দু-বেলা কুস্তি আর কসরৎ করে, বেহায়ার মত রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ভীম বাহাদুরের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে। সন্ধ্যা হ'লে থিয়েটারের ক্লাবে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চন্দ্রগুপ্ত হয়ে গর্জন করে। এই তো ওর মনুষ্যত্ব। এই মানুষের সঙ্গে গল্প ক'রে মামা কী যে আনন্দ পান কে জানে!

বারান্দার সামনে এক টুকরো খোলা জমির উপর পাতাবাহারের কয়েকটা কেয়ারি, আর একটা শিউলি গাছ। সেই শিউলির কাছে নিশ্চিন্ত মনে সন্ধ্যা-বেলাটা একবার দাঁড়াতেও পারে না রেবা মজুমদার। দেখতে পায় রেবা,

ঠিকই, আর কেউ নয়, সেই রতনই ফটক পার হয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বারান্দায় উঠল, আর সোজা মামার ঘরের দিকে চ'লে গেল। তাঁতের কোঁচানো ধুতি, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, গায়ে শুধু একটা সিল্কের গেঞ্জি; ভদ্রতাসম্মত একটা জামাও পরতে ভুলে গিয়েছে ওই অশিক্ষিতটা। যেন এই বাড়িরই কত আপন জন। স্বচ্ছন্দে আসে আর স্বচ্ছন্দে চ'লে যায়।

রেবার সঙ্গে কথা বলতে কোনদিন ভুলেও সাহস করে নি রতন। যদি সে সাহস কোনদিন করে রতন, তবে রেবাও কি করবে সেটা মনে মনে জেনেই রেখেছে রেবা। তখুনি ভীম বাহাদুরকে ডেকে ব'লে দেবে রেবা, এই ভদ্রলোক কী বলছেন শোনো।

কিন্তু ভীম বাহাদুরকে ডাকবার দরকার হয় নি এখনো। মুখে নয়, রতনের চোখেই যত দুঃসাহস। অযোগ্যের আকাঙ্ক্ষার লোভ। গাছের অনেক উপরের একটা ফোটা শিউলির দিকে শুধু লুব্ধভাবে তাকিয়ে থাকার মত মূর্খতা। যেন শুধু ওরকম ক'রে তাকালেই দয়া ক'রে সেই শিউলি টুপ ক'রে ওর বুকের উপর ঝ'রে পড়বে। কী যন্ত্রণা! রেবার মুখের দিকে রতন তাকালেই মুখ ফিরিয়ে নেয় রেবা। রেবা মজুমদারের সব কল্পনার অহংকারে শেষ পর্যন্ত ঘেন্না ধরিয়ে দেবে এই লোকটার ওই বিশ্রী আশার দৃষ্টি। নিরেট একটা লিপ্সা যেন রেবার সুন্দর মুখের আর শিক্ষিত রুচির মান-সম্মান ধ্বংস করবার জন্য সব সময় সুযোগ খুঁজছে। রতন গাঙ্গুলীর ছায়ার দিকে তাকাতেও ঘেন্না করে রেবার।

রেবা জানে না, মামা সুখময় চৌধুরী রেবার বোঝবার অনেক আগেই বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে রতনের ওই চোখের আশা আর ইচ্ছাকে বুঝে ফেলেছেন। অশিক্ষিত রতনের চোখের সেই লুব্ধতা ও মুগ্ধতার, সেই আশা ও ইচ্ছার সুযোগ নিতে একটুও দেরি করেন নি বসিরহাটের দেউলে জমিদার সুখময় চৌধুরী, হুইস্কির লোভে স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাঁর জীবনের মেরুদণ্ড গ'লে গিয়েছে। তাই রতন গাঙ্গুলীর হাত থেকে থোকা থোকা নোট আর থলিভরা টাকা পেয়েই যাচ্ছেন সুখময় চৌধুরী। এই তিন মাসের মধ্যে একটি বারের মতও 'না' করে নি রতন।

তোয়ালে তুলে ভেজা ঠোঁট মুছে নিয়ে সুখময় চৌধুরী বলেন, আমার জীবনে টাকার আর কি দরকার! আমি তো একরকমের সন্ন্যাসী হয়েই গিয়েছি। রেবার জন্যই বলছি। সাজতে ভালবাসে মেয়েটা, সাজলে মানায়ও

সুন্দর। অন্তত হাজার পাঁচেক পেলে রেবার জন্য একটা জড়োয়া সেট অর্ডার দিতে পারি।

রতন বলে, কবে টাকা পেলে চলতে পারে ?

সুখময় চৌধুরী। আজই দাও না।

রতন বলে, অন্তত একটা দিন সময় পেলে ভাল হয়।

সুখময় চৌধুরী। বেশ, তাহ'লে কালই টাকা পৌঁছে দিয়ো।

প্রায় প্রতিদিনই, সুখময় চৌধুরীর চোখের সামনে এসে ব'সে এই রকমই গল্প শোনে চারতলা বাড়ির ছেলে রতন গাঙ্গুলী। গল্প শুনতে একটু ভয়-ভয়ও করে রতনের। কিন্তু গল্পের মধ্যে রেবার দরকারের দাবিটা মুখ খুলে ফেললেই সেই গল্প রূপকথার মত মিষ্টি হয়ে যায়। এই তিন মাসের মধ্যে যতবার যত টাকা চেয়েছেন সুখময় চৌধুরী, ততবার তত টাকা এনে দিয়েছে রতন।

এর পরেই সেই সন্ধ্যা, কি সুন্দর বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল বৈশাখের সেই সন্ধ্যাটা! রেবা মজুমদার তার একলা ঘরের নিভৃতে ব'সে এসরাজ বাজিয়ে গান করে। বাড়ির পিছনের পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে ব'সে ভাং খায় আর গলা ছেড়ে হল্লা করে ভীম বাহাদুর ও তেজ বাহাদুর। চৌধুরী-গৃহিণী মঙ্গলা আছেন তাঁর পূজার ঘরে। আর বাইরের ঘরে সুখময় চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করে রতন।

রতন কুণ্ঠিতভাবে বলে, এত টাকা ?

সুখময় চৌধুরী চেঁচিয়ে বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এত টাকাই লাগবে। ওর কমে হয় কি ক'রে ?

রতন। রেবা কি সত্যিই বিলেতে গিয়ে পড়াশুনা করতে চায় ?

—তাই তো ওর ইচ্ছে। কিন্তু তার জন্যে আমাকেও তো এখন থেকেই টাকার যোগাড় ক'রে রাখতে হবে।

—আমার মনে হয়, রেবার বিলেত যাবার কোন দরকার নেই।

—হয়তো দরকার না-ও হতে পারে। কিন্তু টাকাটা আমার চাই।

—আমার ইচ্ছা…।

—কি তোমার ইচ্ছা ?

—অর্থাৎ আপনারই ইচ্ছা, অর্থাৎ আপনি সেই যে বলেছিলেন, আমার সঙ্গে রেবার বিয়ে দিতে চান, সে ব্যাপারে আর দেরি না হওয়াই ভাল।

—আহা! সে ইচ্ছে তো আছেই; এবং আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণও করব একদিন। কিন্তু এই টাকাটা আমার অবিলম্বে চাই।

—এত টাকা কোথা থেকে পাব বুঝতে পারছি না।

—একটু ভেবে দেখ রতন, রেবার মত মেয়ে তোমার স্ত্রী হবে। স্ত্রীরত্নই হ'ল রত্ন, এর কাছে তোমার ওই ক'টা টাকা কত তুচ্ছ জিনিস বল তো?

—কিন্তু আমি যে বাবার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছি চৌধুরী মশাই, আর টাকা পাওয়ার পথ বন্ধ।

—তাই নাকি? কি বললেন বিনোদবাবু?

—বাবা বললেন, তুমি আমার সই জাল ক'রে চেক কেটে ব্যাঙ্ক থেকে যে এতগুলি টাকা সরিয়েছ, তার জন্যে খুব বেশি দুঃখ করি না। কিন্তু বুঝতে পেরেছি, তুমি নিশ্চয় কোন খারাপ স্ত্রীলোকের সংসর্গে প'ড়ে লম্পট হয়েছ। বলতে বলতে কেঁদেই ফেলেছেন বাবা।

সুখময় চৌধুরী মুখ বিকৃত ক'রে হাসেন: বিনোদটা ওই রকমই একটা অসভ্য।

ছ্যাঁক ক'রে যেন চমকে ওঠে রতনের চোখ: বাবার সম্পর্কে ওরকম ক'রে কথা বলবেন না চৌধুরী মশাই।

সুখময় চৌধুরী বলেন, আমি কিছুই বলতে চাই না, শুধু জানতে চাই টাকাটা কবে পাব।

রতন। আমার পক্ষে এত টাকা দেওয়া আর সম্ভব হবে না চৌধুরী মশাই। কিন্তু একটা উপায় হতে পারে।

—বলো কি উপায়?

—আপনি যদি রেবাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার কাছে একবার যান, আর দরকারের কথাটা একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন, তবে বোধ হয়...।

ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত কিছুক্ষণ রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুখময় চৌধুরী। তার পরেই ফ্যাঁস ক'রে চেঁচিয়ে ওঠেন, তোমার বাবা আমাকে টাকা দেবে? আমার কথা বিশ্বাস করবে তোমার বাবা! বিনোদ গাঙ্গুলী কি সেই কাঁচা লোক? সে মুহুরীর বাচ্চাকে কি আমি চিনি না?

রুষ্ট চিতা বাঘের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় রতন। এক থাবা দিয়ে সুখময় চৌধুরীর গলা টিপে ধরবার জন্য হাত বাড়ায়।

চিৎকার করেন সুখময় চৌধুরী : জলদি আও ভীম বাহাদুর, তেজ বাহাদুর। শালা আমাকে খুন ক'রে ফেলেছে।

খোলা ভোজালি হাতে নিয়ে ছুটে আসে ভীম বাহাদুর আর তেজ বাহাদুর। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রতন। সুখময় চৌধুরীর মুখটা কাঁপতে কাঁপতে বীভৎস হয়ে ওঠে।

—মুহুরীর বাচ্চার বাচ্চা এই হতভাগা আমার গলা টিপে ধরতে চায়! বলতে বলতে হুইস্কির বোতল হাতে তুলে নিয়ে রতনের কপালের উপর প্রচণ্ড এক আঘাত আছড়ে দিলেন সুখময় চৌধুরী। ঝংকার দিয়ে চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভাঙা বোতলের কাচ। রতনের কপালে আঁকাবাঁকা একটা ফাটলের রেখা ভেদ করে ফুটে উঠতে থাকে রক্তের বুদ্বুদ।

হাত দিয়ে কপাল টিপে ধ'রে ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় রতন। কিন্তু ফটক পর্যন্ত পৌছবার আগেই, শিউলির কাছে এসে হঠাৎ কাটা গাছের মত আস্তে আস্তে হেলতে হেলতে মাটির উপর প'ড়ে যায়।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন সুখময় চৌধুরী। তাকিয়ে থাকে ভীম বাহাদুর আর তেজ বাহাদুর। এসরাজ ফেলে ছুটে এসে বাইরের ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে রেবা মজুমদার।

সুখময় চৌধুরীর কুঁজো শরীরটা থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। তারপরেই ভয়ানক কর্কশস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন সুখময় চৌধুরী, ম'রে গিয়েছে শালা।

ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে একটা ভিড় তাকিয়ে দেখতে থাকে, শিউলির কাছে রক্তমাখা-মাথা একটা মানুষ প'ড়ে আছে। চেঁচিয়ে ওঠে ভিড়ের লোক, পুলিস পুলিস। খুন খুন!

ছুটে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েন সুখময় চৌধুরী। সিরসির ক'রে কাঁপতে থাকে কুঁজো শরীরের পাঁজরাগুলো। ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত ছোটছেলের মত চিৎকার ক'রে ওঠেন সুখময় চৌধুরী, রেবা! রেবা!

রেবা কাছে এসে দাঁড়ায় : কি হ'ল মামা?

ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আর ঠকঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সুখময় চৌধুরীর বুকের ভিতর থেকে যেন একটা আধমরা প্রাণ হাঁপাতে হাঁপাতে ব'লে, আর রক্ষে নেই রেবা। বিনোদ গাঙ্গুলী আমাকে ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে ছাড়বে না।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে রেবা, এ কি সর্বনেশে কথা বলছ মামা?

সুখময় চৌধুরী। রতন গাঙ্গুলীকে মেরেছি ; ম'রেই গিয়েছে বোধ হয়। কিন্তু আমি বাঁচব কি ক'রে ?

রেবা। কি করেছিল লোকটা ?

ফটকের কাছে পুলিসের লরি এসে থেমেছে। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে পুলিসের মূর্তি দেখতে পেয়েই সুখময় চৌধুরীর কুঁজো শরীরটা যেন এক বিভীষিকার ভয়ে টলতে টলতে দেয়ালের কোণের দিকে হেলে পড়তে থাকে। কিন্তু সামলে নেন। দেয়াল ধ'রে কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকেন সুখময় চৌধুরী। রেবার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করেন : রতন তোরই সর্বনাশ করতে এসেছিল।

ভ্রূকুটি ক'রে তাকায় রেবা : তার মানে ?

সুখময় চৌধুরী তাঁর দাঁতের কাঁপুনি সামলাতে সামলাতে বলেন, তোকে নষ্ট করতে চেয়েছিল। তাই আমি ওকে মেরেছি।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেবা বলে, ঠিক করেছ।

—পুলিসকে এই কথা তুইও বলবি রেবা। সোজা স্পষ্ট ভাষায় কোন পরোয়া না ক'রে বলে দিবি।

রেবা। নিশ্চয়ই বলব।

এগিয়ে আসছে পুলিস। শক্ত হয়ে আর দেয়াল ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে সুখময় চৌধুরীর কুঁজো শরীর। হঠাৎ ছটফট ক'রে যেন দমবন্ধ গলাটা দীর্ণ ক'রে ফুটে ওঠে সুখময় চৌধুরীর এক ভয়ার্ত আবেদন : শুধু এ কথা বললে আমি পার পাব না রেবা। আর-একটু বাড়িয়ে বলতে হবে।

রেবা। কি বলতে হবে ব'লে দাও।

সুখময় চৌধুরীর ভীরু চোখের দৃষ্টিটা দপদপ করে : ওই ভয়ানক লোকটা তোকে নষ্ট ক'রেই দিয়েছে। জোর ক'রে, খুন করবার ভয় দেখিয়ে তোর শরীরের সব লজ্জা আর সম্মান একেবারে শেষ ক'রে দিয়েছে।

—তাই ব'লে দেব মামা। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে হাঁপাতে থাকে রেবা।

বারান্দার উপরে পুলিসের পায়ের শব্দ। সুখময় চৌধুরী বলেন, ওই ঘরের ভিতরে গিয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে থাক্ রেবা। শিগগির যা। মনে থাকে যেন, রতন তোর খোঁপা ভেঙে দিয়েছে, তোর গলা টিপে দম বন্ধ ক'রে দিয়েছে, তোর গায়ের শাড়ি লুটপাট ক'রে সরিয়ে দিয়েছে। তুই কত কেঁদেছিস, তবু রতন তোকে ছাড়ে নি।

স্বচক্ষে অনেক কিছুই দেখে নিল পুলিস, স্বকর্ণে অনেক কথা শুনে নিল। রেবা মজুমদারের সম্ভ্রমহারা সেই বিধ্বস্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আর সুখময় চৌধুরীর মুখের সেই করুণ বিলাপ শুনে খুবই ব্যথিত হ'ল পুলিস অফিসারের চক্ষু। এত বড় ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও যে কত বড় পশু হতে পারে, বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেলেন অফিসার। যেমন মামা সুখময় চৌধুরী, তেমনি ভাগনী রেবা মজুমদারের হাত বেশ স্বচ্ছন্দে সই ক'রে দিল স্টেটমেণ্টে, এক মুহূর্তের জন্যও হাত কাঁপে নি।

কিন্তু মরে নি বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে রতন গাঙ্গুলী। কপালের আঘাত এমন কিছু সাংঘাতিক হয় নি। ক'দিন পরে জখম সেরে যাবার পরেও হাসপাতাল থেকে সোজা পুলিস-হাজতে চ'লে গেল রতন। এত বড় পাপের মামলার আসামী ওই ছেলের জামিন হতে রাজী হন নি বিনোদ গাঙ্গুলী।

কী আশ্চর্য! আসামী অপরাধ অস্বীকার করল না। সব সাক্ষীর সাক্ষ্য দায়রা-জজের আদালতের সব প্রশ্নের সম্মুখে সত্য ব'লে প্রমাণিতও হ'ল। একটি কথা না ব'লে, একটুও বিচলিত না হয়ে, কোন আক্ষেপ প্রকাশ না ক'রে, চার বছরের সশ্রম কারাবাসের আদেশ বরণ ক'রে নিল রতন গাঙ্গুলী।

মামলার রায় বের হবার পর দশ দিনের মধ্যেই চারতলা বাড়ি বিক্রি ক'রে দিয়ে চ'লে গেলেন বিনোদ গাঙ্গুলী। কোথায় চ'লে গেলেন কে জানে?

কিন্তু সুখময় চৌধুরীর দোতলা বাড়িরও সব জানলা সব সময় বন্ধ। বাড়ির সামনের রাস্তার উপর যখন-তখন ছোট ছোট এক-একটা ভিড় জ'মে ওঠে। জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে জোড়া-জোড়া চোখের সতৃষ্ণ কৌতূহল। মামলার সেই বিচিত্র কাহিনীর নায়িকা যে থাকে এই বাড়িরই কোন একটি ঘরে!

এ কি হ'ল? একদিন যেন রেবা মজুমদারের মনটাই হঠাৎ-ঘুম-ভাঙা শিশুর মত চমকে জেগে ওঠে আর ভয় পেয়ে চারদিকে তাকায়। জানলাগুলো কি আর এই জীবনে খোলা যাবে না? ওই চোখগুলো পথের উপর থেকে স'রে যাবে কবে? জেলের চেয়েও বেশি বন্ধ এই ঘরের বাইরের আলোতে এই মুখ নিয়ে কি আর দাঁড়াতে পারা যাবে? রেবার বিলেতে পড়তে যাবার কথা নিয়ে রেবার সঙ্গে আর কোন আলোচনা কেন করে না মামা? হঠাৎ এই রকম কঠিন একটা অসুখে পড়লো কেন, এবং হঠাৎ আবার পুরোহিত ডেকে প্রায়শ্চিত্ত করে কেন মামা?

মামার কাছে এসে আর-একবার আবদার করে রেবা : এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে নতুন একটা বাড়ি কিনে ফেলো মামা।

কোন উত্তর দেন না সুখময় চৌধুরী। এবং তারপর আর ক'টাই বা দিন? সুখময় চৌধুরীর হুইস্কিলোভী মুখ চিরকালের মত নিরুত্তর হয়ে যাবার পর এবং আরও কয়েকটা দিনের বর্ষার ঘোর কেটে যাবার পর হঠাৎ এক সন্ধ্যায় পুজোর ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে মামী বলেন, সেদিন তুই কি যেন জানতে চেয়েছিলি রেবা?

রেবা বলে, মারা যাবার কদিন আগে মামা প্রায়শ্চিত্ত করলো কেন?

—তা হ'লে শুনবি সব?

—সবই শুনব মামীমা।

মামীমা সবই বলেন, এবং সবই শোনে রেবা। রেবার চোখ দুটো পাথরের চোখের মত স্তব্ধ হয়ে থাকে। জোরে নিঃশ্বাস টানতে গিয়ে যেন একটা জ্বালা গিলে ফেলে রেবা। ছটফট ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে রেবা, তুমি কি অদ্ভুত কথা বলছ মামীমা!

মামী বলেন, হ্যাঁ রে মেয়ে, আমি যে শেষে তোর মামার মুখ থেকে সবই জানতে পেরেছি।

বন্ধজানলা ঘরের ভিতর হাঁসফাঁস ক'রে দিনগুলিকে আর খুব বেশিদিন সহ্য করতে হয় নি রেবার। কাশী চ'লে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন মামী, এবং যাবার আগে রেবাকে লুধিয়ানায় মেসোমশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেবার সময় একটি কথা বললেন, এখান থেকে তোর এখন অনেক দূরে স'রে গিয়ে থাকাই ভাল রেবা, বাঁচতে যদি চাস।

লুধিয়ানা রওনা হবার সময় মামীকে প্রণাম করতেই রেবাকে আর-একটা কথা বলেছিলেন মামী, পারিস যদি তুইও একটা স্বস্ত্যয়ন করিস রেবা।

আট বছর আগের সেই ঘটনার জ্বালা কি সত্যিই আজ স্বস্ত্যয়ন খুঁজছে? আমলকি-বনের হাওয়া জানলার পর্দা উড়িয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে রেবার নেট-জড়ানো খোঁপার উপর ফুরফুর করে। চোখের পাতায় কেমন একটা ঠাণ্ডার শিহর, হাওয়া লাগলে বাসী চোখের জল যেমন স্নিগ্ধ হয়ে সিরসির করে। আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায় রেবা।

এন চক্রবর্তী বলেন, ব'সে ব'সেই অনেকক্ষণ বেশ তো ঝিমোলে স্বস্তি।

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বেশ ভাল ক'রে ঝিমিয়েছে রেবা। খানসামা এসে কখন

খাবার দিয়ে চ'লে গিয়েছে, তাও টের পায় নি রেবা। সত্যিই, একটা স্বপ্নের পাল্লায় প'ড়ে মনটা যেন কোথায় চ'লে গিয়েছিল!

এন চক্রবর্তীর খাওয়া হয়ে গিয়েছে। একটা বাজলে খাবার খেতে আর এক মিনিটও দেরি করেন না এন চক্রবর্তী, তাঁর দশ বছরের অভ্যাসের রুটিন। কিন্তু রেবা শুধু খাবারগুলোকে ছোঁয়াছুঁয়ি ক'রে সামান্য একটু খেয়ে ব্যস্তভাবে হাত ধুয়ে ফেলে।

রেবা যদি শপথ ক'রে স্বামীর কাছে বলে যে, সেই কাহিনী হ'ল এক স্নেহশীল মামাকে ফাঁসির মরণ থেকে বাঁচাবার জন্য এক আদুরে ভাগনীর কতগুলি ভয়ানক মিথ্যা কথার কাহিনী, তা হ'লে? আদালতের সেই বিশ্বাসগুলি মিথ্যা, আর স্বস্তিকার এই কথাগুলিই শুধু সত্য, এতটা বিশ্বাস করবার মত কোন মোহ এখনো ঘনিয়ে ওঠে নি জলন্ধরের সার্জনের মনে, স্বস্তিকার মুখ দেখে যতই মুগ্ধ হোক না কেন তার চোখ। তবু ভয় করবার কিছু নেই। শুনে হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই করুণা করবেন স্বামী এন চক্রবর্তী। মনে করবেন, শুধু আট বছর আগে একটা ক্ষ্যাপা কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছিল স্বস্তিকার শরীরটা। নিগৃহীতা নারীর মনের বেদনাগুলি কল্পনা করতেও পারবেন। স্বস্তিকাকে তেমনি আগ্রহে বুকের কাছে টেনে আপন ক'রে ধ'রে রাখবেন। মিথ্যাই সারা সকালটা শুধু একটা মিথ্যা ভয়ে নিজেকে আতঙ্কিত করেছে, আর মাথাধরার জ্বালা সহ্য করছে রেবা।

আর ভয় নয়, কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন নতুন রকমের একটা ছটফটানি সহ্য করবার চেষ্টা করে রেবা। রেবার মনেরই ভিতরে কি যেন কিসের একটা ব্যস্ততা জেগে উঠেছে। দু-চোখের চাঞ্চল্যের মধ্যে যেন একটা ইচ্ছার বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে ঝিক ক'রে চমকে ওঠে। কি যেন বুঝতে চায় রেবার মন, কিসের একটা সন্দেহকে যেন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে চায় রেবা।

এন চক্রবর্তী চেয়ারের উপরেই ঘাড় কাত ক'রে চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন। রেবা বলে, তোমাকে অনেকক্ষণ ঘরের ভেতর আটক ক'রে রেখেছি ব'লে রাগ কর নি তো?

এন চক্রবর্তী চোখ বড় ক'রে তাকিয়ে আশ্চর্য হন: রাগের কোন প্রমাণ পেয়েছ নাকি?

হেসে হেসে মিনতিমাখা স্বরে রেবা বলে, যাও, বাইরে গিয়ে একটু ব'স লক্ষ্মীটি। তোমাকে এখানে অনেকক্ষণ মিছিমিছি বসিয়ে রেখে কষ্ট দিয়েছি।

এন চক্রবর্তী। আঃ, বলছি কোন কষ্ট হয় নি।

রেবা আবার হাসে : কিন্তু ভাবতে আমার মনে কষ্ট হচ্ছে যে! অন্তত আমার মনের বাতিককে খুশী করবার জন্যে এই বারান্দাতেই কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে তারপর চ'লে এস।

পাইপ ধরিয়ে ঘরের বাইরে বারান্দার উপর এদিক থেকে ওদিকে আস্তে আস্তে হেঁটে আর শিস দিয়ে আনাগোনা করেন এন চক্রবর্তী, রেবা যেন তার কল্পনা থেকে কুড়োনো এক সুন্দর বিশ্বাসকে এক পরীক্ষার কাছে ইচ্ছা ক'রেই পাঠিয়েছে। ওই তো, উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে রেবা, পাশের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছে রেবার স্বামী। এই তো রতনের সুযোগ। তবু চুপ ক'রে ঘরের ভিতরে কেন ব'সে আছে রতন? এখুনি ছুটে বের হয়ে রেবার স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ব'লে দিচ্ছে না কেন, স্বস্তিকা নামে এই নারী হ'ল পরপুরুষের লালসায় লাঞ্ছিত রেবা মজুমদার নামে এক নারী।

ঘরের ভিতরে ফিরে আসেন এন চক্রবর্তী। রেবার দুই চোখের তারায় অদ্ভুত এক কৌতূহলের উল্লাস জ্বলজ্বল করে : দেখা হ'ল ওঁর সঙ্গে?

—কার সঙ্গে?

—এই যে, যিনি এই পাশের ঘরেই রয়েছেন, টিম্বার মার্চেন্টের সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—কি বললেন ভদ্রলোক?

—ভদ্রলোক না অদ্ভুত লোক। কথা বলা দূরে থাক্, ভদ্রলোক একবার তাকালেনও না।

বাস্, আর কোন প্রশ্ন করবার দরকার নেই। যা সন্দেহ করেছিল রেবা, তাই সত্য হয়েছে। যে বিশ্বাস মনের মধ্যে পাওয়ার জন্য ছটফট করছিল, সেই বিশ্বাস এতক্ষণে পেয়ে গেল রেবা। রেবার স্বামীর কাছে নয়, রেবারই কাছে এসে কথা বলবার অপেক্ষায় আছে আর সুযোগ খুঁজছে রতন। এন চক্রবর্তীকে নয়, স্বস্তিকা চক্রবর্তীকেই একবার একা পেতে চায় রতন। বুঝতে পারে রেবা, পাশের ঘরে এখন নীরব হয়ে ব'সে রয়েছে যেন একটা প্রবল অভিমান। রাগ নয়, প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞাও নয়। রেবার সেই হিংস্র মিথ্যার আঘাতে ক্ষতাক্ত হয়েছে যার জীবনের সম্মান, সেই মানুষ আজও শুধু রেবারই কাছে এসে প্রশ্ন করতে চায় : তুমি আমার জীবনের উপর এতখানি বিষ ঢেলে দিলে কেন? কোন্ অপরাধে? তোমাকেই সুখে রাখবার জন্যে চোর

হয়েছিলাম ব'লে? তোমার সুন্দর মুখের মায়ায় বড় বেশি লুব্ধ হয়েছিলাম ব'লে?

আসুক, সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারবে রেবা। শুনে যাক রতন, সেই মিথ্যা কথাগুলি রেবার মিথ্যা কথা নয়। জেনে যাক রতন, তার মত মানুষের চোখের আশাকে একদিন ঘৃণা করেছিল ব'লে আজও রেবা তার নিঃশ্বাস দিয়ে একটা জ্বালাকে চুপ ক'রে বুকের ভিতরে গিলে গিলে শান্ত হতে চেষ্টা করে।

কোন সন্দেহ নেই, এক সুযোগে হঠাৎ ঘরের ভিতরে এসে একলা রেবার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রতনের মনের অভিমান ওই কয়েকটা প্রশ্ন করতে চায়। প্রশ্ন করতে কতক্ষণই বা সময় লাগবে? আধ মিনিটের বেশি নয়। উত্তর দিতে রেবারই বা কতটুকু সময় লাগবে? আধ মিনিটের বেশি নয়। ভালই হবে, এক মিনিটের মধ্যে আট বছরের পুরনো একটা অশান্ত ক্ষোভ মিটে যাবে। রেবার কথা শুনে রেবাকে ক্ষমা ক'রে আর সুখী হয়ে চ'লে যাবে রতন, রেবার মনের জ্বালাও মিটে যাবে।

বিকালের চা দিয়ে যায় খানসামা। চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ান এন চক্রবর্তী। রেবা প্রশ্ন করে, যাচ্ছ কোথায়?

এন চক্রবর্তী। যাই, লনের ওপর একটু বেড়িয়ে বেড়িয়ে চা খেতে ইচ্ছে করছে।

চ'লে যান এন চক্রবর্তী। এই ঘরের ভিতরে আসবার সুযোগ এইবার পেয়েছে রতন। অদ্ভুত একটা ছায়া-ছায়া হাসির আভা যেন হঠাৎ শিউরে উঠেছে রেবার ঠোঁটের উপর। রেবা তার ইচ্ছার ভাগ্যটা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। ব্যস্তভাবে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে পাউডারের কৌটা খুলে ফেলে রেবা। মিরারের সামনে দাঁড়ায়। ডান গালের নীচটায়, কপালের বাঁ দিকটায়, আর ঘাড়ের চারদিকে একটু পাউডার দরকার। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে মুখের উপর এখানে-ওখানে পাউডারের পাফ বুলিয়ে নেয় রেবা।

বারান্দায় পায়ের চলার শব্দ শোনা যায়। হরিণের চামড়ার চটি মৃদু শব্দ ক'রে আনাগোনা করছে। রেবার বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করে। কিন্তু তবু মুখটাকে হাসিয়ে নিয়ে মনটাকে প্রস্তুত ক'রে রাখে রেবা। রতন এসে হঠাৎ ঘরে ঢুকলে বোকার মত ভয়ে চমকে উঠবে না রেবা।

এক মিনিট, দু' মিনিট, তিন মিনিট। ঘরের ভিতর এসে একলা রেবার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটি কথা বলে চ'লে যাবার সুযোগ অনেকক্ষণ ধ'রে তো পেয়েই যাচ্ছে রতন, কিন্তু তবু আসে না কেন?

হঠাৎ একটা সন্দেহ চমকে ওঠে রেবার মনে। এবং সেই সন্দেহে ধীরে ধীরে বিহ্বল হয়ে উঠতে থাকে রেবার সুন্দর চোখের আনমনা আর অপলক দৃষ্টি।

এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে রেবা, কিসের অভিমান এবং কেমন অভিমান রেবার এই ঘরের পাশেই এখন কি আশা ক'রে ব'সে আছে। আমলকি-বনের হাওয়া বড় বেশি ফুরফুর করে রেবার নেট-জড়ানো খোঁপার চারদিকে। এক মিনিট বা দু' মিনিটের সুযোগ পাওয়ার জন্য কোন লোভ নেই ওই অভিমানের মনে। রতনের মনের ইচ্ছার গুঞ্জন যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে রেবার দুই কান। অবাধে, অনেকক্ষণ ধ'রে, দু' চোখের দৃষ্টিতে যত খুশি তত লোভ মায়া আর মুগ্ধতা নিয়ে তাকাবার জন্য রতন আজ তার সেই রেবা মজুমদারের সুন্দর মুখটাকে চোখের সামনে পেতে চায়।

শিস দিতে দিতে ঘরের ভিতর ঢোকেন এন চক্রবর্তী। রেবা বলে, আচ্ছা, যদি তুমি এখুনি গিরিডি রওনা হও, তবে লেফটেন্যাণ্ট জয়সোয়ালের বিয়ে দেখে তোমার ফিরে আসতে কতক্ষণ সময় লাগবে ?

এন চক্রবর্তী বলেন, কত আর সময় লাগবে ? চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি নয়। রাত দশটার মধ্যেই ফিরে আসতে পারব।

রেবা। তাই বল! মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টা! তা হ'লে যাও, ঘুরে এস।

এন চক্রবর্তী। আর দরকার নেই গিয়ে। আমার এমন কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয় জয়সোয়াল যে ওর বিয়েতে যেতেই হবে।

রেবা। না না, যাওয়াই ভাল। যতই কম ঘনিষ্ঠ বন্ধু হোক না কেন, ভদ্রলোক যখন তাঁর বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছেন, তখন যাওয়াই উচিত।

এন চক্রবর্তী নতুন টাই হাতে তুলে নিয়ে গলায় জড়াতে থাকেন : তা হ'লে যেতেই বলছ তুমি ?

রেবা। এস। আমি এই চার-পাঁচ ঘণ্টা গলা ছেড়ে পাঞ্জাবী গজল চেঁচিয়েই পার ক'রে দিতে পারব।

এন চক্রবর্তীর টুরার কাঁকর-ছড়ানো গিরিডি রোডের ধুলো উড়িয়ে চ'লে যায়। সন্ধ্যা হয়ে আসে। রেবার একলা ঘরের দেয়ালের গায়ে আলো ঝুলিয়ে দিয়ে চ'লে যায় খানসামা।

তাড়াতাড়ি ক'রে সাজতে গিয়েও বেশ একটু দেরি ক'রে ফেলল রেবা। সবুজ রঙের শাড়িটা যখন প্রায় অর্ধেক পরা হয়ে গিয়েছে, তখন হাত থামিয়ে

কি যেন ভাবে রেবা। না, রাতের আলোয় এই সবুজকে নিতান্তই কালো দেখাবে। অন্য রঙের শাড়ি বাছে রেবা। সাজ শেষ হবার পরেও মিরারের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। রেবার কপালটার গড়নে বেশ একটু খুঁত আছে, দু' পাশে কেমন যেন চাপা-চাপা ভাব। এই খুঁত নিশ্চয়ই রতনের চোখে পড়ে নি কোনদিন। কাছে এসে রেবার সুন্দর মুখের দিকে তাকাবার সুযোগ জীবনে কোনদিন পায় নি তো রতন। শুধু দূর থেকেই দেখেছে। কিন্তু আজ যে রেবার কপালের এই খুঁত রতনের চোখে ধরা প'ড়ে যাবে। খুঁতটা ঢাকা দেবার জন্য কানের দু পাশে হাত রেখে খোঁপা চাপে রেবা।

ঘরের দরজা খুলে দিয়েছে রেবা। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বারান্দার উপর, যেন রেবার বিহ্বল মনের প্রতীক্ষাটাই পথের উপর আঁচল পেতে দিয়েছে। চেয়ারের উপর ব'সে হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে রেবা। সোনার চেন দিয়ে কব্জি জড়িয়ে বাঁধা ছোট্ট হাতঘড়ি। চলছে ব'লেই তো মনে হয়। কানের কাছে তুলে নিয়ে হাতঘড়ির শব্দ শোনে রেবা।

সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি নির্জনতা কি আর কোথাও আছে? কোটি কোটি লোকচক্ষুর নাগাল থেকে ছিন্ন-করা এমন একটি নিভৃত?

বুঝতে পেরেছে রেবা, শুধু রেবার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই ত সুখী না ওই অভিমানের মন। হতে পারে না। ওর চোখে যে বড় দুরন্ত একটা পিপাসা ছিল।

এসেই যদি হাত ধরে? যদি আদর ক'রে আস্তে আস্তে বুকের কাছে টেনে নেয়? যদি রেবার এই সাজানো দেহের উপর সব পিপাসা ঢেলে দেয় রতন?

ছটফট ক'রে একটা হাত তুলে কপাল টিপে ধরে রেবা। রেবাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সব চেয়ে বেশি সুখী হবার সব চেয়ে বেশি অধিকার যে ওরই ছিল।

পাশের ঘরে এলোমেলো শব্দ উসখুস করে। দরজা খোলার শব্দ শোনা যায়। বারান্দার দিকে তাকিয়ে হেঁটমুখ হয়ে ব'সে থাকলেও বুঝতে পারে রেবা, রতনের ছায়ার চঞ্চলতা এই ঘরের দরজার বড় কাছাকাছি এসে আবার চ'লে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের ওদিকের খাটের উপর এসে ব'সে থাকে রেবা। দুরুদুরু বুকের যত মিথ্যা ভয়ের শিহরগুলিকে দু' হাতে আঁকড়ে ধ'রে চুপ করিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। ভয় করবার কি আছে? ওই মানুষকে কি ভয় করতে আছে? ও যে ভয়াল হতেই জানে না।

আসতে বড় দেরি করছে। আসে না কেন রতন? রেবাকে আদর করবার আর ইচ্ছামত সুখী হবার এমন অবাধ সুযোগ আর কবে পাবে রতন? রেবার বিহ্বল চোখের প্রতীক্ষার মধ্যে বেশ একটু অভিমানের ছায়াও ফুটে ওঠে।

সন্ধ্যা ফুরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। রাতের অন্ধকারে একেবারে ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে পরেশনাথ। আমলকি-বনের ফুরফুরে হাওয়াই বা কোথায় চ'লে গেল? শুধু মৃদু ঝড়ের শব্দ ছড়ায় শিশু আর সেগুনের ভিড়।

ছলছল করতে থাকে রেবার চোখ। আর-একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে রেবার মনে, এবং এইবার বুঝতে পেরেছে রেবা, এতক্ষণ ধ'রে রতনের আশা আর ইচ্ছাকে বুঝতে খুবই ভুল হয়েছে রেবার।

কাঠের বাঘ রাগ করে না, কিন্তু মাটির মানুষও অপমানিত হ'লে বোধ হয় রাগ না ক'রে পারে না। তবে বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে, অমন কুস্তি-করা হট্টাকট্টা একটা মানুষ, সেই রতন গাঙ্গুলীই বা কেমন ক'রে সেই অপমানের জ্বালা ভুলে যাবে? যে মেয়েকে এত ভালবেসেছিল আর উপকার করেছিল রতন, সেই মেয়েই রতনের জীবনের বুকে এক মিথ্যা অপবাদের ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। সেই মিথ্যা অপবাদকেই বর্ণে বর্ণে সত্য ক'রে দিয়ে চ'লে যাবার সুযোগ খুঁজছে রতন। এই রকমই একটি প্রতিশোধ না নিলে কেমন ক'রে তৃপ্ত হবে রতনের মত মানুষ, পুরুষের মত পুরুষ।

তবে কি ডাকাতের মত হঠাৎ এসে গলা টিপে ধরতে চায়? একটা অসহায় শরীরকে, একটা অনিচ্ছাকে, কতগুলি আর্তনাদকে, এক জোড়া চোখের সজল কান্নাকে, আর সাজসজ্জার সব লজ্জালুতাকে লুটপাট ক'রে সরিয়ে দিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হতে চায় ওই প্রচণ্ড অভিলাষ? চায় বইকি, নইলে শান্ত হতে পারে না রতন গাঙ্গুলীর আট বছরের অশান্ত আত্মার ক্ষোভ।

আজ আর পুলিস আসবে না; সেদিনের সেই মিথ্যা এজাহারের কাহিনীটাকে শুধু আর-একবার অভিনয় করতে হবে! শুধু ইচ্ছা ক'রে একটা অনিচ্ছার ছলনা হয়ে যেতে হবে। অসহায়ের মত আর্তনাদ ক'রে আর চোখের জল ফেলে রতন গাঙ্গুলীর দস্যুতা বরণ ক'রে নিতে হবে। ওর ক্ষমাহীন প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞাকে সুখী ক'রে দিতে হবে। রতনের উগ্র চক্ষুর দিকে নকল জ্বালায় জ্বলন্ত দুই চক্ষুর দৃষ্টি হেনে মনে মনে হেসে উঠবে রেবা।

আসুক তা হ'লে। বিছানার উপর লুটিয়ে শুয়ে পড়ে রেবা, এবং শোয়া মাত্র একেবারে অসহায় হয়ে যায় রেবার দেহটা। মনে হয়, এখুনি ঘুমে জড়িয়ে

যাবে চোখের পাতা। বুঝতে পারবে না রেবা, কখন রতন এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে রেবার ঘুমন্ত অসহায় ও একলা প'ড়ে থাকা এই সাজানো রাঙানো সুন্দর মূর্তিটার উপর ক্ষুধার্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হয়েছে।

ছিঃ, নিজেরই উপর রাগ ক'রে উঠে বসে রেবা! রতনের মত মানুষের মনকে বুঝতে গিয়ে এত ছোট মন নিয়ে এসব কি ছাই আবোল-তাবোল চিন্তা করছে রেবা! এভাবে রেবার কাছে আসবার মানুষ নয় রতন। রেবার মনটা যেন এতক্ষণ পাগলামি ক'রে রতনের মনের একটা অত্যন্ত সহজ সরল ও স্বাভাবিক ইচ্ছাকেই বুঝতে পারছিল না!

রেবার কাছে আসবার জন্য যতই ব্যাকুল হয়ে উঠুক না কেন রতনের মন, তবু আসবে কেন রতন, কোন্ সাহসে, রেবা যদি নিজে গিয়ে হাত ধ'রে না নিয়ে আসে?

এতক্ষণে রেবার সারা মুখের উপর হাসিভরা বিহ্বলতা একেবারে উচ্ছল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই হ'ল রতনের আশা! হাত ধ'রে ডেকে নিয়ে না এলে রেবাকে আর বিশ্বাস করা যায় না! বেশ তো, তাই হোক। তোমাকে হাত ধ'রে ডেকে আনতে পারলে যে আমাকেও নিঃশ্বাস দিয়ে সেই জ্বালা আর গিলতে হবে না কোনদিন।

আসছি আমি।—মনে মনে বলতে গিয়ে মুখ ফুটে প্রায় ব'লেই ফেলেছিল রেবা। বিছানা থেকে এক লাফ দিয়ে উঠে নেট-জড়ানো খোঁপাটাকে চটপট দুটো গুঁতো দিয়ে ছাঁদে বসিয়ে দেয়। তারপর আর-এক মুহূর্তও দেরি করে না রেবা। ঘরের দরজা পার হয়ে বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায়। মুখচোরা অথচ প্রাণঢালা এক ভালবাসার আট বছরের অভিমান ভেঙে দেবার জন্য রেবার মুখেও যেন একটা দুষ্টু হাসির প্রতিজ্ঞা মিটমিট করে। রতনের ঘরের দিকে তাকায় রেবা।

দুই চোখ দুই হাতে ঢেকে ডুকরে চেঁচিয়ে ওঠে রেবা : খানসামা!

রতনের ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধ তালা ঝুলছে দরজার কড়াতে। নেই, টিম্বার মার্চেণ্ট পরিতোষ গাঙ্গুলীর নাম লেখা সেই কার্ড আর নেই। কখন কোন্ ঝড়ের হাওয়ায় উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ওই কার্ড?

প্রায় দৌড়ে দৌড়ে চলতে থাকে রেবা। বারান্দা পার হয়ে ঘাসভরা লনের উপর নেমে, দূরের কিচেনের সেই কেরোসিনের আলোর দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে রেবা—খানসামা!

ছুটে আসে খানসামা : কি হুকুম মেমসাব ?

—আমার পাশের ঘরের সেই বাবু কোথায় ?

—গাঙ্গুলীবাবু ?

—হ্যাঁ।

—এই তো থোড়া আগে চলিয়া গেলেন বাবু।

কি ভয়ংকর মানুষ! কি ভয়ানক প্রতিশোধ নিতে জানে লোকটা! রেবার বুকের গভীর থেকে উথলে-পড়া উৎসবের মত এত বড় ইচ্ছাটাকে যেন থেঁতলে দিয়ে, আছাড় মেরে আর চূর্ণ ক'রে পালিয়ে গেল লোকটা! আজ ওর কপালে বোতল ছুঁড়ে মারবার কেউ নেই। পুলিস নেই, হাজত নেই, জেল নেই।

আস্তে আস্তে বারান্দার বাতাস ঠেলে ঠেলে ঘরের দিকে চ'লে যায় রেবা। সারা গায়ে যেন দুঃসহ এক অপমানের কামড় লেগে রয়েছে। অনিচ্ছার উপর দস্যুতা করলে অপমানের যে জ্বালা লাগে মনে, সে জ্বালা কি এই জ্বালার চেয়ে বেশি দুঃসহ !

ঘরের ভিতরে ঢুকে চেয়ারের উপর সুস্থির হয়ে ব'সে থাকতে চেষ্টা করে রেবা। কিন্তু পারে না। রতনের আজকের এই সত্যিকারের দস্যুতাকে যে অপরাধ ব'লেই মনে করে না পৃথিবীর শাস্ত্র। কোন্ পুলিসের কাছে এজাহার দেবে রেবা ?

রেবার নিজেরই হাত দুটো যেন থেকে থেকে পাগল হয়ে উঠতে চাইছে। খোঁপা ভেঙে দিয়ে, গলা টিপে দম বন্ধ ক'রে দিয়ে পটপট ক'রে এক টানে এই শাড়ি আর ব্লাউজের সব লজ্জালুতা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রেবাকে পৃথিবীর এই নিভৃতে আট বছর আগের একটা এজাহার ক'রে মাটির উপরে লুটিয়ে দিতে চায়।

চেয়ার থেকে উঠে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে রেবা। বালিশের উপর ভেজা চোখ ঘ'ষে ঘ'ষে, আর জ্বালাভরা শরীরটাকে নিয়ে লুটোপুটি করতে করতে যখন ক্লান্ত হয় রেবা, তখন আমলকি-বনের হাওয়া আবার নতুন ক'রে রাতের বুক ঠাণ্ডা করতে আরম্ভ করেছে।

রাত দশটার কয়েক মিনিট আগেই গিরিডি থেকে ফিরে এলেন এন চক্রবর্তী। টুরারের হর্নের শব্দেও ঘুম ভাঙে না রেবার।

দরজা খোলা। ঘরে আলো। তবু বিছানার উপর এরকম অদ্ভুতভাবে

ঘুমিয়ে প'ড়ে আছে কেন স্বস্তি? এ কি ছিরি? খোঁপাটা যেন নেট ছিঁড়ে ভেঙে পড়েছে, এলোমেলো কতগুলি চুলের কুণ্ডলী ছড়িয়ে রয়েছে বালিশের পাশে! শাড়িটার প্রায় সবটাই যে বিছানা বেয়ে মেঝের উপর ঝুলে লুটিয়ে রয়েছে। অমন সুন্দর চেহারাটাই যেন এই বিশ্রী ঘুমের ঘোরে বিধ্বস্ত হয়ে একটা লাশের মত প'ড়ে রয়েছে। এরকম ক'রেও মানুষ ঘুমোয়?

স্বস্তি!—বেশ জোরে চেঁচিয়ে ডাক দেন এন চক্রবর্তী।

ধড়ফড় ক'রে উঠে বসে স্বস্তিকা।

এন চক্রবর্তী হাসেন : এ কি?

স্বস্তিকা। কি?

এন চক্রবর্তী। মনে হচ্ছে, যেন একটা বাঘে তোমাকে খেয়ে চলে গিয়েছে।

স্বস্তিকা। খেয়ে গেল আর কোথায়? খেলে তো ভালই হ'ত।

এন চক্রবর্তী। কি বললে? কি ভাল হ'ত?

স্বস্তিকা হেসে ফেলে : তোমার তা হ'লে আবার একটা বিয়ে করতে হ'ত।

কুসুমেষু

ম ঙ্গ ল গ্র হ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

. . . .

সেদিন বুঝলাম, আমাদের সংসার ছাড়াও সংসার আছে, আমাদের পৃথিবীর বাইরেও পৃথিবী আছে।

অহরহ শোক তাপ অভাব অনটন আধিব্যাধি অর্ধাঙ্গিনীর অব্যক্ত গুঞ্জন এবং আধ-ডজন অপোগণ্ডের দুড়দাড় মাতামাতি একদিন, একদিন অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে থেমে গিয়েছিলো। সবাই অবাক হ'য়ে দেখলো নতুন সেই গ্রহ।

আমরা ভাবতে পারিনি, আমি, আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা। যে-বাড়ির ইট সিমেণ্ট খ'সে পড়ছে, উঠতে-নামতে দুর্বল হৃদ্‌পিণ্ডের মতো সিঁড়িটা কাঁপে, ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ছে এখন-তখন, সেখানে হঠাৎ শাড়ি গয়নার ঝলক, সাবান পাউডার দামি সিগারেটের ঘি গরমমসলা মাংসের গন্ধ কেমন অদ্ভুত

লাগলো। আমাদের ঘরের টিকটিকিটা পর্যন্ত অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখছিলো প্যাসেজের ওপারে লাল আলোয় ভরা জানলাটার দিকে।

সন্ধ্যার দিকে বুঝি এসে উঠেছিলো। এরই মধ্যে জিনিসপত্র জায়গা-মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে ফিটফাট। কোনো ঝামেলা, কোনো ঝঞ্ঝাট, একটু শব্দ পর্যন্ত না।

রেশনের আটার সংক্ষিপ্ত ক'খানা রুটি গলাধঃকরণ ক'রে আস্তে-আস্তে আমার সন্তানেরা ঘুমিয়ে পড়লো। টারপিনের অভাবে কেরোসিন আর কর্পূরের এক রাসায়নিক মিশ্রণ তৈরি ক'রে গৃহিণী তখন দেয়ালে পিঠ রেখে মেঝেয় ব'সে পায়ে মালিশ করছে। আর আমি লাল-ফিতে-বাঁধা আপিসের ফাইল সামনে নিয়ে ব'সে কখনো ঢুলছি, হাত দিয়ে মশা তাড়াচ্ছি একেক বার। লাল, মঙ্গলগ্রহের মতো লাল স্তব্ধ সেই ঘরের দিকে চোখ পড়তে সত্যি আর চোখ ফেরাতে পারলাম না।

সস্তা বাড়িতে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা থাকে না। আমি কখনো মোমবাতি, কোনোদিন রেড়ির তেল দিয়ে কাজ সারি। কেরোসিন যা যোগাড় করি হেমলতার বাতের দৌলতে নিঃশেষ হ'য়ে যায়। তেমনি এ-বাড়ির অন্য সব ঘরে। কারো টিমটিমে, কারো-বা তা-ও না। কাজেই অন্ধকার এই জগতে এমন চমৎকার আলোয় টলটলে একটা ঘর যদি অনেক রাত অবধি জেগে থাকে সেদিকে চেয়ে আপনিও কি জেগে থাকবেন না! তাকিয়ে থেকে ভাববেন, এরা কারা। কেমন এই নতুন গ্রহের বাসিন্দারা। বুঝলাম হ্যাজাক জ্বলছে। আর ডোমটা শাদা না হ'য়ে লাল হওয়াতে ঘরটা যেন আরো সুন্দর রহস্যময় হ'য়ে উঠেছে। আমার চোখে পলক পড়লো না। মেয়েটি, মেয়ে কি মহিলা তখন ঠিক বুঝলাম না, জানলার কাছে দু-বার এলো। একবার একটা ডিশ নিয়ে গেলো, একবার এসেছিলো সস্‌প্যান নিতে। থমথমে যৌবন, বিশাল বিকশিত খোঁপা। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে আমি চুপ ক'রে দেখছিলাম। অনেক রাতে একটা লোক ঢুকেছিলো ঘরে রোগা টিংটিঙে টাই-স্যুট পরা। যেন অনেক হাঁটাহাঁটি ক'রে অনেক ক্লান্তি নিয়ে এখন এখানে তার আশ্রয়। সিগারেট টানলো ওই জানলার ধারে ব'সে আট-দশটা। দৃশ্যটা আর ভালো লাগছিলো না ব'লে শুয়ে পড়লাম। যেন লোকটা না হ'য়ে সেই মেয়েটি যদি আরো দু-একবার জানলায় আসতো, একটু দাঁড়াতো, ভালো লাগতো। শুয়ে-শুয়ে ভাবলাম, কালো-স্যুট-পরা মূর্তিটা চাঁদের কলঙ্কের মতো হুট্‌ ক'রে ওখানে এসে কেন জুটলো। বেশ তো ছিলো।

সকালে অবশ্য আমার সংসার আগে জাগে, তারপর পাশের ললিত নন্দীর ঘর, ফালু পালের। আমরা কেরানী, আমাদের আগে জাগতে হয়। এখন আমাদের সংসারে শব্দ বেশি, তাড়াহুড়া খুব। চিৎকার ক'রে ছেলে দুটো ইস্কুলের পড়া তৈরি করছে, প্রীতি বীথি অর্থাৎ আমার বড়ো দু-মেয়ে রান্নাবান্না করছে। অসাড় পা দুটো মেঝের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে হেমলতা চালের কাঁকর বাছচে। আড়চোখে ওদিকে চেয়ে দেখলাম প্যাসেজের ওপারে পার্টিশনের গায়ে হলদে রোদ এসে গেছে। কিন্তু সেখানে এখনো ঘুম। দরজাটা বন্ধ।

না, রাত্রে ওদের ঘরের উজ্জ্বল আলো আর আমাদের ঘরের রেড়ির বাতির বৈষম্যটা যতই চোখে লাগুক, যত উজ্জ্বল ও অদ্ভুত ঠেকুক না কেন, এখন, সকালে, যখন একই রকমের বিবর্ণ ধূসর কাকগুলোকে ওদের ছাতের কার্নিশে এবং আমার ঘরের কার্নিশেও ব'সে থাকতে দেখলাম তখন অনেকটা স্বস্তি পেলাম। হোক বড়োলোক—ভাবলাম—এক বাড়িতে যখন ঘর ভাড়া নিয়েছে তখন সেই শ্যাওলা-পড়া পুরোনো চৌবাচ্চার জলই মুখে দিতে হবে, পচা ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হবে। উপায় নেই। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর মনের ভাবটা হ'লো আমার। হঠাৎ যদি সচ্ছল সম্ভ্রান্ত কোনো যাত্রী এসে ওই কামরায় ঢোকে এবং একই বেঞ্চিতে আমার পাশে বসে তখন কি এই ভেবে উৎফুল্ল হবো না যে আমার অসুবিধাগুলি তোমাকেও ভোগ করতে হবে, বৈষম্যটা অন্তত এদিক দিয়ে থাকবে না। ধীরে-ধীরে আলাপ-পরিচয় যে না হবে তা-ই বা কে বলতে পারে এবং তাই তো স্বাভাবিক। নিমের দাঁতন নিয়ে দাঁত সাফ করার অছিলায় ওদিকের পার্টিশন-সংলগ্ন দরজাটার দিকে অনেকক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েছিলাম। যেন একটা কাজ পেয়েছি।

হঠাৎ পিছনে যেন কে এসে দাঁড়ালো।

'বাবা, স্নান করো, অফিসের বেলা হ'লো।'

চমকে উঠলাম। প্রীতি। রুষ্ট হ'য়ে উঠি।

'অফিসের বেলা হ'লো আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না?'

প্রীতি একটু অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। কেননা বেলা আটটা না বাজতে আমার তরফ থেকে রোজ রান্না নামানোর তাগিদ হয়, ওরা দু-বোন জানে। চুপ ক'রে ঘরে ঢুকলাম।

দেখি আমার বড়ো ছেলে মণ্টুর কাঁদো-কাঁদো চেহারা। রাগ আরো বেড়ে গেলো।

'কি হয়েছে শুনি ?'

'আমার জ্যামিতি পড়া তুমি আর বুঝিয়ে দিলে না বাবা।'

'অফিসের চরকায় তেল দিয়ে কূল পাই না, তোর পড়া দেখিয়ে দিই কখন।'

চুপ হ'য়ে গেলো মণ্টু। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খেতে বসি। ভাত দেয় ছোটো মেয়ে বীথি। বুঝি হাত থেকে চার-ছটা ভাত গড়িয়ে মাটিতে পড়েছে। রীতিমতো গর্জন ক'রে উঠলাম। 'একটু সাবধান হবি—অমন ক'রে জিনিস লোকসান ক'রে আমায় রাস্তায় বসাবি নাকি। যে-কোনো-দিন রেশন বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে।'

অধোমুখে বীথি সামনে থেকে স'রে গেলো। শাদা নিষ্প্রভ দুটো চোখ মেলে হেম আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, ওর মুখের দিকে না তাকিয়েও বেশ টের পাই। কর্পূর-কেরোসিনের গন্ধটাও যেন নতুন ক'রে নাকে এসে লাগে।

জামা কাপড় প'রে ধনেচাল চিবোতে-চিবোতে যখন বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, দেখি প্যাসেজের ও-পাশের দরজা খুলেছে। এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো। এবং ঘুম যে ভেঙেছে চোখেই দেখতে পেলাম। শুকনো খোঁপার আধখানা মুখ থুবড়ে ঘাড়ের ওপর পড়েছে। ভাঙাচোরা আঁচলের ঢেউ। শরতের কাঁচা রোদ গালে কানে পিঠে লেগেছে। মেয়েটি—মেয়ে কি মহিলা তখনো ধরা গেলো না—ওদিকের গলির দিকে মুখ ক'রে রেলিং ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। তাই মুখখানা ভালো দেখা হ'লো না।

অবশ্য বুঝলাম রাত্রে দু-বার যাকে জানলায় দেখেছিলাম। একবার এসে-ছিলো ডিশ নিতে, একবার এসে একটা সস্‌প্যান নিয়ে গেলো। যেন জানলার গায়ে ঠেকানো ছোটো একটা শেলফ্ বসানো হয়েছে ও-ধারে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে রাত্রের ছবিটা ভাবি।

রাস্তায়, এমনকি ট্র্যামের ভিড়ে দাঁড়িয়েও রৌদ্রে-দাঁড়ানো সেই মূর্তিটা মনে-মনে আঁকি। অফিসে লেজারের সামনে ব'সেও। তারপর সেই স্যুট-পরা আদমীর চেহারা যখন মনে পড়লো ভিতরটা কেমন ভার হ'য়ে গেলো। কাজে মন দিলাম।

বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি মণ্টুর হাতে চকোলেটের বাক্স, ফণ্টুর হাতে আপেল।

'কোথা পেলি এ-সব, কে দিলে ?' চোখ বড়ো হ'য়ে গেলো আমার।

প্রীতি পেয়েছে ব্লাউজের টুকরো, বীথি পেয়েছে শাড়ি।

'কে দিয়েছে শুনি না ?'

'লীলাদি,' বীথি বললে খুশি চোখে।

'খুব বড়োলোক,' প্রীতিও সামনে এলো। 'লীলাদির বর ইঞ্জিনিয়ার।'

আমার কাপড়-জামা বদলানো হ'লো না। হাত-মুখ ধোওয়া নেই। হাতে নিয়ে জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখছি। 'পাটনা থেকে এসেছে ছুটিতে,' বললে বীথি, 'ভালো বাড়ি পাওয়া গেলো না তাই এখানে।' বীথির মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকাতে যাবো এমন সময় দরজায় ছায়া পড়লো।

মেয়ে নয়, মহিলা।

খোঁপায় চওড়া কালো-পাড় আঁচল উঠেছে। জোড়া ভুরু ধনুকের মতো বাঁকা। তনু মধ্যম গড়ন। জীবনে এই আমি প্রথম দেখলাম পরিপূর্ণ যৌবন।

প্রীতি বীথি বাইশ উনিশে পা দিয়েছে। যৌবনের দেখা পায়নি ওদের শরীর। আর সেই বীথি যখন পেটে, কুড়ি বছর বয়স থেকেই হেমলতার বাত, তখন থেকে আজ অবধি দু-পায়ের ওপর সোজা হ'য়ে ও দাঁড়াতে পারেনি। আমার চোখ তখন মাটির দিকে, স্যাণ্ডেলের ফাঁকে, পায়ে আলতার ছোপ।

'এই অফিস থেকে ফিরলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ,' ঘাড় তুললাম, মুখখানা আবার দেখলাম। কপালে হাত ঠেকিয়ে মহিলা নমস্কার জানালে। আমিও।

'একটু কষ্ট করবেন,' চৌকাঠের গায়ে একটা হাত রাখলো লীলাময়ী, এক-পা বাড়ালো সামনে। 'ওকে দিয়ে তো কাজ হবে না, কলকাতায় এসেছে কেবল ঘুরতে। সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা ফুরোয় না।'

হেসে বললাম, 'বলুন, কিছু করতে হবে ?'

লীলাময়ী হাসলো লজ্জায়, নাকি চট্ ক'রে আমি রাজী হয়েছি ব'লে! 'একটু মাংস এনে দিতে হবে বাজার থেকে।'

'ও আবার একটা কাজ,' নুয়ে পড়েছিলাম, সটান সোজা হ'য়ে দাঁড়ালাম। 'এখুনি এনে দিচ্ছি।'

চোখে ঠোঁটে হাসির ঝলক লেগে আছে তখনো। লীলাময়ী হাত বাড়িয়ে একটা দশ টাকার নোট দিলে।

'দু-বার ভেবেছি আপনাকে বলবো কিনা, আমার তো আর লোকজন নেই।'

'ভ্যাখো কথা,' হেসে বললাম, 'এতে লজ্জার কি আছে, তবে আর এক-

বাড়িতে থাকা কেন।' ব'লে প্রীতির চোখের দিকে তাকালাম। ও অন্যদিকে চোখ সরিয়েছে। বীথি নেই আর সেখানে।

'আপনার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে,' লীলাময়ী বললো,'আমাদের বউদি বুঝি ইন্‌ভ্যালিড?'

কৃতার্থের হাসি হেসে চৌকাঠ পার হ'য়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। আমার পিছনে ও সিঁড়ি অবধি এলো।

'নতুন জায়গায় এসে উঠলে কত কি দরকার, ওর তো কোনোদিকে মনোযোগ নেই, কী মুশকিলে না পড়েছি আমি।'

'আ, কেন আপনি মন খারাপ করছেন।' নির্জন সিঁড়ি পেয়ে আমার গলা আরো ঝরঝরে হ'য়ে গেলো। 'যখন যা দরকার বলবেন, এটুকুন উপকার যদি না করলুম তবে আর একত্র বসবাস কেন।' নিবিড় পরিচ্ছন্ন যৌবনের সামনে দাঁড়িয়ে আমার শুকনো বুকের ভিতরটা কাঁপছিলো। চোখে পলক পড়লো না।

'বেশ কচি পাঁঠার মাংস হয় যেন।'

'তা আর বলতে হবে না।' লম্বা পা ফেলে বাজারের দিকে ছুটলাম।

এই লীলাদি। লীলাময়ী বা লীলাবতীও হ'তে পারে। আমার যেন লীলাময়ী মনঃপূত হ'লো। একদিনে এতটা অগ্রসর, এ যেন স্বপ্নের অতীত। না, এমন পরিষ্কার স্বচ্ছ চোখে কোনো নারী আমার দিকে তাকায়নি, এমন সুন্দর সহজ গলায় কথা বলেনি। আমার যৌবনের বা কেরানী-জীবনের ইতিহাসে তার চিহ্ন নেই। আমার নিজের মেয়ে তো প্রীতি বীথি। বলতে পারো বয়স হয়েছে; আজো পাত্রস্থ করা হয়নি ব'লে মন ভার, মুখ ভার। কিন্তু ভালো ক'রে বাপের সঙ্গে দুটো কথা বলতে আপত্তি কি। ভয়ে চোখে-চোখে তাকায় না, যেন আমি দানো, খেয়ে ফেলবো কি গিলে ফেলবো। সুন্দর চোখের কথা না-হয় না-ই বললাম। আর তাকাবে কে? হেমলতা? মরা মাছের মতো শাদা ফ্যাকাশে চোখ দুটো মেলে ও আমার দিকে তাকায় ঠিক বলা চলে না, কোনোমতে জেগে থাকে। নিচে কলতলায় ললিত নন্দীর বউ-এর সঙ্গে একদিন চোখাচোখি হয়েছিলো, হয়েছিলো মানে হবার উপক্রম হচ্ছিলো, সাত হাত এক ঘোমটা টেনে হাতের শূন্য বালতি চৌবাচ্চার ধারে রেখে স'রে গেছে আমাকে কল ছেড়ে দিয়ে। ফালুর জেনানাকে আমি কলতলায় দূরে থাক, কোনোদিন জানলায় আসতেও দেখলাম না। আর তাকাবে কে? ট্র্যামে-

বাসে? পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের কোনো কেরানীর দিকে কেউ কি কখনো তাকায়?

পাঁচ-সাতটা দোকানে ঘোরাঘুরি ক'রে কচি ও তাজা পাঁঠার মাংস যোগাড় ক'রে বাড়ির দিকে চললাম। ভাবছি তখন, ভাবতে-ভাবতে চলেছি। কথাটা কানে লেগে আছে: ওর কোনোদিকে মনোযোগ নেই। মনোযোগ যে নেই কাল রাত্রে দূর থেকে একবার দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ফিরিঙ্গি ছোঁড়াদের মতো বাউণ্ডুলে চেহারা। আট-দশটা সিগারেটই শেষ করলো জানলায় দাঁড়িয়ে। হাওয়া-খোর।

সিঁড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। আমার অন্ধকার ঘর। বুঝলাম আজ মোম, রেড়ি কোনোটাই যোগাড় হয়নি। যদি-বা কিছু সঞ্চিত থাকে আমার অপেক্ষায় রেখে দেওয়া হয়েছে। তেমনি ফালুর ঘর অন্ধকার। ললিতের ঘরে টিম্‌টিমে কি-একটা জ্বলছে যেন। না-থাকার শামিল। কেবল একটি জানলায় তীব্র উচ্ছ্বসিত আলোর বন্যা। সত্যি যেন আমাদের ঘরের পাশে নতুন এক গ্রহ এসে বাসা বেঁধেছে।

প্যাসেজ পার হ'য়ে পার্টিশনের কাছে যেতে ও বেরিয়ে এলো। যেন এইমাত্র কল-ঘর থেকে ফিরেছে। হাতে একটা ভিজে তোয়ালে, এলোচুল। বৃষ্টি-ধোওয়া কদমফুলের সৌরভের মতো মিষ্টি একটা গন্ধ আমার নাকে লাগলো।

'আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম।'

'কেন ও-কথা ব'লে বার-বার মনে কষ্ট দিচ্ছেন।' মাংসের পুঁটুলি লীলাময়ীর পায়ের কাছে সিমেন্টের ওপর রাখলাম।

'একটা চাকর পর্যন্ত না,' নুয়ে পুঁটুলিটা ও হাতে তুলে নিলে। 'আমরা যখন ছুটিতে যাচ্ছি চাকর দুটোকে ছেড়ে দাও, ঘুরে আসুক ক'দিন দেশ থেকে —কী বুদ্ধিমানের কথা শুনুন—কলকাতায় ঢের লোক পাওয়া যাবে।'

বুদ্ধিমানটি কে আন্দাজ করতে কষ্ট হ'লো না। এবং বুদ্ধির বহরটা আরো বড়ো ক'রে দেখবার সুযোগ এলো আমার, গম্ভীর গলায় বললাম, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদলেও চাকর জুটবে না, বাড়ি পাওয়ার মতোই কঠিন। উনি এখনো ফেরেননি বুঝি?'

'রাত বারোটার আগে!' কৌতুকোজ্জ্বল কালো চোখ আমার মুখের ওপর মেলে দিয়ে যুবতী হাসলো। 'ভালো লোক ঠাওরেছেন।'

'রোজই এমন করেন নাকি ?' কৌতূহল খুব বেশি হ'লো, একটু হাসলামও। 'অনেক রাতে ফেরেন বুঝি ?'

'রোজ, চিরকাল।' যেন চিরকালের এই অভ্যাসটা ধাতস্থ হ'য়ে গেছে লীলাময়ীর, খারাপ লাগে না, নইলে এমন ঝরঝরে গলায় হাসবে কেন। 'ওখানে যেমন করেছে, এখানে এসেও দেখছি তাই, বন্ধুর ওর শেষ নেই, হয়তো দুপুর-রাতে এসে বলবে, খেয়ে এসেছি অমুকের বাড়িতে, কি অমুকের সঙ্গে হোটেলে, আমি খাবো না, এই রকম।'

রকমটা কি ভালো ? মুখ দিয়ে আমার প্রায় বেরিয়ে পড়েছিলো, গম্ভীর-ভাবে বললাম, 'না, এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক না।'

চৌকাঠের ওপর চোখ রেখে কি যেন ও ভাবলো। নাকি ভাবনা ঝেড়ে ফেলার জন্য ফের লীলাময়ী ঠোঁটে হাসি টেনে আনলো। এবার আমার প্রসঙ্গ।

'বেশ পরিশ্রম করতে পারেন আপনি।'

'নিশ্চয়,' দৃপ্ত পৌরুষের গলায় বললাম, 'পুরুষের এত গা ভাসিয়ে দিলে সংসার চলে না। সন্ন্যাসী বাউলের সংসার নেই।' ইঙ্গিতটা ইচ্ছা ক'রেই একটু ভালোর দিকে রাখলাম।

ছুরির ফলার মতো ধারালো চকচকে দুটো চোখ আমার আপাদমস্তক বিদ্ধ করলো। ছেঁড়া জামা আমার ? ছেঁড়া-জুতো গরিব কেরানী ? না, এ-চাউনির অর্থ অন্যরকম। এ স্বতন্ত্র।

'এই অফিস থেকে ফিরলেন, এই আবার ছুটলেন বাজারে, একটু আলসেমি নেই।'

'আলসেমিটা মনের,' ঠোঁট টিপে হাসলাম, 'নাকি এ-বয়সে এতটা ছোটাছুটি মানায় না বলছেন আপনি ?'

কিছু বললো না, লীলাময়ী ঠোঁট টিপে হাসলো।

বললাম, 'যাই, আপনার কাজকর্ম আছে।'

'হ্যাঁ, তা আছে বৈকি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে যুবতী ঘাড় ফেরালো, শরীর ঘোরালো। অপরূপ দীর্ঘ দেহ। ঘন চকচকে ছোপ দেওয়া শাড়ি পরনে। মনে হ'লো মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে নিঃশব্দচারিণী কোনো বাঘিনী। মাংসের পুঁটুলিটা হাতে ক'রে চৌকাঠের ওপারে পার্টিশনের আড়ালে অদৃশ্য হ'লো। সুন্দর, গর্বিত, নির্ভীক। আমি চেয়ে রইলাম।

ঘরে ঢুকতে অন্ধকারে একটা ফুঁসফাঁস শব্দ কানে এলো। মেজাজ কেমন গরম হয়, ভাবুন একবার। দরজার কাছে, অনুমান করলাম, বীথি ওটা।

'কি হয়েছে শুনি, কাঁদছে কে?'

'মণ্টু।' বুঝলাম প্রীতির গলা। 'ইস্কুলে জ্যামিতি পড়া দিতে পারেনি, মাস্টার মেরেছে।'

'বেশ করেছে,' হাল্কা গলায় বললাম, 'এক-আধটু মার খাওয়া ভালো।'

প্রীতি আধ-ইঞ্চি সেই মোমের টুকরোটা জ্বাললো। জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসলাম। বললাম, 'এ-বয়সে ইস্কুলে সবাই মার খায়। মার না খেয়ে কেউ মানুষ হয়েছে? উকিল, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কেরানী, প্রোফেসার—মার একদিন সবাই খেয়েছে।' মণ্টু আমার কথাগুলি কান পেতে শুনলো। প্রীতি, বীথি, ফণ্টু আর ওদের মা। যেন এমন মিষ্টি কথা আমার মুখ দিয়ে কোনোদিন বেরোয়নি। গলা-মোমের মাঝখানে সলতের টুকরোটা সাঁতার কাটতে-কাটতে ফুটুস ক'রে এক-সময়ে নিভে গেলো। আমারও খাওয়া হ'য়ে গেছে। এবং অন্ধকার ঘরে ব'সে থাকার কোনো মানে হয় না বা এতগুলি মিষ্টি কথার পর আবার কি অপ্রিয় কথা ব'লে হেমলতার সংসারকে হতচকিত ক'রে দিই এই ভয়ে আস্তে-আস্তে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ললিতের ঘরের টিম্‌টিমে আলোটাও নিভে গেছে এখন। পাড়াটাই ঝিম্ মেরে যায় রাত আটটার পর। তাই ও-ঘরের লাল-আলো-জ্বলা জানলাটা আরো বেশি কাছে মনে হচ্ছে যেন। হাত বাড়ালে নাগাল পাবো।

পায়ের শব্দ শোনা যায়? বাসনের ঠুন্‌ঠান্ আওয়াজ?

কান পেতে রইলাম। দেখলে মনে হয় যেন ও-ঘরে এই সবে সন্ধ্যা নেমেছে, গা ধুয়ে চুল বেঁধে পরিপাটি ক'রে লীলাময়ী রাঁধতে বসেছে। আঁটোসাঁটো নিটোল নিখুঁত মূর্তি আমার চোখের সামনে ভাসছে। ধ্যানস্থের মতো জানালাটার দিকে চেয়ে রইলাম। না, এদিকে কিন্তু একবারও এলো না, ডিশ বা বাটি নিতে। কেবল ওদিকের দেয়ালে একবার গোল-মতো একটা ছায়া দেখলাম। বুঝলাম দেয়ালে-ঢাকা ওই অংশটায় ব'সে লীলাময়ী রাঁধছে। আর উল্টোদিকে ছায়া পড়েছে। একবার কাঁপছে আবার স্থির হ'য়ে আছে।

বিড়িটা নিভে যেতে আর-একটা ধরাতে যাবো হঠাৎ যেন নিচের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। ইঞ্জিনিয়ার?

শ্বাস বন্ধ ক'রে কান পেতে রইলাম। আর শব্দ নেই। বোঝা গেলো ইঁদুর। পুরোনো বাড়িতে ইঁদুরের উপদ্রব বেশি। ময়লা বেরোবার পাইপ বেয়ে নির্বিবাদে ওরা ওপরে উঠে আসে। মোটা ধোঁয়া-রঙের বিশাল এক-এক ইঁদুর।

লীলাময়ীর ঘরে ইঁদুর ঢোকে? কথাটা কেন জানি মনে হ'লো। জানলার দিকে চেয়ে ঢোক গিললাম। কল্পনা করলাম, সত্যি যেন একটা নোংরা হোঁৎকা ইঁদুর ঢুকেছে ও-ঘরে। লীলাময়ী আঁৎকে উঠবে ভয়ে? না চিৎকার ক'রে উঠবে! না রাগে দাঁত ঘ'ষে হাতের তপ্ত খুন্তিটা ইঁদুরের মস্তকে ফুঁড়ে দেবে! নাকি ঘাড় ফিরিয়ে নরম ঠাণ্ডা চোখে একবার মাত্র তাকাতে বাসন-কোসনে গা না ঠেকিয়ে ইঁদুরটা ভালোমানুষের মতো লীলাময়ীর শাদা সুন্দর পায়ের কাছ দিয়ে সুড়সুড় ক'রে নর্দমার পথে বেরিয়ে গেলো।

তাই—তাই হবে। এ তো আমাদের ঘরে ইঁদুর ঢোকা নয় যে ওটাকে দেখেই মালিশরতা হেমলতা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠবে, প্রীতি বীথি মোটা থপ্থপে পা ফেলে ঝাঁটা নিয়ে আসবে ছুটে ইঁদুর মারতে, মণ্টু ফণ্টু ঘরময় দাপাদাপি করবে, সে এক কাণ্ড! শুনলাম দূরের পেটাঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে দশটা বাজলো।

পা বদল ক'রে ফের রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াবো এমন সময় প্যাসেজের ওপারে পার্টিশনের দরজা ন'ড়ে উঠলো। প্রথমে আলোর একটা রেখা, তারপর আলোর রেখার মতোই উজ্জ্বল দীর্ঘ সেই দেহ। বুকের ভিতর ঢুবঢুব করছে আমার। প্যাসেজের মাঝামাঝি যখন এলো মুখখানা আর ভালো দেখা গেলো না। আশ্চর্য, লীলাময়ী এদিকেই আসছে, আমার ঘরের দিকে।

রেলিং ছেড়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম।

'ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে? ছেলে-মেয়েরা?'

'প্রীতি বীথি? মণ্টু ফণ্টু?' বললাম, 'কিছু দরকার আছে?'

'একটা কারী খাবে ওরা।'

অন্ধকারে আন্দাজ করলাম ওর হাতে অ্যালুমিনিয়ামের একটা বাটি।

'এত রাতে ওটা আপনি হাতে ক'রে এনেছেন! তা ছাড়া ওইটুকুন তো ছিলো, আমি নিজে বাজার করেছি।'

'তাই ব'লে সব একলা খেতে হয়!' হাসলো লীলাময়ী, অন্ধকারে বৃষ্টির ফোঁটার মতো সে-হাসির শব্দ।

বললাম, 'তা ছাড়া ঘুমের চোখে উঠে খাবে, স্বাদ বুঝবে না, কাল হয়তো আপনাকে রান্নার নিন্দেই শুনতে হবে।'

'বেশ তো, আপনি জেগে আছেন, একটু চেখে স্বাদ বুঝে রাখুন, সাক্ষী থাকবেন।'

'অর্থাৎ আমার জন্যেও এসেছে,' হেসে হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিলাম। 'পারতাম খেতে খুব এককালে মাংস—এখনো, এখনো পারি এমন—'

'না-পারার আছে কি,' অন্ধকারে আর-এক ঝলক হাসি উঠলো। 'দাঁত ক'টি সকালে নড়বে ব'লে তো মনে হয় না।'

মনে পড়লো, সন্ধ্যাবেলা সামনে যখন দাঁড়িয়েছিলাম ধারালো চকচকে চোখে ও আমার দাঁতগুলির দিকেও দু-বার তাকিয়েছিলো।

'আপনার তো খাওয়া হয়নি।'

'এইবার খাবো, নাকি রাত দুপুর অবধি আমিও জেগে ব'সে থাকবো খাবার সামনে নিয়ে? চললাম—'

হাসলো ও, যেন তারের যন্ত্রে ছড় টেনে গেলো।

মাথার ভিতর ঝিম্‌ঝিম্ করছিলো। না, এ আমাকেই দেওয়া, আমাকেই দিতে আসা। আমার ঘর রাত আটটা থেকে নিভে গেছে, ঘুমে তলিয়ে আছে, পাঁচ-সাত হাত দূরে আর-এক ঘরে ব'সে ওর টের না পাওয়া খামোকা কথা।

মনে-মনে হাসলাম। কেননা একটা ছবি তখন আবার মনে এসে গেছে। টিংটিং ক'রে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছে পেণ্টুলন-পরা সেই মূর্তি। বন্ধুর আড্ডা ছেড়ে আর-এক বন্ধুর আড্ডায়। সিগারেটের ধোঁয়া হ'য়ে চিরকাল তুমি উড়তে থাকো, ভেসে যাও, বললাম মনে-মনে।

সোজা চ'লে গেলাম নিচে কলতলায়। জায়গাটা এখন সর্বজন-পরিত্যক্ত। নিরাপদ।

না, প্রীতি বীথিকে অর্থাৎ হেমলতার সংসারকে আর নাড়া দিলাম না এই ভেবে, ওদের মন পরিষ্কার নেই। বিশেষ ক'রে বুড়ি মেয়ে দুটো। আমি মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলি ওটা যেন ওরা পছন্দ করে না এমন ভাব। না হ'লে সকালে আমার অফিসে যাওয়া নিয়ে বীথির অত মাথাব্যথা উঠেছিলো কেন? সন্ধ্যাবেলা আমি ঘরে না ফেরা তক প্রীতি অন্ধকার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছিলো কেন? এখন এই মাংসের ব্যাপারটাও ভালো চোখে দেখবে না। দেখতে পারে না কুটিল যাদের মন।

চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়িয়ে গরম উপাদেয় মাংসখণ্ডগুলি একে-একে সব

সাবাড় ক'রে বাটিটা জলে ভিজিয়ে রেখে মুখ-হাত ধুয়ে ওপরে উঠে এলাম। এসে আবার আগের জায়গায় রেলিং ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এবার পরিষ্কার চোখে পড়লো, জানলার ওপারে, টেবিলের ওপর থালা রেখে লীলাময়ী খেতে বসেছে। দেখলাম অনেকক্ষণ ধ'রে ওর ধীরেসুস্থে চিবিয়ে রসিয়ে খাওয়া, তারপর হাত-মুখ ধোওয়া, মুখ মোছা, পান খাওয়া, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পানের রসে রাঙানো ঠোঁট উল্টে-পাল্টে দেখা। আঁচলটা কাঁধ থেকে প'ড়ে গেছে। আলস্যে মন্থর। একদিকের দেয়াল থেকে লীলাময়ী অন্য দেয়ালে চোখ ফেরালো, এলো একেবারে জানলার কাছে। জানি না রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ানো আমার আবছা মূর্তি ওর চোখে পড়েছিলো কিনা, ঈশ্বর জানে, তবে আমি তো দেখলাম অন্ধকারে চোখ রেখে ও ব্লাউজের হুক্ খুললো।

অবশ্য একটু পরেই আলো নিভলো। আমার দু-কান দিয়ে তখন গরম হাওয়া বইছে। যেন কান পেতে শুনতে পেলাম মঙ্গলগ্রহের অন্ধকার গুহায় যৌবনতপ্ত শরীরের এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফেরার শব্দ।

আস্তে-আস্তে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। সেই পেণ্টুলন-পরা আদমী রাতের কোন ভূতুড়ে প্রহরে ঘর নিয়েছিলো জেগে ব'সে থেকে দেখবার আমার দরকার ছিলো না। আমাদের মধ্যে ও ছিলো না।

সকালে বড়ো একটা নিমের ডাল নিয়ে দন্তধাবনে ব্যস্ত ছিলাম। একটা-কিছু না ক'রে এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি বা কি ক'রে। তবু বীথি, কুবুদ্ধির হাঁড়ি, দু-বার দরজায় এসে উঁকি দিয়ে গেছে। দেখুক। আমার বারান্দায় আমি দাঁড়িয়ে আছি এ তো আর কেউ অস্বীকার করবে না। অটল ও অনড় হ'য়ে আমি ওধারে দরজার গায়ে হলদে রোদের পরিধিটা মনে-মনে জরিপ ক'রে চললাম। যেন আজ আরো বেশি বেলা হচ্ছে। ঘুম আর ভাঙে না।

এক-সময়ে দরজা ন'ড়ে উঠলো। ইতস্তত করছিলাম নিমের ডালটা মুখ থেকে নামিয়ে নেবো কিনা, তার আগেই দরজা ফাঁক হ'লো।

বেরোলো, সে নয়, টাই-স্যুট-পরা তালপাতার সেপাইটি।

বিরক্ত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে নিই। এতৎসত্ত্বেও ছোঁড়া আমার দিকেই এগিয়ে এলো। হাসি-হাসি চেহারা।

'দয়া ক'রে একটা রিক্শা ডেকে দিন-না।'

নিমের তিক্তরসমিশ্রিত একটা ঢোক গিললাম। রইলাম চুপ ক'রে।

'আপনি কুলদাবাবু?'

'কুলদারঞ্জন পাইন,' মুখ খুলতে হ'লো এবার, 'পার্কার অ্যাণ্ড পার্কার কোম্পানীর সিনিয়র গ্রেড ক্লার্ক। এ-বাড়িতে আমি সতেরো বছর।' ভাবলাম, পাটনায় তুমি ইঞ্জিনিয়ার না লাটসাহেব, এখানে কি।

'তাই বলছিলো ও,' মাথা নেড়ে কাপ্তেন নতুন সিগারেট ধরালো। 'খুব করছেন আমাদের জন্যে, শুনলাম।'

মনটা একটু নরম হ'লো।

'না, খুব আর কি,' বললাম, 'এক জায়গায় থাকতে গেলে এমন—'

'দ্যাট্স রাইট, ও তাই বলছিলো, আপনি থাকাতে আমাদের অনেক সুবিধে হচ্ছে।'

'আবার বেরোনো হচ্ছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে, ইফ্ ইউ ডোণ্ট্ মাইণ্ড্, দয়া ক'রে একটা রিক্‌শা ডেকে দিন-না।'

'ও আবার একটা কাজ নাকি।' রাগটা একদম চ'লে গেছে তখন আমার। 'আমি এখুনি ডেকে দিচ্ছি।'

'ছুটিতে এলাম, ওদের সবাইর সঙ্গে দেখা না-করাটা কি ভালো ?'

'সে তো ঠিকই, কেন দেখা করবেন না। না-করার আছে কি।' হৃষ্টমনে নিচে গিয়ে রিক্‌শা ডেকে আনি। 'বন্ধুবান্ধব নিয়েই তো সংসার, এ-দিনে ক'টা লোক হ'তে পারে বন্ধুবৎসল।' পর্যন্ত দুটো উপদেশও দিলাম।

তারপর ঠুন্‌ঠুন্ ক'রে রিক্‌শার তো ঘণ্টা বাজলো না, আমার বুকের ভিতর ঘণ্টা বাজতে লাগলো।

শিস দিতে-দিতে ওপরে উঠছিলাম ডবল সিঁড়ি ডিঙিয়ে, যেন বুকের একটা ভার নেমে গেছে। কিন্তু মনের এই প্রফুল্ল ভাব নষ্ট ক'রে দিলে ধুমসি মেয়েটা। সিঁড়ির মুখ আগলে দাঁড়িয়ে আছে প্রীতি। যেন গোরু চরাতে এসেছে।

'তোমার বেলা হ'য়ে গেলো, বাবা।'

'তুই আমার অফিস করবি নাকি ?' রাগে রুখে উঠলাম এবং আরো কি বলতে গেছি, দেখি, ঘন সবুজ রঙের একটা টুথব্রাশ-হাতে সিঁড়ির মুখে লীলাময়ী। ঘুম-ভাঙা ফোলা-ফোলা চোখ।

ভয় হ'লো রাত্রের মাংসের কথাটা না তোলে হঠাৎ।

কিন্তু লীলাময়ী চালাক মেয়ে। সেয়ানা।

যেন কাল বিকেলের পর এই আমার সঙ্গে দেখা।

'আজ আবার আপনাকে একটু কষ্ট দেবো।' কত যেন দ্বিধাগ্রস্ত চেহারা। দাঁড়ালো প্রীতির ঠিক পেছনে।

'কষ্ট আর কি,' বললাম, 'এক-জায়গায় থাকতে গেলে এমন—'

'এ-বেলা পারবেন না। সময় নেই আপনার। ও-বেলা অফিস থেকে ফেরার সময়—'

'বলুন-না কি করতে হবে,'— যেন সংকুচিত আমিও, সন্ত্রস্ত। চোরা চোখে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো প্রীতির চোখ দুটো দেখে নিলাম। 'কিছু আনতে হবে বুঝি ?'

'ইলিশ মাছ, গঙ্গার ইলিশ পান তো।' লীলাময়ী আমার চোখে তাকালো। পরে চোখ ফিরিয়ে নিলো।

'ও আবার কষ্ট কি।' হেসে লীলাময়ীর মুখের দিকে তাকালাম। লাল-রঙা ডবল নোট দুটো আলগোছে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে যুবতী ধীর মন্থর পায়ে দাঁত ঘষতে-ঘষতে প্যাসেজের দিকে চ'লে গেলো।'

একটা ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টি প্রীতির মুখের ওপর ছুঁড়ে আমিও ঘরে চ'লে এলাম। যেন স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ আলাদা আমি এই গোষ্ঠী থেকে। মণ্টু ফণ্টু একসঙ্গে খেতে বসেছে, একবার ওদের মুখের দিকেও তাকাইনি। যদি-বা এক-আধবার চোখে পড়েছে, মনে হয়েছে দুঃখে দারিদ্র্যে অভাবে জমাট এক-একটি শিলাখণ্ড আমার রাস্তা জুড়ে আছে। এ-বেলা পরিবেশন করলো বীথি। রান্না করেছে নিশ্চয় বুড়ি মেয়েটা। যত বয়েস হচ্ছে মাথায় বদচিন্তা কুট্‌কুট্ করছে। রান্না! আর রাত্রে এতটা ঘি গরমমসলার মাংস খেয়ে চিংড়ি ছাঁচি-কুমড়োর তরকারি জিহ্বায় কেমন লাগবে কল্পনা করুন। আর ঘরময় হেমলতার গাত্রোত্থিত মালিশের উগ্র ঝাঁজালো গন্ধ। যেন উনিশ বছর এই গন্ধটা ছড়িয়ে হেমলতা আমার পরমায়ুকে জীর্ণতর করবার জন্যে বেঁচে আছে। কোনোমতে খাওয়া শেষ ক'রে জামা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

অফিসে পৌঁছে, আমার যা প্রথম কাজ, ডেস্প্যাচের অনঙ্গ ধরকে আড়ালে ডেকে নিলাম।

'শঙ্খিনী নারীর লক্ষণ কি, ভায়া ?'

'গোপন-স্বভাবা, কিন্তু তেজস্বিনী।'

চুপ ক'রে জায়গায় এসে বসলাম। এ-সব ব্যাপারে অনঙ্গ ধরের পরামর্শ মেনে চলি আমরা, বয়স্করা। নারীচরিত্র ওর নখাগ্রে। এক বিয়ে করেছিলো

লোকটা আইন-মতো, আরেক বিয়ে সেদিন ক'রে এসেছে আইন ভেঙে, এ-বয়সে। সাহস যেমন, জানেও অনেক। সুতরাং উঠতে-বসতে এ-সব ব্যাপারে আমরা অফিসের তথাকথিত বুড়ো যারা অনঙ্গর মতামতের সঙ্গে লক্ষণ-বিলক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখি। চেষ্টা করি সে-ভাবে চলার। নইলে তো এখনকার ছেলে-ছোকরাদের মতো ট্র্যামে-পার্কে-ময়দানে-রাস্তায় ঘুরতে হ'তো মায়াবিনী হরিণীর খুরের ধুলো খেয়ে।

এখনকার ওরা জানে না অন্দরের অন্ধকারেও সুন্দর জন্তু থাকে খেলার—খেলবার। কোথায় সেই স্থৈর্য, সে আবিষ্কার।

লেজার আড়াল ক'রে সারাদিন ব'সে মাথা খাটালাম, চিন্তা করলাম। পাঁচটা বাজতে রাস্তায় নেমে সোজা গঙ্গার ঘাটে।

একটা-একটা ক'রে সতেরোটা মাছ উল্টে-পাল্টে দেখে শেষে বেশ চকচকে চ্যাপ্টা মনের মতোন ইলিশ বেছে নিয়ে দাম চুকিয়ে বাড়ির দিকে চললাম। ইচ্ছা ক'রেই রাস্তায় সন্ধ্যা করলাম।

গলির মুখে এসে মাছটা বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে নিলাম। কেননা আমাদের ঘর বারান্দার বাঁয়ে, অর্থাৎ তুমি যদি প্যাসেজ ধ'রে পার্টিশনের দিকে যাও যে-কেউ দেখবে হাতে মাছ। কিন্তু তবু সিঁড়ির মুখে মণ্টুটা দেখে ফেললো। আবছা অন্ধকারেও টের পেলো মাছ। কিছু বললে না, কেবল হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো, যেন ওর বিশ্বাসই হয়নি এতবড়ো ইলিশ বাবা ঘরে আনবে।

দেখলে বীথি, চৌবাচ্চার দিকে যাচ্ছিলো ও।

প্রীতি। কালকের মতো চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঠিক চোখ মেলে চেয়ে ছিলো। এবং সবগুলো চোখকে উপেক্ষা ক'রে, যেন আমি কাউকে দেখিনি, সোজা চ'লে গেলাম ঘাড় গুঁজে প্যাসেজের ওধারে।

কড়া নাড়তে ঘর-দুয়ার লাল আলোয় টল্‌মল্ ক'রে উঠলো। এই সবে আলো জ্বললো। বেরিয়ে এলো লীলাময়ী। ফোলা-ফোলা চোখ। যেন অবেলায় অনেক ঘুমিয়ে উঠেছে। খোঁপা ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে খোলা পিঠে। আঁচলের আধখানা মাটিতে লুটোয়।

'দাঁড়িয়ে কেন, আসুন।'

ইতস্তত করলাম, পিছনের দিকে তাকাই একবার।

'বাঘ, বাঘের খাঁচা এটা!' ধমক দিয়ে লীলাময়ী হাসলো। ফুলের পাপড়ি

ছিটকে পড়লো চারিদিকে। ওর হাসির আড়ালে কালো চোখের তারায় দেখলাম স্বচ্ছ নীল স্ফুলিঙ্গ। এক-মুহূর্তের জন্তে।

নিঃশব্দে চৌকাঠ পার হ'য়ে আমাকে ভিতরে যেতে হ'লো। ছোট্টো উঠোন। চুপচাপ।

এক হাতে আঁচল গুটোতে-গুটোতে অন্য হাতে সদরের ছিটকিনি তুলে দিয়ে ও ঘুরে দাঁড়ালো। হাসলো আবার। নিশ্চিত নির্ভয়। এখন আমরা বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। বুকের ভিতর ঢুব্‌ঢুব্ করছে আমার।

'কি করবো বলুন,' বললাম আস্তে-আস্তে। যেন ওর হাতের পুত্তলি আমি, নির্দেশ মেনে চলবো। 'কোথায় রাখবো মাছ?'

'রাখুন ওখানে।' আঙুল দিয়ে নর্দমার ধারটা দেখিয়ে যুবতী ফের মিটিমিটি হাসলো। 'যেন আপনাকে হুকুম করছি, তাই আবার ভাবছেন না তো?' ব'লে চোখ টিপলো।

'হুকুম করতে জানেন ব'লেই তো করছেন।' মাছটা নামিয়ে রেখে ওর মুখের দিকে তাকালাম। রসে কৌতুকে আয়ত ঢলঢল চোখ। ভাবলাম, তোমার হুকুম জন্মে-জন্মে মানতে রাজী।

'তাই নাকি। দাঁড়ান, আমি আসছি।'

দীর্ঘ ফর্সা দেহ, সম্রাজ্ঞীর মতো। দু-হাতে খোঁপা ঠিক করতে-করতে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

এলো থালা আর বঁটি নিয়ে।

'ও, আমায় সামনে রেখে মাছ কুটবেন বুঝি?'

'দেখবো না ভালো কি মন্দ, টাটকা না পচা?' কুটিল আঁকাবাঁকা হাসি ঠোঁটের কিনারায়। যেন এখন পর্যন্ত সহজ হ'তে পারছে না এমন ভাব। শঙ্খিনী।

'দেখুন।' ঠোঁট টিপে হাসলাম। 'অনেক ঘুরে দেখে-শুনে এনেছি।'

'তাই বুঝি এত রাত হ'লো?' কুটিলতর চোখে হাসলো ভ্রূবিলাসিনী। এমন চালাক, এমন চাপা। ঠাট ক'রে কোমরে আঁচল জড়িয়ে বঁটি বিছিয়ে বসলো। কান গরম হ'য়ে গেছে আমার। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। বুঝি আশা আশঙ্কা ভয় ও লোভ একসঙ্গে আমার চোখে ফুটে উঠেছে তখন। আমি পুরুষ। কিন্তু ওরা পারে মনের ভাব অনেকক্ষণ গোপন রাখতে। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা। লীলাময়ী ঝপ্ ক'রে তখন কিনা অন্য প্রসঙ্গে চ'লে গেছে।

'আপনার স্ত্রী উঠে দাঁড়াতে পারে না?'

'একেবারে অচল।' দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, অবশ্য অন্য কারণে। ওর হাতের মাছ দু-খণ্ড হ'য়ে বঁটির বুক থেকে থালায় নেমে এলো। তাজা লাল রক্ত। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলাম।

'দেখুন কেমন টাটকা ইলিশ।' বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করলাম। রক্তের একটা ফোঁটা ছিটকে ওর গালে পড়েছে, নাকের পাশে। হাতের পিঠ দিয়ে ও তাই মুছতে চেষ্টা করছে বার-বার।

'আরেকটু নিচে।' রুদ্ধশ্বাসে বললাম।

কিন্তু এবারও ঠিক জায়গায় হাত পৌঁছলো না।

'হ'লো না,' বললাম, 'আরো ওপরে।'

'দিন-না মুছে।' কাতর চোখে ও আমার দিকে তাকালো। হাত জোড়া, পারছে না নিজে। মনে হ'লো গালে ওর রক্তবর্ণ একটা তিল। হাত কাঁপছিলো আমার, ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে। নুয়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে রক্তের দাগ মুছে দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য লীলাময়ী। অটল অটুট। যেন কিছুই হয়নি, যেন এই স্বাভাবিক। বললো, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন, গল্প করুন, আমি মাছ কুটে শেষ করি।'

'ততক্ষণে উনুনের কাঠ ক'খানা তো কাটিয়ে নিতে পারো ওকে দিয়ে।' ঘরের ভিতর থেকে শব্দ এলো, ইঞ্জিনিয়ারের গলা, শুয়ে আছে যেন।

আমার চোখে চোখ চেয়ে লীলাময়ী মিটিমিটি হাসছে।

'এ-বেলা বেরোতে পারেনি, মানিব্যাগ লুকিয়ে রেখেছিলাম, শুনুন কেমন পাকা সংসারীর মতো কথা বলছে এখন।' পরে মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে চেয়ে গলা বড়ো ক'রে বললো, 'তা উনি কেটে দেবেন, তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো, কুলদাবাবুকে দিয়ে তোমার জন্য নিচে থেকে এক-টিন সিগারেটও আনিয়ে রাখবো ভেবেছি।'

মঙ্গলগ্রহের লাল শক্ত সিমেন্টের ওপর চোখ রেখে কথাগুলি শুনছি আমি।

আ মে রি কা

বিমল মিত্র

. . . .

মিস্টার রিচার্ড বললেন—গল্পটা গোড়া থেকে বলবো, না শেষ থেকে বলবো?

কলকাতা থেকে বম্বে যাবার পথেই মিস্টার রিচার্ডের সঙ্গে আলাপ। মাত্র চার ঘণ্টার আলাপ। দমদম থেকে উড়তে শুরু করেছিলুম সন্ধ্যে ছ'টার সময়। ভাইকাউন্ট-এর ভেতরে মিস্টার রিচার্ডের সিট-নাম্বার ছিল থ্রি-সি, আর আমার থ্রি-ডি। একেবারে পাশাপাশি। মিস্টার রিচার্ডের বোধহয় গল্প করবার মেজাজ ছিল তখন। তিনিই প্রথম আরম্ভ করেছিলেন।

বলেছিলেন—আর ইউ এ ভেজিটারিয়ান? আপনি কি নিরামিষভোজী?

আমি নিরামিষভোজী কি না, তা নিয়ে মিস্টার রিচার্ডের মাথা ঘামানোর কথা নয়। বুঝেছিলাম তিনি গল্প করতে চান পাশের লোকের সঙ্গে। তারপর আস্তে আস্তে অনেক কথা উঠলো। ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে। তের বছরে কী কী উন্নতি অবনতি হয়েছে, কী কী হয়নি, তারই ছেঁদো কথা সব। এ-সব বিদেশীদের মুখরোচক আলোচনা। এই প্রথম ইণ্ডিয়ায় এসেছেন মিস্টার রিচার্ড। গৌতম বুদ্ধের দেশ, লর্ড চৈতন্যের দেশ, সোয়ামী ভিভেকানন্দের দেশ, ল্যাণ্ড অব টেম্পলস্। দি গ্রেট ইণ্ডিয়া। ওদিকে ক্যাশমিয়ার আর এদিকে কুম্যারিকা, দি হিমালয়াস্ আর দি গ্যাঞ্জেস। বেনারসের সাধু, মথুরার পাণ্ডা, বৃন্দাবনের ভিখারী, দিল্লির টাঙ্গাওয়ালাজ, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গ। সব দেখা শেষ করে এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে উঠেছিলেন। এখন ফিরে যাচ্ছেন নিজের দেশে, আমেরিকায়।

কলকাতার নাম শুনেই একটু কৌতূহল হলো।

জিজ্ঞেস করলাম—কলকাতা কেমন লাগল আপনার?

মিস্টার রিচার্ড আমার দিকে পাশ ফিরলেন। বললেন—বলবো?

বললাম—বলুন না—

মিস্টার রিচার্ড বললেন—গল্পটা গোড়া থেকে বলবো, না শেষ থেকে বলবো?

বললাম—তার মানে?

মিস্টার রিচার্ড বললেন—মাত্র এক দিন ছিলাম কলকাতার হোটেলে, এক দিনের অভিজ্ঞতায় কোনও দেশ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, কিন্তু প্রথম দিনেই

একটা ঘটনা ঘটেছিল—সেই ঘটনাটা বললেই আপনি একটা স্টোরি পেয়ে যাবেন—কারণ শেষটা আমার আর দেখা হয়নি—

বললাম—তা হলে গোড়া থেকেই বলুন—

মিস্টার রিচার্ড বললেন—ঘটনাটা ঘটলো প্রথম নাইটেই। প্লেন এসে পৌঁছেছিল বিকেল চারটের সময়। এরোড্রোম থেকে সোজা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। বিরাট হোটেল, আগে থেকেই আমার রিজার্ভ করা ছিল রুম। ষ্টিউয়ার্ড বয়, বাবুর্চি, ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার, বোর্ডার সবাইকে দেখলাম—দেখলাম সবাই খুব কেয়ার নিলে আমার—আমি কী খাই, আমি কী খেতে ভালবাসি, আমি হট্ না কোল্ড কী খাবার পছন্দ করি, আমার কখন কী দরকার, সব খবর তারা জিজ্ঞেস করে নিলে—। বিকেল বেলা বেড়াতে গেলাম সিটিতে। গেলাম হগ্ মার্কেটে, দু-একটা জিনিসপত্র কিনলাম—দেখলাম বেঙ্গলীজ আর ফানি পিপল্! ফরেনারদের তারা দেবতা মনে করে এখনও, এই ইণ্ডিপেনডেনসের তেরো বছর পরেও—

মিস্টার রিচার্ড এবার একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিলেন—

বললাম—তারপর ?

মিস্টার রিচার্ড বলতে লাগলেন—চমৎকার লাগলো এই ক্যালকাটা আপনাদের—আগেকার সেই সেকেণ্ড সিটি ইন দি ব্রিটিশ এম্পায়ার! পশ্চিম দিকে অত বড় মাঠ, সিটির হার্টের মধ্যে এত বড় খোলা মাঠ কোথাও দেখিনি! গভর্নরস হাউসও দেখলাম! আপনাদের লেট্ মহাট্‌মা গান্‌ডি বলেছিলেন ইণ্ডিপেনডেনসের পরে ওটা মিউজিয়াম হবে! ভেবেছিলাম মিউজিয়ামটা দেখতে যাবো। আমার বেঙ্গলী গাইড বললে—তা নাকি হয়নি। তা না হয়েছে ভালই হয়েছে—এতদিন ষ্ট্রাগল্ করে এখন একটু আরাম করাই ন্যাচারাল, শুনলাম আগেকার সবই আছে, সেই গার্ড অব অনার, সেই আট ঘোড়ার বডিগার্ড, সেই এ-ডি-কং, ব্রিটিশ লিগেসির যা-কিছু সব ইণ্ডিয়ানরা পুরো দমে ভোগ করছে। বড় আনন্দ হলো দেখে—অবশ্য দেখলাম আপনারা ময়দান থেকে জেনারেল আউটরামের স্ট্যাচুটা সরিয়ে দিয়েছেন, দিয়ে সেখানে মহাট্‌মা গান্‌ডির স্ট্যাচু বসিয়ে দিয়েছেন—ভেরি গুড, ভেরি গুড—ভারি আনন্দ হলো ক্যালকাটা দেখে—। এতদিন মিস মেয়ো আর আলডাস্ হাক্সলির বইতে যা পড়েছি, দেখলাম সব মিথ্যে, সব প্রোপাগ্যাণ্ডা—সব ভিলিফিকেশন—আমি সন্ধ্যেবেলা টেরাসের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিটি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম—

কবে একদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই সিটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, আজ এতদিন পরে কোথায় রইল সেই ব্রিটিশ জাত—আর কোথায় রইল সেই কুইন ভিক্টোরিয়া, যিনি একে ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্য নিয়ে একে জাতে তুলে নিলেন। হিষ্ট্রিতে পড়েছি সেদিন নাকি কুইন ভিক্টোরিয়াকে ইণ্ডিয়ানরা 'মা' বলে অভি-নন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিল—! আজ সেই কাণ্ট্রি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়েছে—এটা ব্রিটেনেরও প্রাইড, ইণ্ডিয়ারও গ্লোরি—চমৎকার, বিউটিফুল—

—তারপর ?

—তারপর ডিনারের পর নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছি। শোবার আগে আমার বয় আমাকে কফি দিয়ে গেছে। গাইড-বুকটা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কত রাত মনে নেই, দরজায় একটা নক্ পড়লো। মনে হলো কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে—! প্রথমে মনে হলো ভুল শুনছি! খানিক পরে আবার একটা নক্—

উঠে পড়লাম। দরজার ভেতর থেকে বললাম—কে ? হুজ দ্যাট্ ?

খানিকক্ষণ চুপচাপ !

উত্তর না পেয়ে আমি দরজা খুললাম। দেখি আমার বয় হুকুমালী।

হুকুমালী মাথা নিচু করে সেলাম করতে লাগলো বার-বার। বিকেল থেকেই হুকুমালী আমার সেবা করছে। বড় ওবিডিয়েণ্ট সার্ভেণ্ট। বুঝলাম ব্রিটিশ আমলের ফরেনারদের সার্ভ করে করে হুকুমালী আদব-কায়দায় দুরস্ত হয়ে গেছে।

হুকুমালী বললে—হুজুর গোস্তাকি মাফি হয়—

—কী হুকুমালী ? ক্যায়া মাঙতা ?

হুকুমালী বললে—একজন সায়েব হুজুরের সঙ্গে মোলাকাত করতে চায়—

—কোন্ সায়েব ?

এতক্ষণ দেখতে পাইনি। টেরাসের কোণে অন্ধকারে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। এতক্ষণে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আমেরিকান হাওয়াই কোট আর ট্রাউজার পরা, ইয়ং ম্যান অব সে থার্টি—বড় জোর তিরিশ বছর বয়েস হবে। গায়ের রং ব্ল্যাক ট্যান। হাতে একটা লেদার পোর্টফোলিও ব্যাগ! কাছে এসেই বললে—গুড ইভনিং স্যার,—গুড ইভনিং—

বললাম—গুড ইভনিং! ইয়েস ?

ইয়ং ম্যান বললে—ডু ইউ ওয়াণ্ট আর্টিস্ট স্যার ? আপনি আর্টিস্ট চান ?

চড়া দর হাঁকে। সেটার তবু কারণ বুঝতে পারি। সব ইস্টার্ন দেশেই সেটা আছে। তাতে তেমন কিছু দোষ নেই। কিন্তু খাস ক্যালকাটার রেস্‌পেক্‌-টেবল্ হোটেলের মধ্যে এ কী কাণ্ড বলুন তো। আবার বলছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট! আবার বলছে কলেজ-গার্ল, রেস্‌পেক্‌টেবল্ সোসাইটির গার্ল। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছে। এ-ও নিশ্চয়ই ব্লাফ। আমাকে টুরিস্ট পেয়ে ব্লাফ দিচ্ছে! রাস্তার ফুটপাতে এ-রকম ঘটনা ঘটে, তা স্বাভাবিক! কিন্তু একেবারে হোটেলের ভেতরে! তবে কি শেয়ার আছে সকলের! ম্যানেজার, বয়, বাবুর্চী সবাই জড়িত!

আবার বললাম—পারমিশন আছে কি না, বলো শিগগির? কুইক্—

এবার যেন ছোকরা ভয় পেয়ে একটু পেছিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

হুকুমালী এতক্ষণ কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে টপ্ করে কোন্ দিকে উধাও হয়ে গেল।

ছোকরাও পালিয়ে যায় দেখে আমি খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলেছি।

বললাম—চলো, ম্যানেজারের কাছে চলো, চলো শিগগির—

আমার মূর্তি দেখে ছোকরা ভয়ে শুকিয়ে গেল। মনে হলো যেন কেঁদে ফেলবে।

বললে—আমাকে ছাড়ুন স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন স্যার, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি স্যার—

—নো, নেভার!

বলে ছোকরার হাতটা আরো জোরে চেপে ধরলাম। আমার জোরের সঙ্গে পারবে কেন? আমার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ছটফট করতে লাগলো সে।

বললাম—তোমাকে আমি পুলিসে হ্যাণ্ডওভার করে দেব, চলো—

ছোকরা বলতে লাগলো—ছাড়ুন স্যার, প্লিজ, আমি আর কোনও দিন আপনার কাছে আসবো না—কথা দিচ্ছি স্যার—

সেই রাত্রের অন্ধকারের মধ্যেও যেন তার মুখটা করুণ হয়ে উঠলো বড়। বড় প্যাথেটিক সে চেহারা। বড় অসহায়। বুঝলাম এ-ও এদের একরকম ছল। আমার সামনে এমনি কথা দিয়ে পরের রাত্রে আবার কোনও টুরিস্টের ঘরে গিয়ে নক্ করবে। আবার তাকে জিজ্ঞেস করবে—ডু ইউ ওয়াণ্ট আর্টিস্ট

স্যার? আবার পোর্টফোলিও থেকে ছবি বার করে স্যাম্পেল দেখাবে। এ-রকম ঘটনা আমাদের আমেরিকায় চলে। সেখানে এর চেয়েও বীভৎস কাণ্ড হয়। কিন্তু এখানে, এই ইণ্ডিয়ায়? এ যে আমাদের কাছে ল্যাণ্ড অব লর্ড চৈতন্য, ল্যাণ্ড অব গৌটম বুড্‌ঢ, ল্যাণ্ড অব মহাট্‌মা গান্‌ডি।

জিজ্ঞেস করলাম—কী করে ঢুকলে তুমি এই হোটেলে? এত রাত্রে?

ছোকরা সবিনয়ে স্বীকার করলে। বললে—হুকুমালীকে বখ্‌শিস্‌ দিয়ে—

—কত বখ্‌শিস্‌ দিয়েছ?

ছোকরা বললে—এক টাকা—

তারপর একটু থেমে বললে—আমায় আপনি ছেড়ে দিন প্লিজ, আমি কথা দিচ্ছি আর কখনও আসবো না—বিশ্বাস করুন, আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট, অভাবে পড়ে আমি এ-কাজ করেছি—আমার ছেলেমেয়েরা সব কদিন ধরে খেতে পাচ্ছে না, আমার ওয়াইফের টি বি—আমার···

বুঝলাম এ-সমস্ত ছল। এ-সমস্ত বাঁধা বুলি। যখনই ধরা পড়ে যায়, তখনই এই সব বুলি আওড়ায়।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি যে গ্র্যাজুয়েট, তোমার সার্টিফিকেট আছে? তোমার ডিগ্রী আছে? আমাকে দেখাতে পারবে?

—হ্যাঁ স্যার, দেখাবো, আমি কালকে নিজে এসে আপনাকে দেখিয়ে যাবো!

ভাবলাম আমাকে বোকা পেয়েছে। কাল কি আবার ছোকরার পাত্তা পাওয়া যাবে!

বললাম—কাল দেখালে চলবে না, আজই দেখাতে হবে!

—আজ?

বললাম—হ্যাঁ, আজই—

ছোকরা বললে—কিন্তু এখন যে অনেক রাত, এত রাত্রে আমি কী করে দেখাবো আপনাকে স্যার? আমার কাছে তো নেই, সে আমার বাড়িতে আছে—

বললাম—আমি তোমার বাড়িতেই যাবো—চলো—

—আমার বাড়িতে যাবেন? এত রাত্তিরে?

বললাম—তুমি যে মিথ্যে কথা বলছো না তার প্রমাণ কী? আজ রাত্রেই তোমার বাড়িতে গিয়ে দেখে আসবো—চলো—

ছোকরা যেন কী ভাবলে খানিকক্ষণ। বললে—আপনি যাবেন ?

বললাম—হ্যাঁ যাবো, ট্যাক্সিভাড়া আমি দেব, তোমার সেজন্যে ভাবতে হবে না। তোমার কথা যদি মিথ্যে হয় তো আমি তোমায় পুলিসে ধরিয়ে দেব —বি কেয়ারফুল !

ছোকরা বললে—কিন্তু আমি তো আপনাকে আমার কার্ড দেখালাম,—

আমারও রাগ হয়ে যাচ্ছিল তখন। বললাম—কথা বলে সময় নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই—আইদার তুমি আমাকে তোমার কথার প্রমাণ দাও, নয়ত তোমাকে আমি পুলিসে হ্যাণ্ড-ওভার করে দেব—

—চলুন।

শেষে সত্যিই রাজি হয়ে গেল ছোকরা। বললে—আপনার কিন্তু অনেক রাত হয়ে যাবে, আমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূর—

তা হোক্, তবু আমার যেন কেমন জিদ চেপে গেল। মনে হলো যখন ইণ্ডিয়ায় এসেছি এখানকার আসল লাইফের সঙ্গে খাঁটি পরিচয় হয়ে যাক্। সমস্ত হোটেলের বোর্ডাররা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু নিচের লাউঞ্জ থেকে নাচের গানের শব্দ আসছে। ও-সব আমি অনেক দেখেছি। ইণ্ডিয়ায় এসে ওয়েস্টার্ন নাচ-গানের ওপর কোনও আকর্ষণ আমার তখন নেই, আমি আমেরিকান। এসেছি ইণ্ডিয়ায়—ইণ্ডিয়া দেখবার জন্যে তখন ব্যস্ত। দেখবো লর্ড চৈতন্যের দেশকে, দেখবো লর্ড বুড্ঢের দেশকে। দেখবো ফ্রি ইণ্ডিয়াকে।

তখনও চক্রবর্তীর হাতটা ধরে আছি।

হাতটা থরথর করে কাঁপছে তখনও। কী পাতলা হাত। মনে হলো একটা মোচড় দিয়ে যেন হাতটা ভেঙে ফেলা যায়। যেন ভাল পেট ভরে খেতেও পায় না। তবু মনে হলো যদি পালিয়ে যায়। যদি পুলিসের ভয়ে আমার হাত ছাড়িয়ে রাত্রির অন্ধকারে হারিয়ে যায়। তখন কি আর কোথাও খুঁজে পাবো আমি একে।

দারোয়ান ট্যাক্সি ডেকে দিলে।

ট্যাক্সিতে চড়ে চক্রবর্তীকে বললাম—কোন্ দিকে যেতে হবে ওকে বলে দাও—

চক্রবর্তীর মুখ দিয়ে যেন কোনও কথা বেরোচ্ছে না তখনও। ট্যাক্সিওয়ালা চক্রবর্তীর চেনা মনে হলো। সে জানে কোথায় যেতে হবে। বহুদিন বহু টুরিস্টকে নিয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন পাড়ায়। ভেবেছে আমিও

তেমনি একজন টুরিস্ট। আমিও যথানির্দিষ্ট জায়গায় যাবো, তারপর যথারীতি ঘণ্টা দু-এক সেখানে কাটিয়ে চলে আসবো। চক্রবর্তীকে তার কমিশন দেব। ট্যাক্সিওয়ালাকেও মোটা বখ্‌শিস্ দেব। যা সবাই দিয়ে থাকে। যা নিয়ম আর কি! তাই ট্যাক্সিওয়ালাও লম্বা স্যালিউট করেছিল আমাকে।

এ-সব আমার জানা ছিল। তাই চক্রবর্তীকে বললাম—তুমি ওকে ডেস্টিনেশন বলে দাও চক্রবর্তী—

চক্রবর্তী ড্রাইভারকে জায়গার নাম বলে দিলে। ট্যাক্সি হু হু করে চলতে লাগলো।

চক্রবর্তী হঠাৎ কথা বললে।

বললে—স্যার, আপনার কিন্তু কষ্ট হবে খুব—

বললাম—কেন, কষ্ট হবে কেন?

—সে অনেক দূর।

বললাম—কতদূর?

চক্রবর্তী বললে—সে টালিগঞ্জ বলে একটা জায়গা—

টালিগঞ্জ! আমার গাইড-বুকটা খুললাম। আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। নামটা কোথাও পেলাম না। তাতে বোটানিক্যাল গার্ডেনস্, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, লেকস্, জু-গার্ডেন, গান্‌টি-ঘাট, ম্যুজিয়াম—সব নাম আছে, কিন্তু টালিগঞ্জের নাম তো নেই।

বললাম—টালিগঞ্জ কি কলকাতার বাইরে?

চক্রবর্তী বললে—না স্যার, কলকাতার মধ্যে—

—কলকাতার মধ্যে তো গাইড-বুক-এ নাম নেই কেন?

চক্রবর্তী বললে—সেখানে যে টুরিস্টরা কেউ যায় না স্যার! টুরিস্টদের দেখবার মতন জায়গা নয় যে সেটা—

তা হবে! হয়ত স্থবার্ব! শহরের ব্যাক্‌ওয়ার্ড এরিয়া। টুরিস্টদের সে-সব জায়গা না-দেখানোই ভালো।

খানিক পরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি এত প্রফেশন থাকতে এ-প্রফেশন নিলে কেন?

চক্রবর্তী বললে—আমি চাকরি করতাম স্যার আগে, গভর্নমেণ্ট অফিসে চাকরি করতাম, দেড় শো টাকা মাইনে পেতাম—তারপর আমার চাকরি গেল—

—কেন ?

চক্রবর্তী বললে—একবার অফিসে স্ট্রাইক হলো, আমিও ধর্মঘট করেছিলাম, আমার টেম্পোরারী চাকরি ছিল, আমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে। বললে আমি নাকি ডিস্টারবিং এলিমেণ্ট। বললে—আমি নাকি কমিউনিস্ট—

চক্রবর্তীর মুখের দিকে চাইলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কমিউনিস্ট নাকি ?

—না স্যার, আমি কমিউনিস্ট নই স্যার, আমি শপথ করে বলছি আপনাকে, আমি কমিউনিস্ট নই। আপ্ অন্ গড্ বলছি। আমার ওপর রাগ ছিল আমার অফিসারের। আমি দেখতাম আমাদের অফিসাররা অফিসের স্টেশন-ওয়াগান্ নিয়ে পিক্‌নিক্ করতে যায়, অফিসের চাপরাশিদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাট্‌না বাটায়, জল তোলায়, রান্না করায়—তবু আমি কোনও দিন কিছু বলিনি ! আমি জানতাম আমাদের ক্লার্ক হতেই জন্ম হয়েছে, আর বড়লোকের ছেলেদের, মিনিস্টারদের রিলেটিভদের অফিসার হবার জন্যে জন্ম ! তা-ও আমি কিছু বলিনি। তবু আমি কিছু বলিনি। কারণ আমার তো টেম্পোরারী চাকরি, আমার বিধবা বুড়ী মা আছে সংসারে—ওয়াইফ আছে, দুটো মাইনর ছেলে-মেয়ে আছে—আমার ও-সব কথা বলা তো ক্রাইম—

—তবু তোমার চাকরি গেল ?

—হ্যাঁ স্যার বিশ্বাস করুন, আমি সাত বছর চাকরি করার পরও টেম্পোরারী ছিলাম, তখনও আমার কনফার্মেশন হয়নি, তাই আমার চাকরি গেল। চাকরিও গেল, আর পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছিলাম স্ট্রাইক-ফাণ্ডে, তা-ও গেল—

বুঝলাম সমস্তই ছলনা ! সমস্তই মিথ্যে কথা ! সাত বছর চাকরি করার পর কেউ টেম্পোরারী থাকতে পারে ? আর শুধু স্ট্রাইক করার অপরাধেও কারোর চাকরি খতম হতে পারে না। পাঁচ টাকা স্ট্রাইক-ফাণ্ডে চাঁদা দিলেও খতম হতে পারে না। তোমরা আমাদের আমেরিকাকে যত বড় ক্যাপিট্যালিস্ট-দের দেশই বলো, সেখানেও স্ট্রাইক করার জন্যে, ধর্মঘট করার জন্যে চাকরি যায় না। আমি মনে মনে বুঝলাম ছোকরা আমাকে ব্লাফ দিচ্ছে।

তবু মুখে কিছু বললাম না। জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ?

—তারপর স্যার অনেক দরখাস্ত করলাম অনেক জায়গায়। কোথাও চাকরি পেলাম না। আর কতদিন না-খেয়ে থাকবো ! কতদিন ধার করে চালাবো। ধারও কেউ দেয় না আর। বন্ধু-বান্ধবদের তো সকলেরই প্রায়

আমার মত অবস্থা! শেষে আমার ওআইফ-এর সিরীয়াস অসুখ হলো। একদিন উপায় না দেখে ডাক্তার ডাকলাম। তখন রোগের খুব বাড়াবাড়ি। ডাক্তার দেখে বললেন—টি বি—

আবার ব্লাফ! বুঝলাম ছোকরা ফরেন টুরিস্ট পেয়ে আমার সহানুভূতি আদায় করবার চেষ্টা করছে! আমি এদের চিনি।

—তারপর ?

—তারপর এই এজেন্সিটা পেলাম।

বললাম—এজেন্সি মানে ?

চক্রবর্তী বললে—হাফ পার্সেণ্ট আমি পাই কিনা। টোট্যাল ইনকামের ওপর আমি পাই হাফ পার্সেণ্ট, বাকিটা জমা দিতে হয় অফিসে গিয়ে—

—তোমার অফিস আছে ?

—হ্যাঁ স্যার, আমি তো মাত্র কমিশন এজেণ্ট। মোটা প্রফিট্ তাদেরই—

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় তোমার অফিস ? তারা কারা ?

চক্রবর্তী হঠাৎ খুব বিনীত গলায় বললে—তাঁদের আমি নাম বলতে পারবো না স্যার, এক্সকিউজ্ মি—

—কেন ?

—না স্যার, আমাকে মাফ করবেন, তাঁদের নাম-ঠিকানা আমি কিছুতেই বলতে পারবো না। আমাকে কেটে ফেললেও না। তাঁরা আমার বিপদের দিনে কাজ দিয়ে সাহায্য করেছেন, অনেক উপকার করেছেন, নইলে এতদিনে আমি পথে বসতাম, তাঁদের নাম আমাকে বলতে বলবেন না স্যার, আমার অধর্ম হবে তাহলে—তাছাড়া আপনি তো চলে যাবেন, তারপর আমাকে কে বাঁচাবে ?

ট্যাক্সি চলছিল হু হু করে। কোথায় চলেছি, কোন্ দিকে চলেছি কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। আমার গাইড-বুকে এ-দিককার কোনও নির্দেশ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম—আর কতদূর ?

—আর বেশি দূর নয় স্যার, এসে গেছি—এবার বাঁয়ে চলো সর্দারজী।

তারপর একটু থেমে বললে—বাড়ি তো যাচ্ছি, কিন্তু গিয়ে যে কি দেখবো বুঝতে পারছি না স্যার—

—কেন ?

চক্রবর্তী বললে—সেই সকাল সাতটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি স্যার, দেখেছিলাম আমার ওআইফের তখন খুব জ্বর, আজ মা বলেছিল ডাক্তার ডেকে আনতে, বেরোবার সময় বলেছিলাম ডাক্তার ডেকে আনবো—তা সকাল থেকে যেখানে গেছি, সেখানেই শুধু হাতে ফিরে এসেছি। ভোর বেলায় মিস্টার আগরওয়ালার কাছে গিয়েছিলাম। গিয়ে বললাম—খুব ভাল আর্টিস্ট আছে, একবার দেখুন শুধু—তা কিছুতেই শুনলেন না। তিনি বললেন, তাঁর অন্য এনগেজমেণ্ট আছে—

অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলো চক্রবর্তী। ক্যালকাটার সব বড় বড় লোক, বড় বড় মিলওনারস্, বড় বড় মার্চেণ্টস্। সকলে চক্রবর্তীর ক্লায়েণ্ট। সকলের কাছে গিয়েই হাজির হলো। সেই একই কথা, এক প্রস্তাব! ভাগ্য যেদিন খারাপ হয়, সেদিন ওই রকমই হয়। চক্রবর্তীর মনে হলো টাকার যেদিন তার সবচেয়ে বেশি দরকার সেইদিন ভাগ্য যেন তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে সবচেয়ে বেশি। শেষকালে সারা ক্যালকাটা ঘুরেছে চক্রবর্তী, কোথাও কিছু কাজ মেলেনি। সব জায়গা থেকেই খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাকে। ভোর বেলা বেরিয়েছে, তারপর সারা দিন আর খাওয়া হলো না। সারা দিনটাই উপোস করে কেটে গেল চক্রবর্তীর।

চক্রবর্তী বললে—অথচ টাকা না হলে আমার চলবে না, শেষে হতাশ হয়ে যখন বাড়ি ফিরবো কি না ভাবছি, হঠাৎ মনে হলো আপনার হোটেলের ভেতরে গিয়ে একবার খবর নিয়ে দেখি কেউ ফরেন টুরিস্ট আছে কিনা। হুকুমালী বললে—আজ বিকালেই একজন আমেরিকান টুরিস্ট এসেছে। তাকে একটা টাকার লোভ দেখিয়ে শেষে আপনার···

বললাম—ডোণ্ট ট্রাই টু ব্লাফ মি, আমাকে ধাপ্পা দিতে চেষ্টা কোরো না—আমি তোমাকে এখনও সাবধান করে দিচ্ছি—তোমার কান্না শুনে আমি ভুলবো না, আমি আমেরিকান—

চক্রবর্তী বললে—কেঁদে আপনাকে ভোলাতে চেষ্টা করছি না স্যার, কান্না শুনলে আজকাল ইণ্ডিয়ানরাও ভোলে না স্যার, বিশ্বাস করুন স্যার, আমি আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলবো না, জেলে যেতে আমার একটুও আপত্তি নেই, কিন্তু আমি জেলে গেলে যে মা, বউ, ছেলেমেয়ে সবাই মারা যাবে স্যার—বিলিভ মি, ভগবানের নামে শপথ করে বলছি—

বলতে বলতে চক্রবর্তী হঠাৎ ড্রাইভারকে বললে—থামো—

ট্যাক্সিটা থেমে গেল।

চক্রবর্তী বললে—নেমে আসুন স্যার, এখানটায় বড় কাদা, গাড়ি ভেতরে যাবে না, আর মিনিট পাঁচেক হাঁটতে হবে—

সে এক অদ্ভুত জায়গা। ক্যালকাটা সিটির মধ্যে যে অমন জায়গা আছে, তা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না, না দেখলে। চৌরঙ্গীর হোটেলের টেরাসে বসে সে জায়গার স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব।

চক্রবর্তী বললে—আপনি এখানে একটু দাঁড়ান, আমি নিজে সার্টিফিকেটটা এনে দেখাচ্ছি—

কথাটা শুনে আমি চক্রবর্তীর কোটটা চেপে ধরলাম। আমার মনে হলো ছোকরা এবার সত্যিই পালিয়ে যাবার মতলব করছে। বললাম—নো নো, আই ডোণ্ট বিলিভ ইউ—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, আমি যাবো তোমার সঙ্গে—

তাহলে আসুন—

বলে চক্রবর্তী আমার আগে আগে চলতে লাগলো? আর আমি তার পেছনে। অন্ধকার রাত। দু-একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো আমাদের দেখে। কয়েকটা গরু রাস্তার ওপর বসে বসে জাবর কাটছে। রিস্ট-ওয়াচটার দিকে চেয়ে মনে হলো রাত বোধহয় তখন দেড়টা—মিড-নাইট—

হঠাৎ চক্রবর্তী পেছন ফিরলে।

বললে—একটা কথা কিন্তু রাখতে হবে স্যার—

আবার ব্লাফ। আবার ধাপ্পা। ভাবলাম এই মিডল্ ক্লাস বেঙ্গলীজ আর ভেরি শ্লাই—এদের মতন ধড়িবাজ জাত আর দুনিয়ায় দুটি নেই। কিন্তু আমিও অ্যাডামাণ্ট, আমিও নাছোড়বান্দা। ভাবলাম যা থাকে কপালে, আমি এর শেষ দেখবোই—

বললাম—কী কথা?

—দেখুন, বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মাকে বলেছিলুম যে, আমি আফিস থেকে আসবার সময় ডাক্তার নিয়ে আসবো। আমি আপনাকে দেখিয়ে বলবো—এই ডাক্তার এনেছি—

বাঙালীদের ধড়িবাজির কাছে হার মানবো না, এই প্রতিজ্ঞা করেই বললাম—ঠিক আছে চলো—

—আর একটা কথা!

চক্রবর্তী আবার থমকে দাঁড়াল।

বললে—আর একটা কথা, আপনি যেন বলে দেবেন না যে, আমি এই আর্টিস্ট সাপ্লাই-এর কমিশন-এজেন্সি করি!

—কেন? তারা কেউ জানে না?

—না স্যার, কেউ জানে না! আমার মা জানে না, ওয়াইফ জানে না, ছেলেমেয়েরা জানে না। এমন কি পাড়ার লোকেরাও জানে না—তারা জানে আমি ইনসিওরেন্সের এজেন্সি করি—

বললাম—ঠিক আছে, তোমার কথাই রইলো—

আমি তখন যে-কোন অবস্থার জন্যেই তৈরি হয়ে রয়েছি। সুতরাং আমি আপত্তি করবো কেন?

চক্রবর্তী একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো।

—মা, মা—ওমা—

ভেতর থেকে একটি ফিমেল্-ভয়েস্ শোনা গেল।

—কে? খোকা? খোকা এলি?

আমি বাঙলা জানি না তবু আন্দাজ করতে পারলাম।

দরজা খুলতেই দেখি একজন বুড়ী হাতে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখেই যেন বিব্রত হয়ে গেল। বুঝলাম—চক্রবর্তীর মাদার।

মা বললে—হাঁ রে, এই এত রাত্তির করতে হয়। আমি এদিকে ভেবে-ভেবে অস্থির, বৌমা ছটফট করছে—এই এখন একটু ঘুমলো—

চক্রবর্তী বললে—আফিসের কাজে একটু দেরি হয়ে গেল মা—

বলে চক্রবর্তী ভেতরে ঢুকলো। আমার দিকে চেয়ে বললে—আসুন স্যার—

তারপর মা'র দিকে চেয়ে বললে—এই ডাক্তারবাবুকে একেবারে ডেকে নিয়ে এলাম মা—

চক্রবর্তীর মা আমার দিকে চেয়ে দেখলে এবার ভালো করে। তারপর বললে—হাঁ রে খোকা, তুই সাহেব ডাক্তার আবার নিয়ে এলি কেন, আমাদের পাড়ার ফণি ডাক্তারকে ডাকলেই হতো—হোমিওপ্যাথিতেও তো রোগ ভালো হচ্ছে আজকাল—

—তা হোক মা—

বলে আমাকে চক্রবর্তী ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। আমি ঘরের ভেতরের

চেহারাটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ঘরের মেঝের ওপর ছোট ছোট দুটো বেবি শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে। খালি গা, কম্‌প্লিটলি নেকেড। বুকের পাঁজরাগুলো গোনা যায়। আর তক্তপোশের ওপর বিছানায় চক্রবর্তীর ওয়াইফ শুয়ে আছে। চোখ দুটো আধ বোজা। বেশি বয়েস নয়—কিন্তু সমস্ত মুখখানা যেন রক্তহীন—ব্লাডলেস। কী প্যাথেটিক সিন। পৃথিবীতে এ-রকম দৃশ্য যে থাকতে পারে, তা আমেরিকানরা ভাবতেও পারে না—কল্পনাও করতেও পারে না। একটা ঘরের মধ্যেই সমস্ত। সমস্ত সংসারটা যেন সেই একখানা ঘরের মধ্যেই শেষ। যেন নিশ্বাস, হাওয়া, প্রাণ, আনন্দ, যন্ত্রণা সব একটা ঘরের চারটে দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

চক্রবর্তী হঠাৎ বললে—মা, ট্রাঙ্কের চাবিটা দাও তো—

মা চাবিটা দিয়ে বললে—ট্রাঙ্কের চাবিটা আবার কি করবি এখন?

—একটা জিনিস বার করবো।

বিছানার এক কোণে ওপর-ওপর ট্রাঙ্ক সাজানো ছিল দুটো। চক্রবর্তী বিছানার ওপর উঠে চাবি দিয়ে ট্রাঙ্ক খুললে। তারপর ভেতর থেকে সব জিনিসপত্র বার করতে লাগলো একে একে। নানা বাজে জিনিসের স্তূপ। অনেক খুঁজে অনেক চেষ্টা করে বললে—এই যে পেয়েছি স্যার—পেয়েছি—

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বি-এ ডিগ্রীখানা গোল করে একটা কাগজে সযত্নে মোড়া ছিল। সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিলে চক্রবর্তী।

আমি সেটা হাতে নিয়ে কিন্তু আর খুলে দেখলাম না। আর খুলে দেখতে প্রবৃত্তিও হলো না। আমি যেন তখন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি। আমায় যেন কেউ আফিম খাইয়েছে! আমার যেন সেখান থেকে আর নড়বার ক্ষমতাও নেই। অস্থিচর্মসার একটা শরীর। প্রাণ তাতে আছে কি নেই বোঝা যায় না! শরীরটা কুঁচকে বেঁকে শুয়ে আছে। মনে হলো ও যেন চক্রবর্তীর ওয়াইফ নয়। ও যেন একজন টি বি পেসেন্ট নয়। একটা উদ্ধত নোট-অব-ইন্‌টারোগেশান! বিংশ শতাব্দীর মডার্ন সভ্যতার সামনে যেন একটা সুতীক্ষ্ণ নোট-অব-ইন্‌টারোগেশান ছাড়া কিছু নয়।

চক্রবর্তী আমার কাছে সরে এল এবার।

বললে—ওটা খুলে দেখুন স্যার—দেখবেন জেনুইন ডিগ্রী—ভাইস-চ্যান্সেলারের সই আছে নিচেয়—

আমি তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম ঘরের মধ্যে।

চক্রবর্তী চুপি চুপি বললে—আপনি একটা কিছু কথা বলুন স্যার, নইলে আমার মা'র সন্দেহ হবে।

হঠাৎ একটা বেবি কেঁদে উঠলো। চক্রবর্তীর মা গিয়ে কোলে নিয়ে ভুলোতে আরম্ভ করেছে। ততক্ষণে তার কান্না শুনে আর একটা কাঁদতে শুরু করলো। সেই কান্নায় যেন সমস্ত পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো সেই রাত দেড়টার সময়। ভুলে গেলাম আমি আমেরিকান। ভুলে গেলাম আমি টুরিস্ট, ভুলে গেলাম আমি ফরেনার। ভুলে গেলাম এ আমার প্রোগ্রামের বাইরে। ভুলে গেলাম আমার গাইড-বুকে এ জায়গার নির্দেশ-সূত্র নেই। তবু সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম।

—স্যার!

চক্রবর্তীর গলার আওয়াজে আমি যেন আবার আমার সেন্স ফিরে পেলাম।

বললাম—এসো, বাইরে এসো—

চক্রবর্তী বাইরে এল আমার পেছন-পেছন।

বললাম—তোমার ওয়াইফকে হসপিট্যালে পাঠাও না কেন? এ রোগীকে কি বাড়িতে রাখতে আছে! এর ঘরে ছেলেমেয়ে-মা সবাই থাকা এটাও তো ডেঞ্জারাস—

চক্রবর্তী বললে—হসপিট্যালে আমার কারো সঙ্গে জানা-শোনা নেই স্যার—কোনও মিনিস্টার যদি একটু লিখে দেন, তাহলেই হয়ে যায় কিংবা কোনও এম-এল-এ—

আমি আর কী বলবো। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম—প্রায় সাতশো টাকা রয়েছে। তাড়াতাড়ি টাকাগুলো চক্রবর্তীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—এই টাকাগুলো নাও চক্রবর্তী। চক্রবর্তী, কিপ ইট্, তোমার ওয়াইফের চিকিৎসা কোরো—

টাকাটা চক্রবর্তীর হাতে জোর করে গুঁজে দিলাম।

চক্রবর্তী কিছুতেই নেবে না। বললে—আমি এ নিতে পারবো না স্যার, এ আপনি কী করছেন—

শেষপর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে তাকে টাকাটা দিয়ে আমি আবার ফিরে এলাম ট্যাক্সিটার কাছে। ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়েছিলাম।

চক্রবর্তী আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। আমি বললাম—আচ্ছা, তোমার ওয়াইফ ছেলেমেয়েদের খেতে দাও না কেন?

চক্রবর্তী হাসলো এতক্ষণে। বললে ফ্রান্সের রানীও একবার ওই কথা বলেছিল স্যার, বইতে পড়েছি—

আমি বললাম—না, আমি সে-কথা বলছি না—আমেরিকা থেকে আমরা লক্ষ লক্ষ টন গম, চাল, পাউডার মিল্ক পাঠাই ইণ্ডিয়াতে—সে-সব তো তোমাদের জন্যই পাঠাই, তা তোমরা খাও না কেন?

চক্রবর্তী একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে—খবরের কাগজে পড়েছি আপনারা পাঠান—

বুঝলাম ঠিক জায়গায় পৌছায় না সেগুলো।

বললাম—ঠিক আছে, কাল ছ'টার সময় আমি চলে যাচ্ছি ক্যালকাটা ছেড়ে, তুমি তিনটের সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারো? পজিটিভলি ঠিক তিনটের সময়? ইউ মাস্ট।

চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলে—কেন, কি জন্যে বলছেন?

—আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে চাই, আরো কিছু টাকা। যা ছিল কাছে তা তোমাকে দিয়ে গেলাম, কালকে হোটেলে তোমাকে আরো তিন শো দিতে পারি! আই ওয়াণ্ট টু হেল্প ইউ—

চক্রবর্তী কিন্তু-কিন্তু করছিল, কিন্তু আমি তাকে রাজি করালাম জোর করে।

ট্যাক্সির ভেতরে আর একবার মনে করিয়ে দিলাম—ঠিক তিনটের সময় এসো কিন্তু, আমি ওয়েট করবো তোমার জন্যে—ঠিক তিনটে—

ঘড়িতে দেখলাম—রাত তখন হাফ-পাস্‌ড্‌ টু। আড়াইটে কাঁটায়-কাঁটায়।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙতে দেরি হলো। সকালে আর কোথাও বেরোলাম না। হুকুমালী সামনে আসতে একটু সঙ্কোচ করছিল। কিন্তু খানিক পরে সে-সঙ্কোচ কেটে গেল। যে-সব জায়গা দেখবো বলে ঠিক করেছিলাম সে-সব কিছুই দেখা হলো না। হুগলী রিভার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল, বোটানিক্যাল গার্ডেনস, লেকস্‌, রেস কোর্স, গান্‌টি-ঘাট—কোথাও গেলাম না। রাত্রে যে-বিউটিফুল ক্যালকাটা দেখেছি, তার কাছে আর সব যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। শুধু টেরাসের ওপর দাঁড়িয়ে গভর্নরস্‌ হাউসটা দেখতে লাগলাম একদৃষ্টে। আর সামনে ময়দান। ফোর্ট উইলিয়ম, পলাশী গেট—

যথারীতি ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ খেয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম ঘরের মধ্যে। আমার গাইড এসে ফিরে গেল।

বললাম—আমি নিজেই সাইট্-সীয়িং করে এসেছি—

হুকুমালীও দু-একবার উঁকি মেরে দেখে গেল।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম—তিনটে বাজে। চক্রবর্তী আসবে। বাকি তিনশো টাকা রেডি করে রেখে দিয়েছি পকেটে।

আর যেন দেরি সয় না। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম তিনটে বেজে গেছে। তিনটে পনেরো। তিনটে কুড়ি। থ্রি-থার্টি!

আমি উঠলাম। আর দেরি করা যায় না। এয়ারপোর্টের বাস আসবে। প্লেন ছাড়বে ছ'টায়। তার আগেই তৈরি হয়ে নিতে হবে।

হঠাৎ হুকুমালী এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম—কে চিঠি দিলে?

হুকুমালী বললে একজন বাবু এসে নিচে ম্যানেজারের কাছে চিঠিটা দিয়ে গেছে। চিঠিটা সীল করা। খাম ছিঁড়তেই অবাক হয়ে গেলাম। ভেতরে আমার দেওয়া সেই সাতশো টাকা। সাতটা একশো টাকার নোট! আর সঙ্গে একটা চিঠি। লিখেছে এ সি চক্রবর্তী—আর্টিস্ট সাপ্লায়ার।

লিখেছে—

ডিয়ার স্যার,

কালকে আপনার দেওয়া সাতশো টাকা ফেরত পাঠালাম পত্রবাহক মারফত। আজকে তিনটের সময় আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতিও রাখতে পারলাম না। কারণ কাল শেষ রাত্রের দিকে আমার স্ত্রী মারা গেছে। আপনাকে ধন্যবাদ। ইতি—

এই। এইটুকু শুধু। আর কিছু নয়।

আমি চিঠিখানা আর টাকাগুলো হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম! কিছু ভাবতে পারলাম না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আমার যেন জ্ঞান ফিরে এল। হঠাৎ খেয়াল হলো সাড়ে চারটে বেজেছে। হোটেলের সামনে এয়ারপোর্টের বাস এসে পৌঁছেছে। হুকুমালী আমার স্যুটকেশ নিয়ে নেমে চলে গেল।

বললাম—তারপর?

মিস্টার রিচার্ড বললেন—তারপর তো এই যাচ্ছি—।

তারপর হঠাৎ যেন বড় এক্সাইটেড হয়ে উঠলেন মিস্টার রিচার্ড।

বললেন—কিন্তু আমি আজ আপনাকে বলে রাখছি—দিস্ ইজ রং, দিস্

ইজ্ ক্রিমিন্যাল—এ অন্যায়, এ সততা পাপ—এ অনেস্টির কোনও দাম নেই মডার্ন পৃথিবীতে—দিস্ ইজ্ রং—দিস্ ইজ্ ক্রিমিন্যালি রং—

মিস্টার রিচার্ডের চিৎকারে আশেপাশের অন্য সিট থেকে সবাই আমাদের দিকে চেয়ে দেখলে। কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম। ষোল হাজার ফুট ওপরে উঠে মাটির পৃথিবীর মানুষের সমস্যা নিয়ে ভাবাও যেন বিলাসিতা বলে মনে হলো আমার কাছে। এই দামী ডিনার আর লেমন-স্কোয়াশ খেতে খেতে দেশের কথা নিয়ে তর্ক করাও যেন অপরাধ। চোখের জল ফেলাও ক্রাইম! আমি চুপ করে রইলাম তাই।

অনেকক্ষণ পরে মিস্টার রিচার্ড আবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা একটা কথার জবাব দিন তো?

—কী?

—আমরা যে লক্ষ লক্ষ টন হুইট, রাইস আর পাউডার-মিল্ক পাঠাই ইণ্ডিয়ার গরিব লোকদের জন্যে, সেগুলো কারা নেয়? সেগুলো গরিবদের হাতে পৌঁছয় না কেন? কে তারা? হু আর দে?

এরই বা আমি কী জবাব দেব। প্লেনের ভেতরে আমরা সবাই তো ফরসা দামী কোট-স্যুট-টাই-ট্রাউজার পরে বসে আছি। সবাই মোটা দাম দিয়ে টিকিট কিনেছি। কিনে লেমন-স্কোয়াশ খেয়েছি, টফি খেয়েছি, ডিনার খেয়েছি। ডিনারের পর কফিও খেয়েছি। আমাদের কী অধিকার আছে এ-আলোচনা করবার। ভাবলাম বলি—সাহেব, তুমি একদিনের জন্যে কলকাতা দেখে গিয়েই তোমার এই অবস্থা, আর আমরা জন্ম কাটিয়েছি কলকাতায়, মনুষ্যত্বের এ-অপমান আমরা প্রতি মুহূর্তে দেখছি। তাই আমাদের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে, আমাদের গায়ের চামড়া মোটা হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ও-সব কথা থাক্, এসো, অন্য কথা বলি—লেট আস্ টক্ শপ্—

কিন্তু সে-সব কথাও বললাম না।

সামনে আলো জ্বলে উঠলো—আলোর মধ্যে লেখা ফুটে উঠলো—ফ্যাসেন্ ইয়োর বেল্টস্—। আমরা যে-যার নিজের নিজের পেটে বেল্ট বেঁধে নিলাম।

বাইরে চেয়ে দেখলাম—বোম্বে সিটির আলোগুলো হীরের টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। প্লেন নামতে শুরু করেছে। স্যাণ্টাক্রুজে পৌঁছে গেলাম এক-মুহূর্তের মধ্যে।

বিয়ের তারিখে

প্রতিভা বসু

. . . .

আজ পঁচিশে বৈশাখ। না, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ব'লে না, আজ লতিকার বিয়ের তারিখ। বছর ঘুরে এই প্রথম ফিরে এসেছে সেই দিন, যেদিন তার তেইশ বছরের শ্রান্ত ক্লান্ত মাস্টারি-জীবনের অবসান ঘটেছিলো। সুখী! সুখী! এর চেয়ে সুখ মানুষে কি আর আশা করতে পারে? অকৃপণ ভাগ্যের কাছে লতিকা আনত হ'লো।

শাড়ি, জামা, ভেলভেটের চটি—সব-কিছুতে অনেক বারের মতো আরো-একবার ছোটো মেয়ের আনন্দ নিয়ে হাত বুলোলো সে। এগুলো তার বিয়ের তারিখের উপহার। রমেন কিনে এনেছে। হঠাৎ নিজের খুশিতেই নিজে ছোটো ক'রে হেসে উঠলো একা ঘরে, তারপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো বিছানার উপর। বালিশে মুখ গুঁজে, চোখ বুজে কী যেন নিবিড় ক'রে অনুভব করবার চেষ্টা করলো মনে-মনে। ঈশ! আজ যদি সারাটা দিন রমেনকে নিজের কাছে ধ'রে রাখতে পারতো! ছাই চাকরি। যেতেই হবে—যেতেই হবে। রোজ যেতে হবে নিয়ম ক'রে! বিষ্যুৎবার না-হ'য়ে আজ তো রবিবারও হ'তে পারতো! রমেনের আপিশে যাবার অনিচ্ছুক চেহারাটি চোখে ভেসে উঠলো। ভাত খেয়ে, আঁচলে মুখ মুছে কী বিরস মুখেই সিঁড়ি দিয়ে নামলো মানুষটা। যেতে-যেতে ফিরে-আসা বারে-বারে ফিরে-চাওয়া চুম্বনের দীর্ঘতা—রোমাঞ্চ হ'লো লতিকার।

কিন্তু না—এখন শুয়ে থাকবার সময় না। ক-ঘণ্টা আছে আর? সাড়ে-দশটা কখন বেজে গেছে, বেলা পাঁচটা তো এক্ষুনি হুড়মুড়িয়ে এসে পড়বে ঘোড়ায় চ'ড়ে। এই উৎসবের জল্পনা-কল্পনা তো তার আজকের নয়, ছ'মাস ধ'রে সে মনে-মনে সযত্নে লালন করেছে এই ইচ্ছাটি। নিমন্ত্রণের লিস্ট থেকে তাই কোনো বন্ধুকেই বাদ দেয়নি। বিয়েটা নেহাৎ নীরবে হয়েছিলো, নিজের বিয়ে যেখানে নিজেকেই দিতে হয়, সেখানে হৈচৈ করাও অসুবিধে, তা ছাড়া টাকা? সেটাও তো কম সমস্যা নয়? তাই সব আকাঙ্ক্ষা তার বুকের মধ্যেই জমা ছিলো। আজ সব সে সার্থক করবে। কিন্তু নিটোল নিখুঁত এই অবিমিশ্র আনন্দের দিনটির মধ্যে একটিমাত্র ফাটল সুমিতা। সুমিতাকেই শুধু বলা হ'লো

না। অথচ কুমারী-জীবনে এই সুমিতাই তার প্রিয়তম ছিলো। তাদের বন্ধুত্ব নিয়ে কম ঠাট্টা করেনি বোর্ডিং-এর অন্য মেয়েরা, গুরুজনরা কম বিরক্ত হননি তাদের বাড়াবাড়িতে। আর সেই বাড়াবাড়িটা রমেনও শেষ পর্যন্ত বরদাস্ত করতে পারলো না। প্রথম-প্রথম বোধ হয় কৌতুক বোধ করেছিলো, শনিবার-শনিবার নিজে গিয়েও কত বার সুমিতাকে নিয়ে এসেছে বাড়িতে, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সে-কৌতুক তার উবে গেলো। সুমিতার নামও এখন সে সহ্য করতে পারে না। আজ ঘুরে-ফিরে কত বার লতিকার মনে হয়েছে 'সুমিতা-কেও বলি', কিন্তু অভিমান বাধা দিয়েছে। আশা করেছিলো আজকের দিনে হয়তো রমেন নিজে থেকেই বলবে সুমিতার কথা, অন্তত লতিকার মনের দিকে তাকিয়ে তার বলা উচিত ছিলো বৈকি। তার উপর রাগ ক'রেই তো বাড়িতে ডাকে না সুমিতাকে, খোঁজ নেয় না—খবর করে না—সত্যি বলতে এ-বাড়ি তাদের দু-জনের, অতিথিকে যেখানে দু-জনেই সমান প্রসন্নতায় গ্রহণ করতে পারবে না সেখানে তাকে নিমন্ত্রণ করা তো শুধু বিড়ম্বনা নয়, অসম্মানও করা হয় তাতে। আর কে? সুমিতা। লতিকার কুমারী-জীবনের সুখ-দুঃখের যে একমাত্র অন্তরঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গী। লতিকা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

মেয়েদের বন্ধুতার তো এই মূল্য। যত স্বাধীনই হও, যত লেখাপড়াই শেখো, স্বামীর মতামতই তোমার জীবনে অগ্রগণ্য। এই আট মাসের মধ্যে একই শহরে থেকে তা নইলে সুমিতার সঙ্গে তার দেখা হয় না। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী আছে! কাল গৌরীদিকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে সে প্রথম জানলো সুমিতা বোর্ডিং ছেড়ে আজ চার মাস যাবৎ ধরমতলায় বাড়ি নিয়েছে, লতিকার কী মাথা কাটা যায়নি ঠিকানা জিগ্যেস করতে? কিন্তু তাই ব'লে সবটাই কি রমেনের দোষ? তার মনেরও কি কোনো পরিবর্তন হয়নি? বুকে হাত দিয়ে বলো তো, লতিকা, তোমারই কি মন আছে কোনো দিকে? 'বৈষ্ণব কবিতায় যেখানে একটি সুতোর ব্যবধানও অসহ্য, সেখানে এই একটা আস্ত মানুষ।'—কথাটা রমেনই না-হয় বলেছিলো, কিন্তু শেষের দিকে সুমিতার ঘন-ঘন যাতায়াতে তুমিও কি মনে-মনে খুব সুখী ছিলে? রমেন! রমেন! রমেন ছাড়া তুমি কী ভাবো? কী ছাখো? কী চাও? কিচ্ছু না। এ-বাড়ি রমেনের, এ-ঘর রমেনের, এই বালিশ, এই বিছানা—রমেনকে ঘিরে-ঘিরেই তো তোমার অস্তিত্ব।

কেন এমন হয়? আজকের এই বিয়ের তারিখের স্বামীবিরহিত সময়টুকুতে

বন্ধুর জন্য মন কেমন ক'রে উঠলো লতিকার। কত পুরোনো কথা মনে পড়লো। কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি। কাল রমেনকে সঙ্গে ক'রে সকলকে ব'লে এলো, কেন সে সুমিতার কাছে গেলো না? সে যেতে চাইলে কি রমেন আপত্তি করতো?

ঝি এসে স্নানের তাড়া দিলো, সিল্কের বেড-কভারে ঢাকা যুগল শয্যার আরাম থেকে লতিকা সচেতন হ'য়ে উঠে বসলো। খেয়ে উঠে আবার মার্কেটে যেতে হবে। ফুল আনতে হবে, আর তার চেয়েও জরুরি একটা অপ্রত্যাশিত উপহার কিনতে হবে রমেনের জন্য। লতিকা আর এক মুহূর্তও নষ্ট করলো না। তক্ষুনি স্নানের জন্য প্রস্তুত হ'লো।

আগে, একেবারে বিয়ের প্রথম-প্রথম দুপুরে একবার বাড়ি আসতো রমেন। তাদের ডকের কাজে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য এ-সময়ে ছুটি থাকে লাঞ্চের। সে-খাওয়াটা সে বাড়ি এসে খেতো। এখন আর আসে না। মিছিমিছি ট্যাক্সিতে অনেকগুলো পয়সা নষ্ট, তা ছাড়া ছুটোছুটির পরিশ্রমও কি কম? মার্কেট থেকে ফেরবার পথে রজনীগন্ধা ফুলের ঝাড় হাতে নিয়ে বাস্-স্টপে দাঁড়িয়ে সে-সব কথা মনে পড়লো লতিকার। লাল টুকটুকে ব্যাগের মুখটা ফাঁক ক'রে স্বামীর জন্য কেনা মূল্যবান উপহারটি আরো-একবার উঁকি মেরে দেখলো। সুন্দর। খুব সুন্দর। একেবারে মনের মতো। আংটির মাথায় অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতো নীলচে জ্যোতিতে জ্ব'লে উঠবে এ-রকম হিরের শখ রমেনের অনেক দিনের। গোপনে টিউশনি ক'রে প্রত্যেকটি টাকা লতিকা তিলে-তিলে সঞ্চয় করেছে এ-জন্য। আংটিটি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে-দেখতে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। ঘড়িতে চোখ রাখলো, একটা-চল্লিশ। রমেনের সঙ্গে দেখা হ'তে এখনো তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিট বাকি। কী দীর্ঘ বেলা!

একটু ভেবে বাড়ি যাবার বাস্ ছেড়ে দিয়ে উল্টো দিকে ধরমতলার বাসে উঠলো। যথেষ্ট সময় আছে, তিনটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছতে পারলেই হ'লো।

কতটুকু-বা রাস্তা। পাঁচ মিনিটে এসে গেলো বাস্। আন্দাজ-মতো জায়গায় নেমে একটু খোঁজাখুঁজিতেই পাওয়া গেলো বাড়িটি। রাস্তা থেকে সোজা সিঁড়ি উঠে গেছে তেতলা পর্যন্ত। বাঁ-দিকের ফ্ল্যাটে স্যুট-নম্বর মিলিয়ে কয়েক বার টোকা দিতেই একজন পার্শি মহিলা কুঞ্চিত চোখে দরজা খুলে দিলেন। বোধ হয় দিবানিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে, তাই এত বিরক্ত। গোটা ফ্ল্যাটটি তাঁরই, মাত্র একখানা ঘর সাব-লেট করেছেন সুমিতাকে। আঙুল তুলে আলাদা এনট্রেন্সটি দেখিয়েই ঠাস ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। খেয়ে উঠে রোদ্দুরে

ঘোরাঘুরিতে গলা যেন শুকিয়ে গিয়েছিলো লতিকার, এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জলের জন্য প্রাণ অস্থির হ'য়ে উঠলো। প্রায় পাথায় ভর ক'রে সে নীল পর্দা-ঢাকা নির্দিষ্ট দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো, কিন্তু দাঁড়াতেই চমকে উঠলো। দরজাটি অর্ধেক খোলা, ভিতরে কথা বলছে দু-জন। বোঝা গেলো মানুষ দুটি প্রায় দরজার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে, তা নইলে কথাগুলো এত স্পষ্ট হ'য়ে তার কানে পৌঁছতো না। মুহূর্তে লতিকার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। নিশ্বাস এত ঘন আর গভীর হ'লো যেন এক্ষুনি বুক ফেটে যাবে। হাত দুটো মুঠো ক'রে বুকের উপর চেপে ধরলো, শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত ক'রে নিজেকে সামলালো।

'আমি কিন্তু আজ বিকেলে আসবো না।'

'কেন? কী এমন রাজকার্য আছে?'

'রোজই তো আসি, একদিন না-হয় না-ই এলাম।'

'ন্‌না।'

'ন্‌না?

হাওয়ায় ঈষৎ আন্দোলিত হ'লো মোটা পর্দা। কানের ভুল হ'তে পারে, কিন্তু চোখ? দাঁতে দাঁত লেগে এলো লতিকার। মুহূর্তের জন্য একটা উন্মাদ ইচ্ছে হ'লো পর্দা ছিঁড়ে ভেতরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একবার দাঁড়ায় স্বামীর মুখোমুখি।

তারপর কখন কেমন ক'রে যে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছিলো রাস্তায়, কেমন ক'রে বাসে উঠে বসেছিলো কিচ্ছু তার মনে নেই। গড়ের মাঠের কাছে এসে কণ্ডাকটার যখন টিকিট চাইলো, নিজের দুটি শূন্য নিরবলম্ব হাতের দিকে তাকিয়ে তার হুঁশ হ'লো ব্যাগ তো নেই। চোখ-জুড়ানো সবুজ ডাঁটার মাথার উপর চার-পাপড়ির শাদা, স্নেহের মতো নরম রজনীগন্ধা, নীলচে জ্যোতির হিরে কোথায় গেলো সব? কোথায় গেলো?

পঁচিশে বৈশাখের বেলা দুটোর প্রচণ্ড রোদ্দুরে, এক-বুক তৃষ্ণা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত লতিকা আবার রাস্তায় নেমে দাঁড়ালো। চব্বিশ বছরের দুঃসহ জীবনটাকে কি এই মুহূর্তে মুছে ফেলা যায় না ইচ্ছে করলে?

এক পো দুধ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

. . . .

ব্যবস্থাটা লতিকাই করল প্রথমে। স্বামীর জন্যে একপো দুধ রোজ ক'রে বসল। দেড়পো দুধ খুকীর জন্যে রাখতেই হয়। দেড় বছরের শিশুকে খালি সাগু বার্লি খাইয়ে তো আর রাখা যায় না, তার থেকেও দু'চার চামচ চায়ে ব্যয় হয়। সস্তা মিল্ক পাউডার দিয়ে চা খেতে খেতে সকাল সন্ধ্যায় দু'কাপ চা মাঝে মাঝে একেবারেই বিস্বাদ হয়ে আসে বিনোদের। একদিন গোয়ালা দুধ দিয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীকে সে বলল, 'এক চামচ দুধ দিয়ে আজ চা করো দেখি।'

দুধ দেওয়ার বদলে লতিকা মুখ ঝামটা দিল,—'তোমার যেমন কথা! দুধ পাব কোথায়? কত যেন সেরে সেরে দুধ রাখা হয়! খুকীর জন্যে এই তো এক ফোঁটা দুধ, তাও যদি তোমার চায়ে দিই, তা হলে ও খায় কি?'

বিনোদ বলল, 'থাক থাক, আর চেঁচিয়ো না।'

দিন দুই চুপচাপ কাটল। লতিকা দেখল স্বামীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। খাটতে খাটতে লোকটির চেহারা একেবারে হাড্ডীসার হয়ে গেছে। এই তো ত্রিশ-বত্রিশ বছর মোটে বয়স। এরই মধ্যে বিনোদের দু'গাল ভেঙেছে, চোয়াল জেগেছে, কেমন যেন বুড়ো-বুড়ো হয়ে গেছে দেখতে। লোকটির দিকে যেন আর তাকানো যায় না।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিন দিনের দিন ভোর বেলায় হাতলভাঙা চায়ের কাপটি ঠিক অন্যদিনের মতই স্বামীর সামনে এনে রাখল লতিকা। বিনোদ দেখে অবাক্। চায়ের কাপে চা নয়, কানায় কানায় ভর্তি দুধ!

বিনোদ বলল, 'এ আবার কি! খুকীর দুধ দিলে নাকি সবটুকু!'

লতিকা বলল, 'না না, তুমি খাও। খুকীর দুধ দেব কেন, তোমার জন্যে আলাদা ক'রে রেখেছি। যা ছিরি হয়েছে তোমার, সপ্তাখানেক কি পনের দিন খেয়ে দেখ। চেহারাটা যদি একটু ফেরে।'

এবার আর সামনে এক কাপ দুধ দেখল না বিনোদ, দেখল দুধসাগর। স্ত্রীর গোপন হৃদয়ের প্রেম-সাগরের প্রতিরূপ। কবে যে সে লতিকাকে বিয়ে করেছিল, তা ভুলেই যেতে বসেছিল বিনোদ। আজ ফের মনে পড়ল।

লতিকার চোয়াল-জাগা ফেকাসে মুখ, বার বছর আগেকার কুঙ্কুম-চন্দনে সাজানো আর-একটি মুখের কথা তাকে মনে করিয়ে দিল। বিবর্ণ কোটরগত দু'টি চোখ দেখে মনে পড়ল শুভদৃষ্টির সময়কার একটি ষোড়শী কমলাক্ষীকে।

বিনোদ বলল, 'কিন্তু খরচ বেশি পড়ে যাবে যে।'

লতিকা বলল, 'যায় যাবে। তুমি রোজগার কর, তোমার জন্যে সংসারের খরচ যদি একটু বাড়ে, বাড়লই বা।'

আর কিছু না ব'লে দুধের কাপে চুমুক দিল বিনোদ।

একটু দূরে দরজার কাছে মেঝের ওপর মাদুর পেতে স্কুলের পড়া পড়ছে সুনীল। বিনোদের ন'বছরের ছেলে। ওর পরে আর খুকীর আগে আরো যে তিন-তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল, তারা কেউ নেই ; সুনীল পাড়ার হাইস্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে। অনেক চেষ্টাচরিত্র ক'রে ওর হাফ-ফ্রী-শিপ যোগাড় করেছে বিনোদ। বইপত্রও সব কিনে দিয়েছে।

ইংরেজী গ্রামার পড়তে পড়তে বাপের দুধ খাওয়ার দিকে সে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তারপর নিজেই লজ্জা পেয়ে, ফের গলা ছেড়ে আরো জোরে জোরে পড়তে লাগল, Lion—Lioness, Lion—Lioness, Fox—Vixen, Fox—Vixen.

বিনোদ একটু কাল ছেলের জেণ্ডার-পাঠ কান পেতে শুনল, তারপর বলল, 'তুই একটু খাবি নাকি দুধ, ও সুনীল।'

সুনীল মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'না, তুমি খাও। আমার দুধ লাগবে না। Fox—Vixen, Fox—Vixen.'

বিনোদের লজ্জা দেখে লতিকা বলল, 'তুমি খাও, ওর জন্যে আবার আর একদিন রেখে দেব। পরীক্ষার সময় আমার সোনার জন্যে রোজ দুধ রাখব।'

সুনীল মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'আমার জন্যে কারো দুধ রাখতে হবে না। আমি দুধ খাইনে। Dog—Bitch, Dog—Bitch.'

বিনোদ এবার কেন যেন ধমক দিয়ে উঠল, 'ওই কয়েকটা কথা মুখস্থ করতে তোর কতক্ষণ লাগবে ? কাল রাত্রেও তো ওই gender-ই পড়েছিস।'

বিনোদের ছোট ভাই বিজন ওঠে একটু দেরিতে। হাতমুখ ধুয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে এসে ঢুকল ; 'কি বউদি, চা-টা হয়ে গেল নাকি তোমাদের ?'

বি. এ. পাস ক'রে বিজন বছর দুই যাবৎ বেকার রয়েছে। প্রথম প্রথম

ভারি ছটফট করত। এখন গা-সওয়া হয়েছে। খানিকটা যেন নিশ্চিন্ত ভাবই এসেছে আজকাল।

বিজনের কথার জবাবে লতিকা বলল, 'না ভাই, তোমাকে ফেলে কি চা আমরা খাই, যে আজ খাব?'

বিজন হেসে বলল, 'দাদা বুঝি তেষ্টার চোটে না থাকতে পেরে খালি কাপে চুমুক দিচ্ছে! দাদাকে এক কাপ চা ক'রে দিলেই পার!'

বিনোদ আর লতিকা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। বিজন কি জেনে-শুনে ব্যঙ্গ করছে! কিন্তু ও তো তেমন ছেলে নয়!

বিনোদ লজ্জিত হয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে বলল, 'চা নয় বিজু, দুধ খেলাম এক কাপ। তোর বউদি রেখে দিয়েছিল।'

বিজু লতিকার দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলল, 'ও তাই বল, চুরি ক'রে ক'রে দাদাকে খাওয়ানো হচ্ছে?'

বিজন একটু ঠাট্টা-তামাশা ভালোবাসে। তবু অভাবের সংসার ব'লে ঠাট্টাটা বিনোদ আর লতিকার কানে যেন একটু কেমন শোনাল। দু'জনের মুখই গম্ভীর হয়ে গেল।

বিনোদ বলল, 'ওকে এককাপ দুধ কাল দিয়ো।'

লতিকা বলল, 'দেব।'

বিজন মহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, 'আচ্ছা, তোমাদের কি হয়েছে বউদি, তোমরা কি ঠাট্টা-তামাশাও বোঝ না আজকাল? দুধ কি আমি কোনদিন খাই, যে খাব? দুধ তোমাদের কাছে কে চাইছে শুনি? চা দেবে তো দাও।'

একটু পরে কেটলি থেকে দু'টি কাপে যখন চা ঢালতে যাচ্ছিল লতিকা, বিজন হঠাৎ বলল, 'দুধের কাপটা ভালো ক'রে ধুয়ে দাও বউদি। চায়ের কাপে দুধের গন্ধ আমি মোটেই সহ্য করতে পারিনে।'

লতিকা কোন কথা না ব'লে দেওরের দিকে একটু তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'ধুয়েই দিয়েছি, ঠাকুরপো। তোমার দাদার এঁটো কাপ তোমাকে দিইনি।'

পরের দিন লতিকা একটু আড়ালে এনে দুধের কাপটি দিল স্বামীকে। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দুধের কাপে চুমুক দিল বিনোদ।

ঘরের মধ্যে সুনীল আজ আর ইংরেজী গ্রামার পড়ছে না। স্বাস্থ্যপাঠ মুখস্থ করছে, 'দুগ্ধ শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী।' কে জানে ইচ্ছা ক'রেই এই কথাটা পড়ছে কিনা। বিজন আজ আর বিনোদের ঘরে ঢুকল না। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁতন করতে করতে বৌদির সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। বিনোদ যাতে অপ্রস্তুত না হয়ে পড়ে, কে জানে ইচ্ছা ক'রেই সেইজন্যে সে দাদার সামনে না এসে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল কিনা। এমন আস্তে আস্তে দুধের কাপটি শেষ করল বিনোদ, যেন চুমুকের শব্দ কারো কানে না যায়।

মাত্র দিনকয়েক এই সংকোচটুকু রইল, কিন্তু সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতেই সমস্ত লজ্জা সংকোচ ভেঙে গেল বিনোদের। এখন সে ছেলে, ভাই, স্ত্রী, সকলের সামনেই দুধ খায়। দিতে একটু দেরি হ'লে জোর গলায় হাঁক দেয়, 'কই গো, দিয়ে যাও আমার দুধ, আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে।'

লতিকা বিরক্ত হয়ে বলে, 'আনছি গো আনছি। দুধ না-হয় ঘুরে এসেই খেতে, তোমার দুধ আর কেউ নিয়ে যাবে না!'

পটলডাঙা স্ট্রীটে বাণী পাবলিশিং-এ প্রুফ-রীডারের কাজ করে বিনোদ। সব সময় কাজ থাকে না। মাঝে মাঝে দশ-পনের টাকার টিউশনি পায়। ইনসিওরেন্সের একটা এজেন্সী আছে। পরিচিত বন্ধুদের পিছনে হাঁটাহাঁটি ক'রে স্যাণ্ডাল ক্ষয় ক'রে ফেলে। তবু বছরে তিন-চার হাজারের বেশি দিতে পারে না।

কিন্তু বিনোদ দাস বাইরে যতই অকিঞ্চন হোক, ইণ্টালীর এই অনরেট সেকেণ্ড লেনের ৭।৩।২-এর একতলা বাড়ির কোণের দিকের ঘরখানায় সে সম্রাট, সংসারের সর্বময় কর্তা। এই সংসারের জন্যে সে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিচ্ছে, আর এক কাপ দুধে তার অধিকার নেই! নিজের রোজগারের পয়সায় সে নিজে দুধ খাবে, তাতে অত লজ্জা কিসের?

বিনোদ দুধ খেতে লাগল।

দু' সপ্তাহ কাটল, তিন সপ্তাহ কাটল, লতিকা ভাবল বিনোদ বুঝি এবার নিজেই না করবে,—বলবে, 'আর দিয়ো না দুধ, এবার বন্ধ ক'রে দাও।'

কিন্তু বিনোদের যেন সেদিকে মোটে খেয়ালই নেই।

এক মাস বাদে গয়লা সাড়ে-সাত টাকা বেশি বিল করল দুধের। লতিকা তো ভাবনায় অস্থির—কোন্ দিক থেকে ক' টাকা কেটে এই সাড়ে-সাত টাকা পুরিয়ে দেবে। গোয়ালাকে দু'তিন দিন বাদে টাকা নিতে আসবার অনুরোধ

ক'রে লতিকা বলল, 'এক পো ক'রে যে বেশি দুধ নিয়েছি, এ মাস থেকে তা আর দিতে হবে না। তুমি আগের দেড় পো ক'রেই দিও।'

ঘরের মধ্যে প্রুফ দেখছিল বিনোদ, এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে এসে নিজেই বলল, 'না হে, এ মাসও এক পো ক'রে বেশিই দাও, দুধটা বেশ ভালোই তোমার। শরীরটা যেন একটু শুধরেছে ব'লে মনে হচ্ছে। দেখি আর-এক মাস খেয়ে।'

গোয়ালা চ'লে গেলে লতিকা বলল, 'আচ্ছা, তোমার আক্কেলখানা কি? তুমি যে দুধের খরচ এ মাসেও বাড়িয়ে দিলে, টাকা দেব কোত্থেকে?'

বিনোদ ভারি অপমানিত বোধ ক'রে স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বলল, 'টাকা কি তুমি দাও, যে টাকার ভাবনা ভাবছ? টাকা যে দেয়, সে দেবে। সারাদিন তোমাদের জন্যে খেটে মরছি আর এক ফোঁটা দুধ জুটবে না আমার কপালে?'

লতিকা বলল, 'জুটবে না কেন। এক পো কেন, আমি বলি এক সের ক'রে দুধ রাখ তুমি। সত্তর-পঁচাত্তর টাকা তো সব দিয়ে রোজগার কর, তা নিজেই তুমি খাও,—দুধ খাও, ঘি খাও, মাংস খাও, পোলাও খাও, সংসারের আর মানুষের দিকে তোমার চেয়ে দরকার কি।'

বিনোদ চটে গিয়ে বলল, 'খাবই তো, আমার টাকা-পয়সায় আমি খাব, আমি পরব তাতে তোর কি?'

সকালবেলায় দুধের কাপটি ফিরিয়ে দিল বিনোদ। কিন্তু রাত্রে খাওয়ার সময় যখন বাটিতে ক'রে ফের খানিকটা গরম দুধ স্বামীর সামনে ধ'রে দিল লতিকা, বিনোদ আর ফিরিয়ে দিতে পারল না। সারাদিনভর আজ তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে হচ্ছিল, কি যেন খায়নি, কি যেন পায়নি, কি যেন বাদ গেছে জীবন থেকে। সারাদিনের খাটুনির শেষে অনেক বঞ্চনা, অনেক আশাভঙ্গের পর রাত দশটার সময় বাসায় ফিরে ডাল আর ডাঁটা চচ্চড়ি দিয়ে বাজে আটার শুকনো রুটি চিবিয়ে চিবিয়ে শেষে যখন ছোট একটু বাটিতে সাদা তরল পানীয়টুকু দেখতে পেল বিনোদ, ওর মন ব'লে উঠল,—এই সেই হারানো বস্তু, এই সেই পরম বস্তু।

বাটিটুকু ছোট হ'লে কি হবে, আজকের দুধটুকু বেশ ঘন-আওটা, ওপরে একটু সরও পড়েছে। সরটুকু চেখে চেখে খেল বিনোদ। তারপর বলল, 'আরো দু'খানা রুটি দাও তো ছিঁড়ে, দুধের সঙ্গে খাই। পেটটা যেন কিছুতেই ভরছিল না। কাল থেকে দুধটা রাত্রেই দিয়ো।'

লতিকা হাসি চেপে বলল, 'তাই দেব।'

কিন্তু আশ্চর্য, পরদিন রাত্রে বিনোদ দেখে পাতের ওপর শুধু রুটির রাশই রয়েছে, পাতের কাছে দুধের বাটি নেই।

উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'দুধ কি হ'ল?'

লতিকা বলল, 'সুনীলকে দিয়েছি। আজ তো একবেলার জন্যেও আর মাছ আসেনি। খাওয়া নিয়ে বড়ই মাতলামি করছিল। রোজ দুধ চায়, আজ দিলাম ওকে।'

বিনোদ গম্ভীর ভাবে বলল, 'বেশ করেছ।'

দিনকয়েক বাদে ফের একদিন বিনোদের পাতের কাছে দুধের বাটির অভাব হ'ল। সে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই লতিকা বলল, 'আজ কিন্তু তোমার দুধটুকু ঠাকুরপোকে দিয়েছি। চাকরির চেষ্টায় বেরিয়েছিল। ফিরে এল দুপুরের পর। খেতে ব'সে ভাত আর পারে না খেতে। রোজই তো ওই চিংড়ির কুচো আর পুঁই চচ্চড়ি। একটু আমসত্ত্ব ভিজিয়ে আজ দিলাম ওকে ওই দুধটুকু। বললে বিশ্বাস যাবে না, তাই দিয়ে ঠাকুরপো আধ থালা ভাত খেয়ে উঠল।'

বিনোদ বলল, 'বেশ করেছ, কিন্তু চাকরির কথা কি বলল? অত যে সুপারিশ চিঠি-ফিটি যোগাড় ক'রে পাঠালাম, কি হ'ল তার?'

লতিকা বলল, 'হয়নি। ব'লে দিয়েছে খালি নেই।'

বিনোদ ব'লে উঠল, 'ওর জন্যে খালি আর হবেও না, দুধই খাওয়াও আর আমসত্ত্বই খাওয়াও, জীবনে ওর চাকরি হবে না ব'লে দিলাম।' বেশির ভাগ রুটি-তরকারি ফেলে রেখে বিনোদ উঠে দাঁড়াল।

পরদিন থেকে ফের দুধ পেতে লাগল বিনোদ। মাঝখানে আবার দু'একদিন বাদ গেল।

লতিকা বলল, 'ভারি দুষ্টু হয়েছে সুনীল, ভারি ছোঁচা হয়েছে আজকাল। টিফিন থেকে এসে রান্নাঘরে ঢুকে কড়ার মধ্যে কাপ ডুবিয়ে দুধ চুরি ক'রে খায়। ওকে নিয়ে আর পারা গেল না।'

বিনোদ বলল, 'হুঁ।'

লতিকা বলল, 'আমি ক'দিন ধরেই দেখছিলাম। আজ কড়া শাসন ক'রে দিয়েছি। আস্ত একখানা চেলাকাঠ ভেঙেছি পিঠে। যদি প্রাণের ভয় থাকে, জীবনে আর দুধের কড়ার কাছে যাবে না।'

বিনোদ বলল, 'হুঁ, ছেলেবেলা থেকেই এত লোভ ভালো না।'

আরও কাটল দিন কয়েক। তারপর ফের একদিন পাতের কাছে দুধের বাটি দেখতে না পেয়ে বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'আজও কি সুনীল দুধ চুরি ক'রে খেয়েছে নাকি? ওর সাহস তো কম নয়, অত মার খাওয়ার পরেও—'

লতিকা মুখ টিপে একটু হেসে বলল, 'না, আজ আর ও চুরি করেনি। পাশের বাড়ির সাদা বেড়ালটা এসে দুধ খেয়ে গেছে।'

বিনোদ রাগ ক'রে উঠল, 'পাশের বাড়ির বেড়ালে এসে দুধ খেয়ে গেল, আর তুমি হাসছ! এত দামী দুধ। ঢেকে-টেকে সাবধান ক'রে রাখতে পার না! চার আনা ক'রে এক পো দুধ। সোজা কথা! গেল তো কতগুলি পরের বাড়ির বেড়ালের পেটে! পয়সা তো আর নিজে কামাই কর না। কি বুঝবে তার মর্ম!'

লতিকা বলল, 'নিজে কামাই না করলেও বুঝি। ভয় নেই। সত্যিই আর পরের বেড়ালে কড়া থেকে দুধ খেয়ে যায়নি। আমি অত অসাবধান না। তোমার নিজের বেড়ালেই খেয়েছে দুধ। হ'ল তো!'

লতিকা ফের একটু হাসল।

বিনোদ এবারও ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বলল, 'রাত দুপুরে কি যে মস্করা কর, ভালো লাগে না। কি হয়েছে খুলেই বল না বিষয়টা।'

লতিকা এবার বিষয়টা খুলেই বলল। ক'দিন ধরেই তার অম্বলের দোষটা বেড়েছে। যা খায় তাই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। টক-টক ঢেঁকুর ওঠে, সারা দিন অস্থির-অস্থির লাগে। আজ দুপুরের পর একেবারে বমিই হয়ে গেল, যা খেয়েছিল, কিছুই রইল না পেটে। বিকেলবেলায় খিদেয় আর বাঁচে না। কি খায়, কি খায়। অথচ যা মুখে দেবে তাতেই অম্বল হবে। অবস্থা দেখে দোতলায় মুখুয্যেদের মাসীমা বললেন, 'এক কাজ কর বউমা, ঘরে তো তোমাদের দুধ আছে। তার মধ্যে এক মুঠ খই ভিজিয়ে খাও। তাতে অম্বল হবে না। দেহটাও ভালো থাকবে।'

লতিকা তাঁর পরামর্শই নিল। তাই কি সুস্থভাবে খাওয়ার জো আছে। স্কুল থেকে সুনীল এসে হাজির। 'মা, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে কি খাচ্ছ?'

'মধু খাচ্ছি, নে।'

তার হাতেও দিতে হ'ল এক দলা।

খাওয়া শেষ ক'রে থালার ওপর সশব্দে গ্লাসটা তুলে রেখে বিনোদ বলল,

'তা খেয়েছ খেয়েছ, তার অত ভনিতার কি ছিল! বেড়াল, অম্বল, কত কি। বললেই পারতে দুধ খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল, তাই খেয়েছি।'

লতিকা ভেবেছিল তার দুধ খাওয়ার কথা শুনে স্বামী একটু হাসবে, হয়ত একটু ঠাট্টা পরিহাস করবে। কিন্তু স্বামীর মুখ দেখে, মূর্তি দেখে সে প্রথমে খানিকটা অবাক হ'য়ে থেকে অতিমাত্রায় সবাক হ'য়ে উঠল। 'তোমার ধারণা আমি সাধ ক'রে খেয়েছি, ইচ্ছা ক'রে খেয়েছি।'

বিনোদ বলল, 'না, ইচ্ছা ক'রে খাবে কেন। পাড়ার আর কেউ এসে তোমার গলায় ঢেলে দিয়ে গেছে।'

লতিকা বলল, 'খেয়েছি তো বেশ করেছি। তুমি তিরিশ দিন খেতে পার, আর আমি একদিনও পারিনে।'

বিনোদ আঁচাতে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'আসলে সেই হচ্ছে কথা। আমি যে একটু ক'রে দুধ খাই, তা তোমার প্রাণে সয় না, তা তুমি দু'চোখে দেখতে পার না। সেই হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মর।'

লতিকা বলল, 'তোমার দুধ খাওয়া দেখে আমি জ্বলেপুড়ে মরি! মরি তো বেশ করি। বুড়ো বেটা তুমি, লজ্জা করে না রোজ রোজ সকলের সামনে দুধ খেতে! একদিন দুধ কম পড়লে তাই নিয়ে বাড়ি মাথায় করতে!'

এঁটো হাতেই বিনোদ রুখে এল, 'লজ্জা করবে কেন রে হারামজাদী, আমি কি তোর বাপের পয়সায় দুধ খাই, নিজের পয়সায় খাই—নিজে খাই আমি। লজ্জা তোদের করা উচিত।'

পাশের ঘর থেকে বিজন এল বেরিয়ে, 'কি, হয়েছে কি? রাত দুপুরে কি শুরু করেছ তোমরা? কি নিয়ে ঝগড়া?'

লতিকা বলল, 'ঝগড়া কি নিয়ে শুনবে! খিদেয় না থাকতে পেরে আমি আজ দুধটুকু খেয়ে ফেলেছি।'

বিজন বলল, 'ছি ছি ছি, তোমরা হ'লে কি বউদি!'

গোলমালে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সুনীলও উঠে দাঁড়াল। একটু কান পেতে সকলের কথাবার্তা শুনেই সমস্ত ব্যাপারটা সে বুঝতে পারল। আস্তে আস্তে গিয়ে বিজনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিসফিস ক'রে বলল, 'জান কাকু, সেদিন একটু দুধ খেয়েছিলাম ব'লে আমাকে কি মারটাই না মারলে। আজ নিজে চুরি ক'রে খেয়েছে, আজ নিজে মার খাচ্ছে। বুঝুক মজা।'

বিজন বলল, 'ছিঃ, ওকথা বলে না কাকু। যাও, তুমি ঘুমোও গিয়ে।'

সুনীল খানিক বাদেই ঘুমোল বটে, কিন্তু বিনোদ আর লতিকা সারা রাতের মধ্যে চোখ বুজল না। এক ফোঁটা দুধের জন্যে এত কেলেঙ্কারি ছিল ভাগ্যে! লতিকা বার বার নানা সুরে নানা স্বরগ্রামে এই কথাই বলতে লাগল। সংসারে এসে কোন্ সাধটা তার মিটেছে, শাড়ি গয়নার কোন্ সুখটা করেছে? সুখ তো ভালো—সারাদিন যদি সে না খেয়েও থাকে, কেউ আহা বলবার নেই, কেউ জিজ্ঞেস করবার নেই। লতিকা সারা রাত ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদতে লাগল আর বিলাপ করতে লাগল। বিনোদ বারকয়েক বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলল, 'আঃ, জ্বালাতন ক'রে ছাড়লে, রাত্রে কি একটু আমাকে ঘুমুতেও দেবে না? কাল তো ভোরে উঠে আমাকে ফের কাজে বেরোতে হবে।'

ধমক খেয়ে লতিকার কান্নার বেগ আরো বেড়ে গেল।

বিনোদ এবার স্ত্রীকে একটু কাছে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করল, বলল, 'সামান্য দুধের জন্যে—'

লতিকা বলল, 'হ্যাঁ, সামান্য দুধের জন্যে তুমি আমাকে মারতে পর্যন্ত গিয়েছিলে। আমি তো মরে গেলেও আর দুধ কোন দিন মুখে দেব না।'

অনেক সাধ্যসাধনায় স্ত্রীকে শান্ত করল বিনোদ। শেষ রাত্রে দেখা গেল কোলের মেয়েকে বাঁ দিকে সরিয়ে রেখে লতিকা বিনোদের কোলের কাছে এসে ঘুমিয়েছে।

পরদিন ভোরে গোয়ালা দুধ দিয়ে গেল। লতিকা তাড়াতাড়ি জ্বাল দিয়ে নিয়ে এল দুধ। কাপে ঢেলে বিনোদের সামনে এগিয়ে দিল। বিনোদ বলল, 'এ আবার কি!'

লতিকা বলল, 'এখনই খাও, সারাদিনভর এ দুধ আমি রাখতে পারব না। কে কখন এসে মুখ দেবে তার ঠিক কি।'

বিনোদ আর কিছু না ব'লে বাঁ হাতখানা আলগোছে স্ত্রীর পিঠের ওপর রেখে, মৃদু হেসে দুধের কাপটি তার মুখের সামনে তুলে ধরল।

লতিকা হেসে বলল, 'হয়েছে, থাক।'

'কি বউদি, চায়ের কদ্দুর।'

ব'লে বিজন ঘরে ঢুকেই থমকে গেল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছিল, লতিকা দুধের কাপ হাতে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'পালাচ্ছ কেন ঠাকুরপো, নাও, দুধটুকু খাও তুমি আজ। আহা কি চেহারাখানাই করেছ। নাও দুধটুকু।'

বিজন বলল, 'তোমার চেহারাখানাই বা এমন কোন্ বীরাঙ্গনার। তুমিই খাও বউদি।'

লতিকা বলল, 'তুমি খেলেই আমার খাওয়া হবে, ঠাকুরপো।'

বিজন আর কোন কথা না ব'লে দুধের কাপটি হাতে নিল।

পুবদিকের বারান্দায় সুনীল মাদুর বিছিয়ে বইপত্র নিয়ে বসেছে। আর আড়চোখে তাকাচ্ছে ঘরের দিকে। দেখছে বাবা মা কাকার অদ্ভুত কাণ্ড। সুনীল একা নয়। তার কাছে এসে বসেছে পাশের বস্তির ফটিক। সে তাদের ক্লাসেই পড়ে। কিন্তু সুনীলের চেয়েও তাদের অবস্থা খারাপ। সব বই কিনে পড়তে পারে না। শুধু যে নোটবইগুলিই তার নেই তা নয়, মূল ইংরেজী বইখানা পুরনো কিনেছিল ব'লে, একটা গল্পের খানতিনেক পাতাই তার মধ্যে নেই, বোধ হয় আগের মালিক নকল করবার জন্যে ছিঁড়ে নিয়েছিল। ফটিক পেনসিল দিয়ে নিজের খাতায় গল্পের সেই ছিঁড়ে যাওয়া অংশটা লিখে নিচ্ছিল।

বিজন বারান্দায় নেমে সুনীলকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে নিল। তারপর দুধের কাপটি তার সামনে ধ'রে বলল, 'নে সুনীল।'

সুনীল বলল, 'তুমি খাও কাকা, তুমি তো কোন দিন খাও না।'

বিজন বলল, 'আরে তুই খা। তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে।'

সুনীল আর কোন কথা না ব'লে কাপটি নিয়ে ফিরে এল নিজের জায়গায়। ফটিক মাথা নিচু ক'রে পড়া টুকছে। কালো রোগা চেহারা। কিরকির করছে হাড়গুলো। পিঠের দুটো হাড় গরুড় পাখির দুই ডানার মত উঁচু হয়ে রয়েছে। দেখে দেখে সুনীল বলল, 'এই ফটিক, শোন্। লেখা পরে টুকিস্, দুধের কাপটা ধর্ তো।'

ফটিক মুখ তুলে লজ্জিত ভাবে বলল, 'না ভাই, তুই খা।'

সুনীল বলল, 'আরে দূর পাগল। আমি তো রোজই খাই, আজ তুই নে। তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে।'

রে ক র্ড

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

. . . .

বৌবাজার স্ট্রীট আর শেয়ালদার মোড়ের কয়েকটি ছোট ছোট গলি দিয়ে, কিংবা স্কট্ লেনের পাশ কাটিয়ে একটি বিচিত্র বাজারে ঢোকা যায়। ইংরাজিতে তার ভদ্র নাম 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড্ মার্কেট'—চল্‌তি বাংলায় 'চোরা বাজার'। এক সময় বোধ হয় চোরাই জিনিসের বিক্রি-পাটা চলত এখানে—আজ সে পাট না থাকলেও অখ্যাতিটা আঁকড়ে বসেই আছে।

বৈঠকখানা মার্কেটের গাছপালার দোকানগুলি পার হলেই এই বাজারের সীমান্ত; এ অংশে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। নতুন পুরোনো প্রচুর সস্তার জুতো, শোলা হ্যাট, ইলেক্‌ট্রিক হীটার, তাপ্পি মারা স্টোভ আর লাল হয়ে যাওয়া দশ-বারো আনা সেরের চিংড়ি মাছ। এই অংশে দাঁড়ালেই নাকে আসবে স্পিরিট আর বার্নিশের গন্ধ—তারপর আপনি একেবারে ফার্নিচারের জগতে গিয়ে পৌছোবেন।

নতুন পুরোনো ফার্নিচারে দোকানগুলো ঠাসা। ল্যাজারাস কোম্পানির আদি বার্মা টীক রং ফিরিয়ে অপেক্ষা করে আছে। আবার চকচকে নতুন জিনিস এক নম্বর সি-পি ভেবে কিনে এনে ছ'মাস পরে আবিষ্কার করবেন, কাঠটা বিশুদ্ধ জারুল। সস্তায় হয়তো খাঁটি মেহগনির জিনিস পাবেন আবার প্রচুর পয়সা দিয়ে আলমারিটা এনে দেখলেন, ফাটা কাঠের ওপর বেমালুম বার্নিশ লাগিয়ে আপনার মাথায় কাঁটাল ভেঙেছে।

অর্থাৎ, রাস্তার লটারি। এক আনা দিয়ে কাঁটা ঘোরালেন—পেলেন তিনটি ছোট ছোট বিস্কুট; কিংবা কপালের জোর থাকল তো চন্দন সাবানই জুটে গেল একখানা।

তবু আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের এখানে লটারির টিকিটই কিনতে হয়। বৌবাজার কিংবা রিপন স্ট্রীটের দিকে পা বাড়াতে আমাদের সাহসে কুলোয় না।

আমি গিয়েছিলুম ছোট একটা বুক কেসের সন্ধানে। মনের মতো কিছু পেলুম না। ফিরে আসছি, এমন সময় একটা দোকানের দিকে নজর পড়ল।

ফার্নিচারের দোকান নয়। 'বাবু কলকাতার' শেষ অভিজ্ঞান কতকগুলি গৃহসজ্জা। চীনে মাটির বড় বড় 'পট', গিল্টকরা ফ্রেমে বিলিতি ছবি, দু-একটা

শ্বেত পাথর কিংবা ইমিটেশন স্টোনের ছোটবড় মূর্তি, ব্রোঞ্জের নগ্নিকা, পুরোনো ফ্যাশানের আরো নানা টুকিটাকি। একটা চোঙাওলা গ্রামাফোনে হিন্দী গানের রেকর্ড বাজছিল, সেইটে কানে যেতে আমি দাঁড়িয়ে গেলুম।

হিন্দী গানের আকর্ষণে নয়। দেখলুম, স্তূপাকার পুরোনো রেকর্ড। 'যেখানে দেখিবে ছাই'—এই মহাজন বাক্যে এখানে আমি লাভবান হয়েছি আগে। অর্থাৎ পুরোনো রেকর্ডের ভেতর থেকে পেয়েছি অপ্রাপ্য রবীন্দ্রকণ্ঠ, পেয়েছি রাধিকা গোস্বামীর গান, দিলীপকুমারের 'মুঠো মুঠো রাঙা জবা'। তাদের কোনো-কোনোটা কোনমতে শ্রাব্য, আবার দু-একটা প্রায় নতুনের মতো। দাম আশাতীত সস্তা, বলাই বাহুল্য।

বললুম, রেকর্ড দেখাও তো।

একজন বের করে দিল—অধিকাংশই সস্তা সিনেমার গান—কিংবা বাজার চলতি 'পপুলার ডিস্ক'—পুজোর অ্যাম্প্লিফায়ারে বাজাতে বাজাতে যারা অকাল-জরা লাভ করেছে। তবু এদের মধ্যেই একখানা রেকর্ড আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অচেনা লেবেল, অচেনা ভাষা। ওপরের লেখাগুলোও রোমান হরফ বলে মনে হল না। দেখলুম বেশি পুরোনোও নয়।

হিন্দী রেকর্ডটা থেমে গিয়েছিল। বললুম, এটা বাজাও তো।

চোঙাওলা গ্রামোফোন থেকে প্রথমে একরাশ অদ্ভুত বাজনা ছড়িয়ে পড়ল। এ ধরনের বাজনা এর আগে কখনো শুনিনি। একটা ড্রাম বাজছে—গীটারও আছে বোধ হয়, কিন্তু আরো কী কী যে আছে আমার বোধগম্য হল না। নানা ঢঙের বিদেশী ছবি দেখেছি—রেকর্ড শুনেছি অনেক, কিন্তু এ জিনিস কখনো কানে আসেনি এর আগে।

তারপর গান। নারীপুরুষের চার পাঁচটি কণ্ঠ আছে মনে হল। যেমন অদ্ভুত বাজনা—তেমনি অদ্ভুত সুর। কেন জানি না—কোথায় রক্তের মধ্যে দোলা লেগে গেল। জানি এ সুর একেবারে অচেনা, তবু মনে হতে লাগল এ যেন আমি কবে কোথায় শুনেছিলুম। উল্টো পিঠেও একই জিনিস—একটা গানকেই গাওয়া হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় পেলে এ রেকর্ড?

জবাব এল, চৌরঙ্গী অঞ্চলে ওদের যে এজেন্ট আছে সে এনে দিয়েছে।

—এ কোন্ ভাষা?

বিহারী মুসলমান দোকানদার হেসে বললে, ক্যা মালুম?

বারো আনা পয়সা দিয়ে রেকর্ডখানা আমি সংগ্রহ করে নিয়ে এলুম। দর করলে হয়তো আরো সস্তায় হত, কিন্তু কেমন যেন মনে হল দরাদরি করে খেলো করবার মতো গান এ নয়।

বাড়ি ফিরে মেশিনে দিয়েছি, আমার স্ত্রী করুণা উঠে এলো পড়ার টেবিল থেকে। নতুন অধ্যাপনায় ঢুকেছে—কলেজের ছাত্রীদের চাইতে পড়ার তাগিদ তার নিজেরই বেশি। ভুরু কুঁচকে বললে, এ আবার কী?

বললুম, দেখতেই পাচ্ছ, রেকর্ড বাজাচ্ছি।

—কী বিটকেল বাজনা রে বাপু! এ কাদের গান?

—জানি না।

—জানো না তো আনলে কেন?

—চুপ করো একটু, শুনতে দাও।

মিনিট খানেক ধৈর্য ধরে রইল করুণা। তারপর মুখের ওপর টেনে আনল রাজ্যের বিরক্তি।

—পাগল করে দিলে যে। কোত্থেকে রাজ্যের ছাইপাঁশ জোটাও তুমিই জানো। পড়তে দেবার মতলব না থাকে তো বলো, সোজা ছাতে গিয়ে উঠি।

—লক্ষ্মীটি—আর একটুখানি। তিন মিনিটে তোমার জ্ঞানার্জনে কাঁটা পড়বে না।

গান থামলে করুণার দিকে তাকালুম। দেখি হাতে একটা লাল-নীল পেনসিল নিয়ে এসেছিল, তার গোড়াটা চিবোচ্ছে আনমনার মতো।

—খুব খারাপ লাগল করুণা?

করুণা একটু চুপ করে রইল। বললে, না—খারাপ লাগল না। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল। পড়াটা নষ্ট করে দিলে আমার।

—কেন?

—ভারী আশ্চর্য লাগল সুরটা। মনে হল কবে যেন কোথায় শুনেছি।

বললুম, ঠিক তাই। আমারও অমনি মনে হয়েছিল।

করুণা আস্তে আস্তে নিজের টেবিলে গিয়ে বসল। মেশিনটা তুলে রেখে দেখি ও পড়ছে না, একটা ব্লটিং প্যাডের ওপর নীল পেনসিলের আঁচড় টানছে।

আমিও কতগুলো খাতা টেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের সংখ্যা বাড়াতে বসে গেলুম। কিন্তু একটা খাতাতেও মন দিতে পারছি না। দু-কান ভরে ওই

বিচিত্র বাজনা আর গানের স্থর বেজে চলেছে। কোথায় শুনেছি—কবে শুনেছি। কিন্তু কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।

করুণা যেন আমারই ভাবনার স্থত্র টেনে বললে, এ কী কাণ্ড করলে বলো তো ?

—কী হল আবার ?

—ওই রেকর্ডটা। ভারী অস্বস্তি লাগছে। যেন খুব চেনা—যেন—করুণা গুন্‌গুন্‌ করে ত্ব-তিনটে স্থর ভাঁজল, তারপর বিরক্ত হয়ে বললে, নাঃ—কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আচ্ছা, পাগলামি ধরিয়ে দিলে যা হোক। দিলে পড়াটা শেষ করে।

মোট কথা, ওই রেকর্ডখানা আমাদের ত্বজনের সন্ধ্যাকেই আচ্ছন্ন করে রাখল। এ একটা বিরক্তিকর মানসিক অবস্থা। খুব চেনা মানুষের নাম মনে করতে না পারলে, চাবির গোছা এই মাত্র কোথাও রেখে তারপরে আর খুঁজে না পেলে যেমন একটা ছটফটানি জেগে ওঠে, ঠিক সেই রকম।

রাত্রে খেতে বসে করুণা বললে, মনে পড়েছে।

আমি চোখ তুলে তাকালুম।

—ছেলেবেলায় যখন আসামে ছিলুম, তখন খাসিয়াদের নাচের সঙ্গে যেন ওই রকম গান—

—খাসিয়াদের গান ?

করুণা একটু বিভ্রান্ত হল যেন। তারপর মাথা নেড়ে বললে, না-না, ঠিক খাসিয়াদের নাচও নয়। ঠিক কী যেন—কী যেন—একটু চুপ করে থেকে বললে, বর্ষার ব্রহ্মপুত্রের ডাক শুনেছ কখনো ? পাহাড় ভেঙে নেমে আসে, বড় বড় গাছগুলিকে স্রোতের টানে কুটোর মতো ভাসিয়ে নেয়, দূরের পাহাড়ে বুনো হাতি গর্জে গর্জে ওঠে, তখন নাগাদের ঢাকের আওয়াজ—

বলতে বলতে হতাশ ভাবে চুপ করে গেল করুণা : কী জানি।

কিন্তু ওই ঢাকের কথায় আর-একটা স্মৃতি জেগে উঠল আমার মনে। মানভূম। ত্বধারে কুস্থম গাছের সারি আর ঘন বাঁশের বন—তারই ভেতর দিয়ে নির্জন পথ বেয়ে চলেছি। অন্ধকার হয়ে এসেছে—ঝালদার পাহাড় দূরে ভূতুড়ে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। পাশের একটা প্রকাণ্ড দীঘিতে পানডুবকীর কলধ্বনি, ঝিঁঝির ডাক।

হঠাৎ পানডুবকী আর ঝিঁঝির ডাক ছাপিয়ে গুরু গুরু করে উঠল নাগরার

আওয়াজ। এদিক থেকে ওদিক, এ দিগন্ত থেকে ও দিগন্ত। কী একটা পরব আছে ওদের—গ্রামে গ্রামে শুরু হল ছৌ-নাচের পালা।

সেই অস্পষ্ট অন্ধকার—কালো হয়ে আসা কুসুমগাছ আর বাঁশবন, ঝালদার পাহাড়ের ভূতুড়ে ছবি আর ওই নাগরার আওয়াজে হৃৎপিণ্ড আমার চমকে চমকে উঠেছিল। মনে পড়েছিল, পুলিসের বুলেটের সঙ্গে লড়বার আগের দিন রাত্রে বিয়াল্লিশের আগস্টে, বালুরঘাটের অন্ধকার সাঁওতালি গ্রামগুলো থেকে অমনি ভাবেই নাগরা-টিকারার রোল আমি শুনেছিলুম।

বর্ষার ব্রহ্মপুত্র, নাগাদের ঢাক, নাগরা-টিকারার আওয়াজ, ছৌ-নাচের বাজনা,—এদের সঙ্গে কোথায় এই রেকর্ডটার মিল আছে? মিলছে না—অথচ কোথায় যেন মিলছে। কিছুতেই মনে আনতে পারছি না—অথচ ঠিক মনে আছে। কী যে খারাপ লাগতে লাগল।

একটা অচেনা অজানা পুরোনো রেকর্ড কিনে আচ্ছা জ্বালা হল তো।

এর মধ্যে একদিন করুণার এক সহপাঠিনী এসে হাজির।

শহরের ওপরতলার বাসিন্দা—নিতান্তই একদা করুণার সঙ্গে গভীর সখিত্ব ছিল বলে আমাদের এই হরিজনপাড়ায় পা দিয়েছেন। মহিলাটি বিদুষী এবং গুণবতী। ওয়েস্টার্ন মিউজিক শেখবার জন্যে ইউরোপে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে গানের ওপর ডক্টরেট নিয়ে ফিরে এসেছেন। বরমাল্য দিয়েছেন এক মারাঠী এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারকে।

করুণা দারুণ খুশী হয়ে বললে, আইভি এসেছিস, খুব ভালো হয়েছে। আমাদের এই পাজল্‌টার একটা সলিউশন খুঁজে দে।

রেকর্ডখানা দেখে কপাল কোঁচকালেন আইভি।

—কোনো শ্লাভ্ ভাষা মনে হচ্ছে। বাজা তো।

বাজানো হল। আইভিও বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না। শপ্যাঁ-ভাগনার-বাখ-বীঠোফেনের সঙ্গে পরিচয় আছে—তার ওপরে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা অকারণেই শোনালেন আমাদের। কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না।

শেষে ব্যাগ খুলে একটা টফি খেলেন। তার সেলোফোনের মোড়কটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললেন, কোনো কমিউনিটি সং বলে মনে হচ্ছে।

করুণা বললে, সে তো বোঝাই যায়। অনেকে মিলেই গাইছে যখন।

টফির মোড়কটাকে একটা আংটির মতো জড়াইলেন আইভি। বললেন,

নাউ আই রিমেম্বার। সুইৎসারল্যাণ্ডের একটা ম্যারেজ ফেস্টিভ্যালে এমনি গান আমি যেন শুনেছিলুম।

ম্যারেজ ফেস্টিভ্যাল! করুণা আমার দিকে তাকালো একবার। চোখে চোখ মিলল। উত্তরটা কারোই মনঃপূত হয়নি।

করুণা বলতে যাচ্ছিল: ঠিক বিয়ের সুরের মতো মনে হচ্ছে কী? তা ছাড়া সুইস্‌রা তো শ্লাভ ব'লে—

আইভি আর সময় দিলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ চলি ভাই। নিউ এম্পায়ারে একটা শো আছে, তার রিহার্সাল করতে হবে। তা ছাড়া অনেকক্ষণ এসেছি—ন্যান্সি ইজ্ ফিলিং ভেরি লোন্‌লি! এ পুয়োর লিটল থিং শী ইজ!

ন্যান্সি ওঁর দুহিতা নয়—কুকুর।

ওঁর মোটরটা চলে যেতে করুণা বললে, চালিয়াৎ!

আমি হাসলুম—জবাব দিলুম না। করুণা গজগজ করতে লাগল: ইউরোপে গাছের তলায় তলায় ডক্টরেটের ডিপ্লোমা বিক্রি হয় শুনেছি। পাঁচ শিলিং কি সাত ফ্রাঙ্ক দিলে—

করুণা ডক্টরেট নয়, অতএব এ স্বাভাবিক ঈর্ষা। আসল কথা, শ্রীযুক্তা আইভিও আমাদের নিরাশ করলেন। আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে গেলুম।

সেদিন মাঝ রাতে আমার ঘুম ভাঙল।

জল খেতে উঠেছি—কানে এল বাঘের ডাক। রাত দেড়টায় ঘুমন্ত কলকাতার ওপর দিয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে একটা গম্ভীর ধ্বনি বয়ে যেতে লাগল। আর্ত অথচ ভয়ঙ্কর, ক্লান্ত অথচ ক্রুদ্ধ। মুখের কাছে জলের গ্লাসটা তুলে আমি নামিয়ে ফেললুম।

বাঘ ডাকছে।

আমাদের বাড়ি থেকে একটা সরল রেখা টানলে দুটো বড় রাস্তার ওপারে সোজা মার্কাস স্কোয়ার। একটা সার্কাসের দল দিন কয়েক হল তাঁবু ফেলেছে সেখানে। সেখান থেকেই আসছে বাঘের ডাক।

কলকাতার এই অনিদ্র আলো-জলা রাত্রে বাঘটা হয়তো সুন্দরবনের স্বপ্ন দেখছে। তাই চমকে জেগে উঠছে—অসহায় ক্ষোভ আর নিরুপায় কাতরতায় ডেকে উঠছে ও-ভাবে।

কিন্তু কেন জানি না—আমার ওই বিদেশী রেকর্ডটাকে মনে পড়ল। মিল আছে—ওর সঙ্গেও মিল আছে। অথচ কিছুতেই ধরতে পারছি না—কিছুতেই না।

জানলার কাছে এসে দাঁড়ালুম। সামনের কয়েকটা পাম গাছ—তাদের মাথার ওপরে রাত্রির তারা—কয়েক টুকরো মেঘ, সব যেন বাঘের ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বার বার।

শেষ পর্যন্ত সমাধান করলেন এক ভূ-পর্যটক।

রেকর্ডটা শুনে চমকে উঠলেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পেলেন ?

—চোরা বাজারে।

—আশ্চর্য।

—কেন ?

—এ কলকাতায় এল কী করে তাই ভাবছি। এ রেকর্ড গোপনে তৈরী হয়েছিল—গোপনে বিক্রি আর বিলি হয়েছিল সামান্য সংখ্যায়। কিন্তু এদের প্রত্যেকটি শিল্পীই নাৎসীদের রাইফেলের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে।

মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো আমার। জ্বলজ্বল করে উঠল করুণার চোখ।

—খুলে বলুন।

ইয়োরোপের একটা ছোট দেশের নাম করলেন পর্যটক। নাৎসী অধিকারের সময় এই রেকর্ডটি ছিল সেখানকার মুক্তি-যোদ্ধাদের গান। হিটলারের গোয়েন্দারা দাবি করেছিল এর প্রতিটি কপি, এর অরিজিনাল—এর প্রত্যেকটি শিল্পীকে তারা লিকুইডেট করেছে। অথচ সেই রেকর্ড পাওয়া গেল কলকাতার বাজারে।

পর্যটক থামলেন।

রাস্তা দিয়ে গর্জিত একটা ছাত্র শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। আমরা তিনজনেই কান পেতে শুনলুম কিছুক্ষণ। কয়েক মিনিটের স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল ঘরে।

পর্যটক আবার বললেন, একটা অত্যন্ত দামী জিনিস পেয়েছেন আপনি। জানি না, যুদ্ধের পর ওরা এই রেকর্ডটাকে আবার চালু করতে পেরেছে কিনা। যদি না পেরে থাকে—

ছাত্র শোভাযাত্রার দূর-ধ্বনিটা হঠাৎ বন্যার মতো প্রবল বেগে ভেঙে পড়ল।

দুম দুম করে আওয়াজ উঠল কয়েকটা। তারপর পথ দিয়ে চিৎকার করতে করতে কে বলে গেল : লাঠি চলছে—টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে—

আবার স্তব্ধতা নামল ঘরে।

দূরে শুনছি প্রাণের বন্যা—ক্রোধের ঝোড়ো গর্জন। না—এখন আর সুরটাকে চিনতে বাকী নেই। ব্রহ্মপুত্রের বর্ষা-মাদল, নাগা পাহাড়ের ঢাক, ছৌ-নাচের নাগরা—বালুরঘাটের রাত্রি কাঁপানো টিকারার আওয়াজ—মার্কাস স্কোয়ার থেকে বাঘের ডাক, আর—আর আজকের এই ঘা-খাওয়া মিছিল, সব একসঙ্গে মিলে ওই সুরটাকে সৃষ্টি করেছে। দেশে দেশে, কালে কালে এ সুর এক। জানতুম, আমরাও এ সুরকে জানতুম। ঘুমন্ত রক্তের মধ্যে তলিয়ে ছিল বলেই এতদিন চিনতে পারিনি।

করুণা আমার দিকে তাকালো। দু' চোখে অসহ্য ঘৃণা জ্বলছে ওর। আস্তে আস্তে বললে, এ রেকর্ডকে কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কেউ পারবে না।

শুভক্ষণ

হ য় না

সন্তোষকুমার ঘোষ

. . . .

না, সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ো না, ফুলটা তবে চাপা প'ড়ে যাবে। ঘাড়টা একটু এলিয়ে দাও, বেশি না একটু-ই। এইবার দেখা যাচ্ছে। সবটা না, সবটা দেখা গেলে ভালোও দেখাত না, কয়েকটি পাপড়িই যথেষ্ট। গোটা ফুল নয়, ফুলের আভাস। কিন্তু এভাবেই বা কতক্ষণ থাকা যাবে? খানিক পরে ঘাড়ের গোড়া টনটন করবে।

পাশের বাড়ির বাগান থেকে প্রকাণ্ড একটা গন্ধরাজ সংগ্রহ করেছিল আরতি। আয়না হাতে নিয়ে ভিতরের দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিজেকে পরীক্ষা করছিল, আর বলছিল।

একবার বলল, দূর, দূর, সুবিধের হয়নি। শাদা ফুলে আবার চেহারা খোলে নাকি। এর চেয়ে লাল একটা ফুল পেলে বেশ হ'ত! খুলত। কিন্তু ওর চোখে না। কী যে পছন্দ বাবুর, চড়া রং দু-চোখে দেখতে পারে না।

টকটকে লাল কিছু দেখলে যেন খেপে যায়। আর, ওর পছন্দ হবে না এই ভয়ে খয়েরি রঙের ছাপার শাড়িটা ছুঁয়েও দেখতে পেলাম না একদিন। কেনা হ'ল, বাক্সের কোণেই প'ড়ে রইল। কী মুশকিল দেখ তো, খাব আমার আপন রুচিমতো, কিন্তু পরার রুচি পরের, বিশেষ ক'রে মেয়েদের বেলায়। ওর কেমন লাগবে, ওই এক ভাবনা। ওর, ওর, ওর।

ভেংচে-ভেংচেই বলল আরতি, তবে মনে-মনে। লাল নয়, গোলাপি নয়, খয়েরি নয়, পরতে হবে কিনা এই ছাই রঙের শাড়ি। শাড়ি না ছাই। প'রে-প'রে সুতো-সুদ্ধ ফ্যাঁসফেঁসে হ'য়ে এসেছে। আর মোটে দু-ধোপ, তারপরেই ওটাকে বিদায় দেব। কিনব বাসন, কিনব কাপ-ডিশ। সেই কাপেই সরোজকে চা খাওয়াব।

ছোট্টো ক'রে একটা টিপ পরল আরতি। কপালের ঠিক মাঝখানেই হ'ল তো? কে জানে। এক হাতে আয়না, তাও আবার ঝাপসা, উঁচু ক'রে ধ'রে কত আর সাজগোজ করি। কনুইয়ের কাছটা টনটন করে। একটা বড়ো আয়না যদি থাকত, বেশ হ'ত। সেটা দেয়ালে ঝুলত, ঠিক ততটা উঁচুতে, যতটা হ'লে গলা, কি ধরো, ব্লাউজের বর্ডার শুরু হয়েছে। আরও ভালো হ'ত সেটা যদি নিচু একটা টেবিলের সঙ্গে ফিট করা থাকত।

এবার আরতি ছোট্টো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেসব আর এ-বাসায়, এই ছিট-বেড়া আর টিনের চালের ঘরে, হয় না। হ'তেও পারে, অন্য কোথাও। এই শহরেই, লেভেল ক্রসিংটার উত্তরে, কোনো একটা পরিচ্ছন্ন পাড়ায়। কী যেন নাম সেই পাড়াটার, যেখানে, সরোজ বলছিল, সে একটা দু-কামরার ফ্ল্যাট নেবে?

সুর্মাদানটা হাতে নিয়ে আরতি জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে লোভটাকে মুছল। ততদিন, আর কী, ততদিন, হাত টনটন করে করুক, আয়নাটা তুলে-তুলে টিপ পরি আর সুর্মা আঁকি আর চুল বাঁধি। যাবে কোনদিন চোখে কাঠিটা বিঁধে! তখন চোখ-গেল পাখির মতো কাতরাতে হবে। সরোজ ফিরেও চাইবে না। আর, চোখ গেলে, সে চাইল কিনা, তা-ও জানব না। ভাবনারও যদি কিছু মাথা-মুণ্ডু থাকে! বরং ছাই রঙের শাড়িটাকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প'রে দেখি। উপায় তো নেই, এটাকেই পরতে হবে। আমার ভালো না লাগুক, আর কারও চোখে না ধরুক, ওর তো ধরবে। অল্প-অল্প হেসে বলবে, 'ছাই-চাপা আগুন।' কে জানে, মনের কথা

বলে, না ঠাট্টা করে। দুষ্টুর মতো সর্বদাই ওর চোখ মিটমিট করে, ওকে বিশ্বাস নেই।

উঁহু, চোখ ঘুরিয়ে আয়নার ভিতরকার সখীকে আরতি বলল, অত পাউডার মেখো না, ওর চোখে ধরা প'ড়ে যাবে। আর গরমে যদি ঘেমে যাও, তবে তো কেলেঙ্কারি। সাজগোজে অবশ্য ওর আপত্তি নেই, ওটা তো মেয়েদের ধর্ম। কিন্তু বাড়াবাড়িটা বরদাস্ত করতে পারে না। প্রসাধন, ও বলে, রূপকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে নয়, রূপটাকে দেখিয়ে দেবার জন্যে। পড়ার বইয়ের দরকারী লাইনের নিচে আমরা যেমন দাগ দিই। প্রসাধন আসলে সেই দাগ-দেওয়ার কাজ।

গানের গলা নয়, কাউকে শোনাবার মতো নয়, তবে নিজের কানে মন্দ লাগে না। আরতি গুনগুন ক'রে শুনে-শেখা একটা গানের দু-লাইন গাইল। গেয়েই থামল। থাক, মা কী মনে করবে। সেই বিকেল থেকে উনুনের পাশে গিয়ে বসেছে, নিমকি ভাজছে সরোজের জন্যে। মুখটা তেতে উঠেছে। তবু আমাকে ঘেঁষতে দেয়নি। উনুনের আঁচে নাকি আমার চেহারা নষ্ট হবে। কিন্তু এটা-ওটা এগিয়ে তো দিতে পারি। মা-র উৎসাহ দেখে ভালোও লাগে, হাসিও পায়। এর মধ্যে তিনবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'সরোজ এসেছে? এখনও এল না যে? আসবে তো ঠিক? তোকে কবে বলেছে বল তো ঠিক?'

আরে, আসবে, আসবে, আসবে। মাথাব্যথা কি মা-র? নাই যদি আসবে, তবে আজ বিকেলে আকাশটা হালকা মেঘে-মেঘে এমন সুন্দর হ'ল কেন? ফুরফুরে হাওয়ায় পুকুরটার সবুজ জল কাঁপছে কেন। আসবেই।

তিন-চারটে বাস ছেড়ে তবে একটার পা-দানিতে দাঁড়াতে হয়, অফিস-টাইমে যা ভিড়। এখন তো সবে সাড়ে-পাঁচটা কি ছ'টা—সাড়ে-ছ'টার মধ্যে নিশ্চয় আসবে। এ-পাড়া থেকে যারা ওদিকে গিয়েছে, তারাও তো কেউ এখনও ফেরেনি।

ফুল-তোলা একটা ঢাকনি এনে আরতি নিচু টুলটার উপরে বিছিয়ে দিল। বাঃ, এইবার বেশ হয়েছে। চোখের যন্ত্রণা নিয়ে, আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়েও যত্ন ক'রে ফুলগুলো তুলেছিলাম, সেই যন্ত্রণা এবার সার্থক হয়েছে। আরও অনেক ঢাকনি আর পর্দা থাকত যদি আমাদের? তবে এই ঘরের যেখানে-যেখানে এখন অভাব খোঁচা-খোঁচা চোখা-চোখা হ'য়ে আছে, চোখে বিঁধছে, সব

ঢেকে-ঢুকে রাখতাম। ঢাকতাম ওই রং-ওঠা তোরঙ্গটা আর কাঁঠালকাঠের তক্তাপোশে পাতা ময়লা বিছানা।

অত ঢাকাঢাকির দরকারই বা কী। সরোজের কাছে লুকোনো তো কিচ্ছু নেই। ও তো নাড়ি-নক্ষত্র সব জানে। সেই শেয়ালদা স্টেশনে যখন পড়ে ছিলাম, তখন থেকে জানে। আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল, খুঁজে-খুঁজে গেল সেখানে। কে আমার ভাইকে বই-বাঁধাইয়ের কাজে ঢুকিয়ে দিল? লোকের জন্যে হাঁটা-হাঁটি ক'রে এই কলোনিতে চালাঘরটা তুলে দিল কে? আমি যে প্রাইমারি ইস্কুলটায় চাকরি পেয়েছি, কার চেষ্টায়?

সরোজের। মা বলেন, অমন ছেলে হয় না। আরতি আপন মনেই একটু হাসল। কেমন ছেলে, আমি তো জানি। বড়ো মন, চওড়া বুক, সব ঠিক। লোকের ভালো করবে ব'লে ঝাঁপিয়েও পড়ে। মা শুধু ওইটুকুই দেখেছেন। রাগটুকু তো দেখেননি বাবুর। ধর্মতলার সেই চায়ের দোকানে আমার জন্যে একদিন আধ ঘণ্টা ব'সে থাকতে হয়েছিল ব'লে কী রাগ! আমি এ-কথা বলি, সে-কথা বলি, সাড়াই দেয় না। শেষে আলগোছে টেবিলের নিচে হাত দিয়ে একটা চিমটি কাটলাম। তখন হেসে ফেলল। আমাদের সিনেমা দেখার কথা ছিল। বলল, আর পাঁচ মিনিট দেরি হ'লে নাকি টিকিট ছুটো ছিঁড়ে ফেলে দিত।

কেন দেরি হবে না? আমার কি গাড়ি আছে। সেই তো বাসই ভরসা। তোমরা পুরুষমানুষ, গায়ে জোর আছে, কারও ছোঁয়া লাগলে গায়ে ফোসকা পড়ে না, তোমরাও বাসের পর বাস ছেড়ে দাও। আমরা মেয়ে হ'য়ে কী ক'রে উঠি? একটু বিবেচনা করতে হয়।

বাইরে কার জুতোর শব্দ পেয়ে আরতি বারান্দায় গেল। অন্য লোক। ফিরে এল ঘরে। আর, এই যে তুমিও আজ দেরি করছ. আমি রাগ করতে পারি না? যদি মান করি, যদি কথা না বলি?

না, না, আজ ওসব মান-টান ক'রে সময় নষ্ট কোরো না। অনেক দরকারী কথা আছে। এবার তো আমাদের বাসা হয়েছে, ভাইটাও কোনোরকমে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আমাদের ব্যাপারটার একটা-কিছু ঠিকঠাক করতে হবে। ও এলেই ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যাব। কোথায় যাব, ওই পুকুরটার পাড়ে? ওখানে যে আড়াল নেই। ছু-জনে রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলব? না, না, পাড়ার লোক দেখবে। তার চেয়ে এই বারান্দাই ভালো। মা তো রান্নাঘর ছেড়ে সহজে নড়ছে না।

মা ঘুময়নি, ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে আছে। চৌকাঠে দাঁড়িয়েই আরতি বুঝতে পারল।—সেই এতটুকু বয়স থেকে মায়ের পাশে শুয়ে আসছি তো, ওর ঘুম আমি বুঝি। ঘুমলে মা-র চেহারাই আলাদা হ'য়ে যায়। আর ওভাবে চিৎ হ'য়ে মা যে ঘুমতে পারে না, সেটা হয়তো ও নিজেও জানে না। আমি জানি। বাইশ বছর ধ'রে দেখছি কিনা। ঘুমলেই মা পাশ ফিরবে। তা ছাড়া আরও কয়েকটা লক্ষণ আছে।

জেগে আছে, আমি গিয়ে শুলেই কাছে স'রে আসবে। তারপর জেরা শুরু করবে। মা বড়ো অবুঝ। এত অবুঝ কেন, আরতি ভাবল, কেন বোঝে না আমি এখন ক্লান্ত, খু-ব ক্লান্ত? এইমাত্র সরোজের সঙ্গে ঘুরে এলাম, তা কমসে-কম মাইল খানেক তো হেঁটেছি, হোঁচটই খেলাম দু-বার। ছাই রঙের শাড়িটার পাড় ছিঁড়ল, স্যাণ্ডালটার স্ট্র্যাপ খুলল। এখন কি অত-শত কথার জবাব দিতে পারি?

ছাই রঙের শাড়িটা খুলে আরতি সযত্নে ভাঁজ ক'রে রাখল। তুলে নিল সর্বদার কাপড়টা। আয়নাটা বাক্সের উপরেই আছে, কিন্তু মুখ দেখতে ইচ্ছে করল না। গরম লাগছে—বিশ্রী গরম লাগছে। এখন কলতলায় যাব, গায়ে না ঢালি, মাথায় জল ঢালব, ঠাণ্ডা হব। রান্নাঘরে গিয়ে দেখব, খাবার কিছু ঢাকা দেওয়া আছে কিনা। তখনও কি মা ঘুমবে না।

চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে-দিতে আরতি ভাবল, তুমি ঘুমলে কি না ঘুমলে, তাতে আমার ব'য়েই গেল। ঘুমও বা না ঘুমও, আমার মুখ থেকে একটি কথাও বার করতে পারছ না। বলব না, তার দুটি কারণ। এক, আমি ক্লান্ত। দুই, তোমাকে আমি হতাশ করতে চাই না। সারা বিকেল আজ তুমি উনুনের তাতে ব'সে চা জলখাবার করেছ, সরোজ আমাকে নিয়ে যখন বেড়াতে গেল, তখন হয়তো আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে পাঁজি খুলে লগ্ন দেখেছ।

মা, তোমার বয়সই শুধু আমার চেয়ে বেশি। মানুষের মুখ দেখে কিছু টের পাও না। সংসারের রীতিনীতি বোঝো না।

কলতলা থেকে ফিরে বারান্দায় একটা টুল পেতে বসল আরতি, তবু ঘরে ঢুকল না। ওখানে ঢুকব কি, ওখানে গরম, ওখানে হাজারো জেরা। মা তো আমার মুখ দেখে টেরই পায়নি যে, আজ সব শেষ ক'রে দিয়ে এলাম। আমি যে ভীষণ ক্লান্ত, আমার যে কান্না পাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে, মা কি তার সামান্য আভাসও পেয়েছে।

পায়নি। পাবে না। আমি কিছু বলব না। অন্তত আজ না। আরতি

ব'লে গেল মনে-মনে, দক্ষিণ আকাশের হলদে রঙের একটা তারাকে সাক্ষী রেখে যেন প্রতিজ্ঞা করল।

টুলেও বেশিক্ষণ বসা গেল না, মশা ভারি বিরক্ত করছে। তার চেয়ে বরং দাওয়ায় বসা যাক, পা মুড়ে। মা ওর মুখ দেখে কিছু টের পায়নি কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, কিছু একটা হয়েছে। কথা প্রথম দিকে সহজভাবেই বলতে চেষ্টা করছিল বটে, নিমকিও ভেঙে-ভেঙে খাচ্ছিল, কিন্তু চা আধ-পেয়ালা অবধি শেষ ক'রে বাকিটা যখন খেতে ভুলে গেল, মনে করিয়ে দিলুম, তখন এক চুমুকে ঢকঢক ক'রে সবটা শরবতের মতো শেষ করল, তখনই আমার খটকা লেগেছিল। দু-একটা কথার উত্তরও যেন এলোমেলোভাবে দিল। মনে হ'ল, মন দিয়ে শোনেইনি। তখনই ওকে ডেকে নিয়ে বললাম, চলো। বেড়াতে যাই। মাকে বললাম, মা, আমরা একটু ঘুরতে যাচ্ছি। মা বলল, যা, বেশি দেরি করিস না। আমি জানতাম, করলেও মা কিছু মনে করবে না।

বেড়াতে গিয়ে কী ঘটেছিল, আরতি মনে-মনে গুছিয়ে নিল। ওরা পাশা-পাশি অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিল। তখন দু-একটা বাজে কথা বলেছে মাত্র। তারপর সেই বাগানটা পাওয়া গেল, বটগাছটার সেই বাঁধানো বেদি। একেবারে নিরিবিলি।

আরতি বলল, 'এইবার আমাকে বলো।'

সরোজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল—'কী বলব।'

'মিছে কথা বোলো না। আমি জানি, তোমার একটা কিছু হয়েছে।'

হাই তুলেছিল সরোজ। নির্বিকার, উদাসীন ভঙ্গি, একটু বা কঠিন। 'কিছু হয়নি, আমি এখান থেকে চ'লে যাব। ঠিক ক'রে ফেলেছি।'

'কোথায় যাবে।'

'অন্তত এই বাংলাদেশের বাইরে তো বটেই। এখানে আমার আর ভালো লাগছে না।'

'কী হয়েছে।' আরতি ওর হাত ধরেছে, 'আমাকে বলো।'

'কিছু না, বলছি তো।'

'তুমি লুকোচ্ছ।'

এতক্ষণ তবু সংযত ছিল সরোজের ভঙ্গি, হঠাৎ উঠে প'ড়ে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। 'দেখ, আমি লুকোইনি, বরং লুকিয়েছ তুমি।'

'আমি!'

'তুমি। দেখ, আমি বলতে চাইনি। তুমি জোর করলে ব'লেই বলছি। আমার এসব কথায় রুচি ছিল না।'

'দেখ, ভনিতা রাখো। কী লুকিয়েছি আমি, কী তুমি জেনেছ, আমাকে বলতেই হবে।'

ধীর গম্ভীর স্বরে সরোজ বলল, 'লুকিয়েছ তোমার অতীত।'

'লুকিয়েছি? তুমি জানতে না, আমরা কত গরিব। জানতে না গ্রাম থেকে এসে স্টেশনেই তিন মাস ছিলাম?'

সরোজ বলেছে, 'জানতাম। শুধু জানতাম না, তুমি—তুমি আমি যা ভেবে-ছিলাম তা নও।'

'নই?'

'না। দেশ ছেড়ে আসবার আগে তোমাকে ওরা ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল। দু-মাস ওদের হাতে ছিলে। শেষে কোনোমতে ছাড়া পেয়ে মা-র কাছে ফিরেছ, এখানে পালিয়ে এসেছ।'

'আর?'

'আর?' সরোজ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়েছে। 'না, আর কিছুই নেই।' বলতে-বলতে সে যেন অবসন্ন হ'য়ে ফের বেদিতেই ব'সে পড়ল, অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে বলল, 'কেন তোমরা আরও কয়েক মাস আগে চ'লে এলে না আরতি, অনেকেই তো এসেছিল। তবে তো সর্বনাশ হ'ত না।'

'না!' আরতি ধীরে-ধীরে বলেছে, 'হ'ত না। সরোজ, তুমি তা হ'লে একটি পবিত্র কুমারীই পেতে।'

সরোজ যেন একটু অপ্রতিভ হয়েছে। 'তুমি ঠাট্টা করছ। তুমি জানো আমার নিজের কোনো সংস্কার নেই। কিন্তু আমার দিদি—'

'না, না, তাঁকে ঠকানো ঠিক নয়।'

'তুমি আমাকে কেবল ভুল বুঝছ। তোমাদের গ্রামেরই একটি লোকের সঙ্গে সেদিন দিদির দেখা হয়েছিল।'

'স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তিনিই খবরটা দিলেন?'

'না, না, ঠিক সেভাবে নয়। কথায়-কথায় হঠাৎ বললেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তিনি আমাদের কথাটাও জানেন না। তুমি জানো না আরতি, সেই থেকে আমি কী যন্ত্রণার মধ্যে আছি। তুমি একবার শুধু বলো, যা শুনেছি তা মিথ্যে?'

দাঁতে ঠোঁট চেপে আরতি বলেছে, 'না, মিথ্যে নয়। বর্ণে-বর্ণে সত্যি। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।'

আর কোনো কথা ছিল না, আরতি দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে এসেছে।

সরোজ পিছে-পিছে আসছিল, থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে চেয়ে আরতি বলেছে, 'তুমি আর এসে কী করবে। একা আমি ঠিক যেতে পারব। কিছু হবে না। আর—' আরতি এখানে জোর ক'রে একটু হেসেছে। 'আর হ'লেই বা কী। আমার ইতিহাস তো জেনেই ফেলেছ। নতুন ক'রে আমার আর কী-ই বা ক্ষতি হ'তে পারে?'

মা ঘরের মধ্যে ছটফট করছে, আরতি টের পেল। মা-র বড়ো ঔৎসুক্য, বড়ো ভয়। আরতি কেন এখনও ঘরে ঢুকছে না, কী করছে এখনও বারান্দায়? বড়ো ভয় মা-র, কারণে-অকারণে ভয়। অনেক ঘা খেয়েছে কিনা, তাই কিছুতেই ভরসা পায় না; খালি ভয়। একরকমের স্নায়ুরোগ, ডাক্তারেরা বলেছেন।

মাকে কিছু বলা হবে না। আরতি পা টিপে-টিপে ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। খোঁপার নিচে এটা কী। আরে, সেই গন্ধরাজ ফুলটা যে! ওটা এখনও খ'সে পড়েনি? আরতি একবার ভাবলে, ওটাকে জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলি। আবার মনে হয়, থাক। ফুলই তো। কতটুকু বা পরমায়ু ওর। এমনিতেও ঝরবে, শুকোবে, অমনিতেও বাসী হবে। থাক, খোঁপাতেই থাক। থাক না! আর এই তো শেষ ফুল-পরা, ও তো আর কোনোদিন আসবে না।

অথচ সরোজ এল, ঠিক দু-দিন পরেই, আর দুর্যোগ মাথায় ক'রে সেদিনই যে, এত সকালেই যে, আসবে, কে জানত! শেষ-রাত থেকে বৃষ্টি হয়েছে, সকালেও খোলা নালীতে অবিরাম জলস্রোত, মেঘ কাটেনি। ঝাঁকে-ঝাঁকে বৃষ্টি আসছে। থেকে-থেকে একদল ঘোড়সওয়ার যেন দিগন্ত থেকে দিগন্তরে ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে যাচ্ছে। নিশান উড়িয়ে তাদের ধাওয়া ক'রে চ'লে যাচ্ছে অশরীরী হাওয়া।

আরতি শুয়ে-শুয়ে দেখছিল। এ হ'ল এমন দিন, যেদিন পাখিরাও আকাশকে ভয় পায়, ওড়ে না। আজও ওড়েনি। দেখছিল, রাস্তার ধারের রোগা করবী গাছটা নুয়ে প'ড়ে, যেন বুক দিয়ে আগলে, ওর বাচ্চা ফুল-গুলোকে ধ'রে রাখছে।

ঠিক তখনই সরোজ এল।

আবার কেন এল ও। আজ কেন। কেন আমার সকালের আলস্যটুকু ভাঙল। এখনই উঠতে হবে, আঁচলটা ঠিক করতে হবে, শাড়িটাও বদলে—

দূর, অত কেন। সব তো শেষ হ'য়েই গিয়েছে। যেভাবে আছি এইভাবেই যাই। দরজা খুলে আরতি বারান্দায় এল। 'ইস, একেবারে ভিজে গেছ।'

শুধু ভিজে গিয়েছে ব'লেই নয়, সরোজকে খুব অগোছালোও লাগছিল। জামাটার বোতামও ঠিকমতো পরায়নি।

আরতি বলল, 'গামছা এনে দিই, মাথা মোছো। ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে। চা করব ?'

চা করতে যাবে ব'লেই বুঝি পিছন ফিরছিল, সরোজ ওর আঁচল টেনে ধরল। গাঢ় গলায় ব'লে উঠল, 'আরতি, আমাকে ক্ষমা করো।'

'ছাড়ো। মা ও-ঘরে আছে। হঠাৎ এসে পড়তে পারে।'

সরোজ কিছু শুনল না, ওর হাত দুটি চেপে ধ'রে বলল, 'আমি ইতরের মতো ব্যবহার করেছি। ক্ষমা করো।'

আমি দুর্বল হ'য়ে পড়েছি, আরতি ভাবল। নিজের ভুলটা বুঝেছে ও, এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এসেছে, আমি কী করি। সবটুকু জোর কুড়িয়ে নিয়ে আরতি বলল, 'স্থির হ'য়ে বোসো তো। এভাবে কথা হয় না।'

টুলে বসেছে সরোজ, দু-হাতের মধ্যে মাথা রেখেছে। শুকনো, ভাঙা-ভাঙা গলায় বলছে, 'আমি এ দু-দিন ঘুমতে পারিনি।'

সতর্ক দৃষ্টিতে আরতি ভিতরের দিকে চাইল। মা আসছে না তো। এলেই বা। মা-ও তো খুশি হবে। এই দু-রাত্রি মা নিজেও তো ঘুময়নি। তবু একবার সন্তর্পণে লজ্জায় ভিতরের দিকে চেয়ে আরতি সরোজের চুলে আঙুল ঢুকিয়ে বলল, 'ওভাবে বোলো না। আমিও তো ঘুমতে পারিনি। তুমি ফিরে তো এসেছ, এই ঢের। কত ভুলই তো আমাদের হয়।'

চোখ তুলে সরোজ বলল, 'কী বিশ্রী ভুল বলো তো! তুমি সেদিন বোধ হয় খুব অভিমান করেছিলে, তাই ইচ্ছে ক'রেই আমার ভুলটা ভেঙে দাওনি। আমি কিন্তু জেনেছি।'

আরতির গলা কেঁপে গেল। 'কী জেনেছ ?'

'সেই ভদ্রলোককে দু-দিন ঘোরাঘুরি ক'রে কাল সন্ধ্যার পরে ধরেছি। খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। বিশিষ্ট ভদ্রলোক, বলেছি তো মিথ্যে বলবেন না। তিনি কয়েকটা কথার পরেই টের পেলেন, মারাত্মক রকমের ভুল করেছেন।

যে-মেয়েটির কথা তিনি বলেছিলেন, তুমি সে নও। অপ্রস্তুত হ'য়ে বারবার ক্ষমা চাইলেন। আরতি, ক্ষমা চাইতে আজ সকালেই ছুটে এসেছি আমি। বলো ক্ষমা করেছ?'

'করেছি।' আরতি বলল মৃদুস্বরে, কিন্তু কখন একটু-একটু ক'রে পিছিয়ে গিয়েছে, সে নিজেও টের পায়নি।

'মাকে ডাকো। তাঁকেও বলি, প্রণাম করি।'

আরতি বলল, 'আজ থাক। সরোজ, এবারে চা আনি?'

সেই গলায় কী ছিল, সরোজ চমকে উঠল, চাইল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। নিষ্প্রভ মুখ আরতির, একটু যেন কঠিন। আড়ষ্ট স্বরে সরোজ বলল, 'তোমার কী হ'ল। তুমি কি সুখী হওনি।'

চোখ সরিয়ে আরতি জানলায় রাখল। এখনও মেঘ কাটেনি। 'সরোজ, তুমি কী ক'রে ফিরবে। এখনও যে বৃষ্টি থামল না?'

এবার অসহিষ্ণু হ'য়ে সরোজ ব'লে উঠল, 'তুমি কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ। খালি ফিরে যাবার কথা বলছ। তোমার অভিমান কি এখনও গেল না? বলেছি তো, আবার বলছি, আমি ভুল করেছি। তোমার কোনো কলঙ্ক নেই।'

সরোজ উঠে দাঁড়াল। হয়তো আরও একবার আরতির হাত ছোঁবে ব'লে এক পা এগিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু আরতি আরও দূরে স'রে গেল, দাঁড়াল দু-ঘরের মাঝখানের চৌকাঠে। সরোজ দু-চোখ দিয়ে মিনতি করল, 'এসো।'

আস্তে-আস্তে আরতি বলল, 'তা হয় না।'

সরোজ আকুল গলায় ব'লে উঠল, 'কেন হয় না আরতি? আমার আর তো কোনো সন্দেহ নেই। সব মিথ্যে জেনেই তো আমি ছুটে এসেছি।'

তেমনি দূরে দাঁড়িয়ে আরতি খুব নিচু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, 'সেইজন্যেই তো আরও হয় না। সরোজ, তুমি সব মিথ্যে জেনেই এসেছ। সব সত্যি জেনেও তো আসতে পারোনি।'

চিররূপা

আর-এক জন্ম অন্য মৃত্যু

বিমল কর

. . . .

দেশলাইয়ের কাঠির মতন ওর হাসি ফস্ করে জ্বলে উঠেছিল প্রথমে; ক' পলকেই বারুদ ফুরোলো। তারপর দুর্বল ম্লান একটু শিখা যেমন কাঠির গা বেয়ে অত্যন্ত অনিশ্চিতভাবে এগুতে থাকে, ম্লানতর হয়, পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে কুঁকড়ে শেষে চোখের পলকে নিভে যায়—ওর হাসিও তেমনি প্রথমে ধ্বনি ও আতশজ্বলা উজ্জ্বলতা হারাল, নিঃশব্দ হল, হালকা হয়ে মুখে মাখানো থাকল, ক্রমে মৃদু ক্ষীণ হয়ে শেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেন কাঠির মতনই সে পুড়ে শেষ হল। দু' একটি মুহূর্ত তবু তার হাসির রূপটা আমার মানসিক অস্তিত্বে বেঁচে থাকল, সুগন্ধ নিঃশেষ হয়ে গেলেও ঘ্রাণের সেই অতি ক্ষীণ অনুভূতির মতন। ···ওকে দেখছিলাম। এখন আর কিছুই নেই, হাস্যধ্বনি উজ্জ্বলতা আভা রেশ—কিছু নয়।···মনে হচ্ছে, আর-এক নতুন মানুষের সামনে বসে আছি; এইমাত্র ও এসেছে, মুখোমুখি বসেছে। ওর মুখ কাঠ-খোদাই পুতুলের মতন। কি কাঠ জানি না, বাদামির সঙ্গে ঈষৎ কমলার মিশেল; ঘাম-তেলের মতন নরম করে আঠা মাখানো, মেঘলাভাব দিনে দুপুরের রঙ যেন।···জানি না, খোদাই কাজটুকু কে করেছিল। তবে কারিকরের অযত্ন অন্যমনস্কতা নেই। ওর মুখের গড়নটি লম্বা ছাঁদের; কপাল থেকে গাল, গাল থেকে চিবুকে মিহি-বঙ্কিম ঢল ফুটেছে। মসৃণ কপাল যেন ছাঁচ-তোলা, বলয়াকৃতি। ছড়ানো ভুরু ঘনতা থাকলে হয়তো আরও সুন্দর হত। চোখের জমিটা মোমের মতন সাদা। পাণ্ডুর, প্রাণহীন। নিকষ কালো চোখের তারা। ওষ্ঠের রেখায় ভীরুতা, অধরে কামনা-পীড়া। আশ্চর্য, ওর সুছাঁদ নাকের স্ফীত প্রান্তটি বুঝি কান্নার উচ্ছ্বাসেই জীবন্ত হয়। ওই পুতুলটির চিবুকের ডৌলে কেমন করে বাল্যের শুচিতা থেকে গেল আজও, আমি বুঝতে পারি না।···দেশলাইয়ের কাঠির মতন পুড়ে পুড়ে ও যখন নিষ্প্রাণ, নিঃশেষ—তখন আমি তাকে দেখছিলাম, কাঠের পুতুলের মতন সে সামনে বসে ছিল। খোলা জানলার পরদা হাওয়ায় উড়িয়ে শীতের অন্ধকার ঘরে আসছিল; কুয়াশাও। বাতি জ্বালার কথা আমার মনে হয়নি, আগ্রহ অনুভব করিনি।···ওর জীবনের কথা আমি ভাবছিলাম। শেষরাতের তারারা ডুবেছে, আকাশ ফরসা হয়ে আসছে—এই

রকম কোনো সময় হয়তো ও জন্মেছিল। আমি আবার করে ওকে জীবন পেতে দেখেছি। ওর নবজন্ম। সে এক সুন্দর গোধূলির মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছিল। জগৎ তখন ওর কাছে মধুর মনোরম, শুদ্ধ ও সুন্দর ছিল।···আমি জানি ওর মৃত্যু আমি দেখব। এ আমার নিয়তি। সেই দেখা ওর আর আমার শেষ দেখা।···শীতের অন্ধকার ধোঁয়ার মতন এখন এখানে পুঞ্জীকৃত। অতি অস্পষ্ট রেখার আঁচড়ে ফুটে-ওঠা রহস্যমূর্তির মতন ও বসে আছে। অল্প কয়েকটি মুহূর্তের পর আমার চোখ ওকে হারাবে। অন্ধকার ওর অস্তিত্বকে গ্রাস করবে, আমি আর ও একটি দুস্তর ব্যবধানে পৃথক হয়ে যাবো। সে অন্ধকার শীতের অন্ধকার থেকেও ঘন, মেঘের পরদার চেয়েও গাঢ়।···আমি সময়ের কাঁটা দেখছি না, অন্য কাঁটা দেখছি: আর কয়েক মুহূর্ত পরেই কাঁটা দুটো গায়ে গায়ে মিশে যাবে। সেই মুহূর্তটি আমাদের শেষ···। সব শেষই বুঝি অদ্ভুত এক প্রতিধ্বনি তুলে শুরুকে ছুঁতে যায়। আমার মনেও এক প্রতিধ্বনি অতীতের তেপান্তরে ওকে অন্বেষণ করছিল। মনে হল ওর শুরু আমার কাছে ধরা দিয়েছে। সেই গোধূলি···জগৎ যখন ওর কাছে শান্ত মধুর মনোরম, শুদ্ধ ও সুন্দর। অশোকার সে-দিন নবজন্ম :

'ইস্···দেখেছ বাইরেটা একবার!'

'দেখেছি।'

'কি রকম গোধূলি···! এই, এসো না একবার···উঠে এসে জানলার কাছটায় দাঁড়াও।···দেখছ?'

'চৈত্র মাস···'

'চৈত্র মাস বলেই কি এমন সুন্দর গোধূলি হয়েছে?'

'জানি না। হয়তো তাই···আকাশটা যেন ফেটে পড়ছে, সূর্যও টকটকে আবীর—এখানকার ধুলো লাল, বাতাস···'

'বাতাসটা আজ কেমন উল্টোপাল্টা···বসন্ত-বসন্ত লাগছে···'

'হাসির কি, বসন্তকালই তো!'

'···বসন্ত জাগ্রত দ্বারে···বাব্বা, এই শেষ সময় বসন্ত জাগল!'

'হয়তো আগেই জেগেছে, তোমার চোখে ধরা পড়ে নি।'

'বাজে কথা। আমি অন্ধ নাকি···এর আগে কোনোদিন এমন সুন্দর দেখলাম না···'

'নাই-বা দেখলে। অন্য কেউ দেখেছে; তাদের পালা ছিল। আজ তোমার পালা।'

'ধ্যুত, আমার আবার কি! মেঘ বৃষ্টি বসন্ত গোধূলি পূর্ণিমা এ-সব কি কারও একার জন্যে হয়!'

'হয়।'

'তুমি কথার জোরে নয়-কে হয় করো।'

'বেশ, আমি চুপ করছি, তুমিই বলো।...তার আগে তোমার আলগা আঁচলটাকে একটু সামলাও, আমার চোখ গেল... ।'

'বাব্বা! তা তুমি আমার এ-পাশটায় এসে দাঁড়াও না...আবার হাওয়া এসে আঁচলে পাল তুলে দেবে...না হয় ঝাপটাই দেবে তোমার চোখে... কতক্ষণ আর আটকে রাখব। যা হাওয়া আজ।'

'ওলোট-পালট...'

'বটেই তো, কিন্তু কী মিষ্টি...'

'গোধূলি...'

'বলো না বলো না...অপূর্ব...আমি এমন আর দেখি নি কখনো।'

'আকাশটা একবার দেখ।'

'দেখছি তো...তখন থেকেই দেখছি... । সেই যে কি যেন একটা গোলাপ আছে...ঠিক লাল নয় লালের মতনই, একটু কালচে ঘেঁষা...ভীষণ গাঢ় ...রক্ত শুকিয়ে এলে যেমন হয়...অনেকটা যেন...'

'তুলনার জন্যে বড় বেশি দূর যাচ্ছ। খুব ছুটছে মনের পক্ষিরাজ।'

'যাঃ! ঠাট্টা হচ্ছে!'

'ঠাট্টা! সত্যি ঠাট্টা নয়।...ওই দেখ সূর্য ডুবে যাচ্ছে।'

'আ—আ হা...মরি মরি...কী সুন্দর। চুপ, এখন আর কথা বলো না।'

'অশোকা!'

'কি?'

'এবার একটু কথা বলি, কি বলো!...'

'কি দেখছ?'

'ওই গাছটা...'

'শিরীষ?'

'হুঁ…, কৃষ্ণচূড়া। সবই দেখছি…দেবদারু আম নিম…গাছপালার ঝোপ মাঠ…'

'অন্ধকার হয়ে আসছে।'

'দূরের পাহাড়টা এখন ঠিক যেন মেঘ। না?'

'অবিকল।'

'…আচ্ছা, আমি তো গাছ হতে পারতাম?'

'জানি না।'

'এক-একটা সময় এই রকম সব কথা মনে হয়, কেন বলতে পার?…সত্যি, মনে হওয়ার হয়তো মাথা-মুণ্ডু নেই, তবু হয়। খানিক আগে কেমন একটা চিক্‌কাটা সোনা-সোনা মেঘ হয়েছিল, দেখেছিলে? আমার মনে হচ্ছিল আমি যদি ওই মেঘটাই হতাম। কিংবা ধরো না, ঝাঁক বেঁধে কলকলিয়ে ডাক দিয়ে দিয়ে যে পাখিগুলো উড়ে গেল, ওদেরই একটা হতে পারতাম…! বেশ হত!'

'মানুষ হয়ে জন্মেছ বলে তোমার দুঃখ হচ্ছে?'

'না, তা নয়…তবে মানুষ হয়েই বা কি আলাদা ঐশ্বর্য আমরা পাই? একটা পাখি বা মাছ হওয়া মন্দ কিসের? বরং…'

'তোমার চুলগুলো একটু ঠিক করো…আমি মুখ দেখতে পাচ্ছি না।'

'দরকার নেই দেখে, গা ঘেঁষে রয়েছ, আবার মুখ কেন?'

'গা কথা বলে না, গায়ের রূপ একই; মুখ কথা বলে, মুখের রূপ অনেক।'

'আমার মুখের রূপ-টুপ নেই—।'

'দেখছি তাই, খানিক আগে খুশিতে ভরা ছিল, তারপর দেখলাম তন্ময়, এখন দেখছি উদাস…।'

'তুমি বুঝি এই সবই দেখছ?'

'কি করব বলো, পাখি মাছ গাছ মেঘ এরা যে কথা বলে না। তারা যদি তোমার মতন খুশিটুকু জানাতে পারত!'

'তাতে কি! আমার শুধু ভাল লাগে, ওরা যে ভাল লাগায়; আমার কেবল হবার ইচ্ছে, ওরা যে হয়েছে।'

'…আজ কি হল তোমার? এত কাব্য—কল্পনা—?'

'কল্পনা…তুমি কল্পনা ভাবলে স-ব!…অবশ্য কল্পনা ছাড়া আর কি-ই বা!

আমি সত্যি সত্যি মেঘ বা মাছ হতে যাচ্ছি না। তবে কল্পনাই বলো আর যা-ই বলো, কেমন যেন লাগে এ-সব কথা ভাবলে! না— ?'

'লাগাই স্বাভাবিক। বোধ হয় সব সৌন্দর্য এবং আনন্দের কাছে আমরা কাঙালপনা করি··· । আমি তুমি বসন্ত হতে পারি না, মেঘ নয় গাছ নয়, পাখি ফুল—কোনোটাই নয়। কে জানে এই অভাব অক্ষমতা না থাকলে বাস্তবিক ওদের ভাল লাগত কি লাগত না। বোধ হয় লাগত না।'

'এবার নিজে যে দার্শনিকতা করছ! আমি অত বুঝি না। দরকার কি বোঝার! ভাল লাগার তলায় কত রকম অঙ্ক আছে তা জেনে আমার লাভ নেই।'

'সেই ভাল।···মুখ থেকে তোমার ওই চুলের জাল সরিয়ে নাও তো। ফটোগ্রাফী আমার ভাল লাগে না—জীবন্ত মুখটাই দেখতে চাই।'

'আমার মাথার এই চুলের জঙ্গল একদিন কচ্ কচ্ করে কেটে ফেলব।'

'কি সর্বনাশ!'

'বড্ড জ্বালায়!'

'রূপের জ্বালা, ঐশ্বর্যের জ্বালা··· । যাদের নেই তাদের—'

'আঃ, থামো। বড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলো তুমি!···ইস্, কপালটা কি রকম ধুলো-ধুলো হয়ে গেল দেখেছ! বড্ড ধুলো উড়ছে তো!'

'অন্ধকার হয়ে গেছে—জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আর লাভ নেই— !···'

'চলো বসি— ।'

'চলো— ।'

'বাতিটা জ্বেলে দি।'

'থাক না; খানিক পরে চাঁদ উঠবে—'

'খানিক নয়—বেশ কিছু পরে।'

'তাই উঠুক।'

'অতক্ষণ থাকবে তুমি?'

'থাকব।'

'তোমার মা··· ?'

'মা জানে, মামাও শুনেছে।···বাব্বা, কৌতূহল মিটলো তোমার। কি যে মানুষ তুমি!'

অন্ধকারেই আমরা বসে ছিলাম। চাঁদ ওঠার প্রতীক্ষা নিয়ে নয়। যখন খুশি উঠবে, না উঠলেও আমাদের হা-হুতাশ নেই। গাঢ় বুনোট আঁধার আমাদের সত্তাকে আরও নিকট নিবিড় করছিল। কখনও কখনও এমনই হয়, হারিয়ে যাওয়ার আনন্দে আমাদের মন ভিজে ওঠে। অন্ধকারেই এই নিবিড়তা ক্রিয়াশীল, আলোয় নয়। আলো স্বতন্ত্র রেখায় অশোকার মূর্তি গড়বে, আমাকে আমার মূর্তি দেবে। শরীরকে আলোয় মোছা যায় না। আমরা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে তখন হারাতে চাইছিলাম। অন্ধকার আমাদের সাহায্য করছিল, ঘরের এবং বাইরের অটুট নীরবতা করুণা করছিল আমাদের। নিঃশব্দ মৃদু সান্ধ্য-বাতাস আমার এবং অশোকার নিশ্বাসকে একাকার করেছে। অশোকার মনে আজ সহস্র অলঙ্কার। এই ঘর তার কাছে বেড়া ভেঙে সময় এবং ভবিষ্যতের সীমাহীনতায় মিলিয়ে গেছে।…তবু চাঁদ উঠল। মিহি ভীরু একটু আলো। মনে হচ্ছিল, অনেক দূরে আলো হাতে দাঁড়িয়ে কে যেন আমাদের অপেক্ষা করছে।

'অশোকা?'

'উঁ—!'

'চাঁদ উঠল। আমি ভেবেছিলাম আরও পরে উঠবে!'

'উঠুক…ভালই তো!'

'তোমার কাছে আজ সবই ভাল।'

'সত্যি।'

'কোনো কিছুই খারাপ লাগে নি?'

'কি জানি মনে পড়ছে না।'

'তোমার মামাকে?'

'উঁহু। মামাকে আজ কেমন যেন লাগছিল। কি জানি কেন মনে হচ্ছিল, মামা আমাদের সামান্য যা-কিছু নিয়েছে, ভালই করেছে। দরকার ছিল বলেই নিয়েছে। আমাদের কাছে চাইলে হয়তো আমরা দিতাম না। স্বার্থে লাগত।'

'তাঁর দুর্ব্যবহারে তুমি…'

'অতিষ্ঠ হয়েছিলাম। এখন উলটো কথাই মনে হয়। মামা সংসারের ঝড়-ঝাপটা এত বেশি খেয়েছে—এখনও তো খাচ্ছে—তাতে ও-রকম হয়ই।

মামীর অসুখের সময় মামা গালাগালি দিত, অথচ সেই মামাই মামীর বিছানার পাশে বসে রাত জাগত, কাশির রক্ত নিজের হাতে কেচে কেচে ধুত।…কত সময় দেখেছি—মামীর শুকনো রক্তের দাগের দিকে মামা তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে। যেন ওটা মামারই রক্ত।…'

'আজ মা-কে খুব অবাক করে দিয়েছি।'

'আমাকেও কম করো নি।'

'তোমাকে আমি ধরি না।'

'সে কি!'

'তুমি মশাই আমার হিসেবের বাইরে।'

'হুঁ, তবে একেবারে নয়; আমি এক, তুমি আমার পাশের শূন্য—,… হাসছ যে বড়, বুঝেছ?'

'বুঝেছি। কিন্তু আমি হাসছি তুমি কি করে বুঝলে?'

'আহা, তাও যদি না হাতখানা আমার হাতে থাকত।'

'তুলে নেব?'

'অত সহজে সব কি তুলে নেওয়া যায়।'

'…তোমার মা-কে অবাক করে দেবার কথা বলো, শুনি—।'

'বলতেই যাচ্ছিলাম, বাধা দিলে মাঝখানে।'

'আর দেব না। বলো।'

'মার ধারণা ছিল আমি আমাদের পুরনো কথা কিছু জানি না। আমি জানতাম। দুপুরে মা শুয়ে ছিল নিজের ঘরে, আমি কল্যাণ-কাকার কথা তুললাম! মা চমকে বিছানায় উঠে বসল। আমার কেমন কান্না পাচ্ছিল।…মাকে বললাম, সাতাশ বছর বয়সের মধ্যে বাবা যদি পাগলামি করে তিনটে বিয়ে করে বসে…তুমি উনিশ বছর বয়সে কল্যাণ-কাকার কাছে আশ্রয় নিয়ে অন্যায় তো কিছু করো নি। বাঁচার জন্যে কারুর ওপর ভালবাসা—নির্ভরতা দরকার। নয় কি, তুমি বলো?'

'অশোকা!'

'কি?'

'কথাটা তুমি তোমার মাকে না বললে পারতে, আমাকেও।'

'পারতাম না। আমার মা আমি—আমরা মানুষ। সিসের মূর্তির মতন আমার মা চোখের সামনে সাজানো থাকবে—আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেও

আমার মা-র মনের তল পাব না—এ কি হয় নাকি? আজ আমার আর মা-র সম্পর্ক সহজ হয়ে গেছে।…মা-র কষ্ট আমি বুঝতে পারছি, এই কষ্ট না বুঝলে মা-র কতটুকু বুঝতে পারতাম।…'

'তোমার মাথায় আজ পোকা নড়ে উঠেছে।…চলো এবার একটু বাইরে যাই। কদমতলা দিয়ে হেঁটে ঝিল পর্যন্ত বেড়িয়ে আসি।'

'চলো।'

কদমতলার কাছে অন্ধ গরুটা দাঁড়িয়ে ছিল। ছায়ার চাঁদোয়ার তলায় লাল মাটি ঘুমিয়ে পড়েছে কালোর চাদর টেনে। পাতার জাফরি কমে গেল। এবার কাঁকরে পথ। মনোহর তেলি কেরোসিন বাতি জ্বালিয়ে দোঁহা পড়ছিল: 'যতদিন মাটির তলায় বীজ ছিলাম কেউ আমার দিকে নজর দেয় নি, আজ গাছ হয়ে মাথা তুলেছি গরু ছাগল আমায় মুড়িয়ে খেতে আসছে, ছেলেরা পাতা ছিঁড়ে পরখ করছে আমি বিষ না মধু, বড়রা দেখছে আমার গা-গতরে ক' মন কাঠ হবে বেচার মতন।' অশোকাকে আমি দেখছিলাম। মিহি মোলায়েম আলো আমাদের আলাদা করেছে। অশোকাকে আমি দেখছি। বার বার, নিমেষহারা হয়ে। অশোকাকে এমন করে আগে কখনও দেখি নি। আগে অশোকা এমন ছিল না। আজ সে নতুন, নতুন মানুষ। তার শরীর, তার হাঁটার ছন্দ, তার মুগ্ধ শান্ত অভিভূত চোখ এই জ্যোৎস্না মাটি পথ বাতাস সমস্ত কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। অশোকার সেই ভীরুতা, দ্বিধা, শঙ্কা, বিরক্তি, ঔদাস্য, ক্লান্তি—আজ কোথায় হারিয়ে গেল? কোথায়? মনে হচ্ছে যেন, ওর জন্যেই এত আয়োজন—এই আলোটুকু, এই পথটুকু, চৈত্রের বাতাসটুকু! অবাক লাগছিল আমার, অশোকা এত জীবন্ত কি করে হল, এত আনন্দ তার কাছে কে এনে দিল—!

'আমি অনেক কথা বলেছি আজ, এবার তুমি বলো।'

'আমি! কি বলব?'

'যা খুশি তোমার। একটা গল্প বলো।'

'গল্প?'

'বলো—'

অশোকা গল্প শুনবে, কি গল্প বলি? অশোকার গল্প শোনার খুবই ইচ্ছে, কোন্ গল্প বলি? অশোকাকে দেখছিলাম। সে আমার গায়ের পাশে ঘন

হয়ে গেছে। আমরা কি এখানে মিশে যেতে পারি? এখানে আলো আছে।

'কই বলো—'
'বলতেই হবে?'
'বাঃ, তবে কি।'
'দাঁড়াও একটু ভেবে নি।'

আমার হাত ওর হাতে জড়িয়ে নিল অশোকা। ওর মাথা আমার কাঁধে যেন আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। গল্প বলতে হবে অশোকাকে। কোন্ গল্প বলি। মনোহর তেলির দোঁহার গুঞ্জন কানে ভেসে এল। ছড়িয়ে ছাপিয়ে ভ্রমরের মতন গুনগুন করতে লাগল: যতদিন আমি বীজ ছিলাম কেউ আমার দিকে নজর দেয় নি, আজ গাছ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি...

'খুব ছোট একটা গল্প বলতে পারি।'
'এক নিশ্বাসের?'
'জানি না, সে হিসেব তুমি করো।'
'বেশ বলো—'
'একটি মেয়েকে নিয়ে গল্প।'
'কোথাকার?'
'এখানকার।'
'এই শহরের—?'
'ও-সব কথা আমায় জিজ্ঞেস করো না।...এই শহরেরও হতে পারে অন্য জায়গারও হতে পারে।...যা বলছিলাম, সব মানুষের মতনই এই মেয়েটির একটি জন্ম-সময় আছে, দিন আছে, মাস বছর আছে। তার বাবা ছিল মা ছিল, অন্য পাঁচটা আত্মীয়জন যেমন থাকে মানুষের, তারও তেমনই ছিল সব।...ধীরে ধীরে এই মেয়ে বড় হয়ে উঠছিল। তার শৈশব শেষ হল, সে কিশোরী হয়ে উঠল; কিশোরকালও ফুরিয়ে এল...'
'কি নাম মেয়েটার?'
'কথার মধ্যে বাধা দিও না। আমার এ-গল্পে মেয়েটির নাম খুব দরকারী

নয়। যা বলছিলাম, কিশোরী মেয়েটিও বড় হয়ে উঠল দিনে দিনে। সে এখন যুবতী, তার শরীর মন ক্রমে একটা গড়ন পেয়েছে। যেমন করে গর্ভের শিশুরা গড়ন পায়, তরল ভাসমান প্রাণ আস্তে আস্তে আকার অবয়ব পায়, ইন্দ্রিয়ময় হয়ে ওঠে—তেমনই।…'

'এ আবার কি ধরনের গল্প? গড়ন পেয়েছে—কিসের গড়ন, কেমন তার চেহারা—'

'অশোকা, আবার তুমি আমার গল্পের মধ্যে বাধা দিচ্ছ। তোমার বুদ্ধির কষ্টিপাথরটি এ-গল্পের গায়ে ছুঁইয়ো না। আগে আমি শেষ করি—আসল-নকল বিচারটা পরেই করো।'

'খুব যেন অধৈর্য হয়ে পড়েছ।…চটছ নাকি? আচ্ছা বল, আর একটিও কথা বলব না।'

'মেয়েটির তখন দু'কূল ভরা বয়েস, হঠাৎ কি খেয়াল হল তার, একদিন শেষ রাত্রে ঘুম একটু ফিকে হয়ে আসতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। বাইরে বেরিয়ে এল। তখনও সূর্য ওঠে নি, পাখিদের ঘুম ভেঙেছে সবে, ফরসা ভাব, শুকতারা ডুবছে। মেয়েটি আনমনে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির সীমানা পেরিয়ে মাঠে এসে পড়ল। শিশির-ভেজা মাটি, সকালের গন্ধ, ঠাণ্ডা বাতাস, গাছের পাতা দোল খাচ্ছিল মৃদু মৃদু, অনেকটা দূরে ফাঁকায় একটা বাগান-ঘেরা বাড়ি, মাথাটা দেখা যাচ্ছিল আবছা।…কি খেয়াল হল, হাঁটতে শুরু করল ও।…প্রথমে তার জানা ছিল না, কোথায় যাচ্ছে—পরে বুঝল, বাড়িটার দিকেই সে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে—'

'অত সকালে একা একাই সে মাঠ ভেঙে যাচ্ছিল! বাড়িটা কি আগে সে কখনও দেখে নি?'

'তুমি একেবারে খাঁটি বাঙালী সাহিত্য-সমালোচক, যুবতী কুমারী মেয়েকে একা একা সকালে পথ হাঁটতেও দেবে না? কোথায় যাচ্ছে না জানলে তোমার স্বস্তি নেই।…কিন্তু কি করব, মেয়েটি একা একাই যাচ্ছিল—আর যে-বাড়িতে যাচ্ছিল সে-বাড়ি আগে সে দেখে নি।'

'কি ছিরি তোমার গল্পের। এতকাল মেয়েটা যে-জায়গায় মানুষ তার আশপাশের খবর জানে না! বাড়িটা আগে দেখে নি কখনও…তাই কি হয় নাকি—?'

'দোহাই তোমার, অন্তত এ-গল্পের খাতিরে হতে দাও। ধর না কেন,

মেয়েটির ওই রকমই স্বভাব ছিল। সে কখনও চারপাশে তাকায় নি, কিছু দেখে নি, সংসারের সীমানায় তাকে আগল দিয়ে রাখা হয়েছিল। আর এতে তার কোনো দুঃখকষ্ট ছিল না। সংসারের আর পাঁচজনের সঙ্গে সে সমানে খেয়েছে পরেছে হেসেছে ঘুমিয়েছে।'

'বেশ, বলো—তারপর কি হল? মেয়েটি বাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছল তো?'

'হ্যাঁ, পৌঁছল; ফটক খোলাই ছিল। একটু ইতস্তত করে সে ঢুকে পড়ল।...বাড়িটা আশ্চর্য সুন্দর; অনেক ঘর, সব ঘরেরই দরজা জানলা খোলা, হাওয়া চারপাশে লুটোপুটি খাচ্ছে, পরদাগুলো আলুথালু হয়ে উড়ছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আসবাব দিয়ে সাজানো ঘর, কেউ যেন ধূপ জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিল ঘরে ঘরে—মিষ্টি আচ্ছন্ন গন্ধ, সমস্ত বাড়িখানা নিশ্চুপ স্তব্ধ। বাড়িটির প্রত্যেকটি ইঁট কাঠ আসবাব জীবন্ত, অথচ কোথাও একটু সাড়া নেই। মেয়েটি এক এক করে সব ঘর ঘুরে আবার নিচে এসে দাঁড়াল। অবাক হচ্ছিল ও, এ-বাড়িতে মানুষ নেই কেন—কোথায় গেল এরা? কার বাড়ি? কে মালিক এমন সুন্দর বাড়ির?... ভাবতে ভাবতে মেয়েটি যখন ফটকের কাছে এসেছে, হঠাৎ...'

'কি হঠাৎ?'

'হঠাৎ কে যেন তার কানের পাশে ফিসফিস করে বলল, "চলে যাচ্ছ! এ-বাড়িটা যে তোমারই...", নিশ্বাসের মতন একটু অদ্ভুত হাসি ছিল সেই স্বরের মধ্যে। মেয়েটি চমকে উঠল। তাকাল আশেপাশে, কাউকে দেখতে পেল না।...ফটক ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে এল ও। অন্যমনস্ক। সূর্য উঠে গেছে। তন্ময় হয়ে পথ হাঁটছিল মেয়েটি। নিজেদের বাড়ির কাছে এসে পড়ল। এবার একবার দাঁড়াল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছু ফিরে চাইল। সেই আশ্চর্য সুন্দর বাড়ি রোদের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও সেই বাড়ি আর খুঁজে পেল না।... কিন্তু...'

'কি কিন্তু?'

'কিন্তু কি আশ্চর্য, যে-বাড়িতে এতকাল সে কাটিয়েছে, সেই বাড়িও তার নিজের মনে হল না।'

'তবে?'

'তবে আর কি! পুরনো বাড়িতে পা দিয়ে মেয়েটি ভাবল তার একটা

আলাদা, সুন্দর অদ্ভুত বাড়ি আছে, শীঘ্রি একদিন সে তার নতুন বাড়িতে চলে যাবে।'

'তারপর—?'

'তারপর আর কি, নতুনের আনন্দে নিজের করে পাওয়ার সুখে তার কাছে পুরনো বাড়ির মানুষগুলোর চেহারা বদলে গেল। মামার দুর্ব্যবহার ক্ষমা করে মামার ভালবাসাকে সে আবিষ্কার করল, মা-র খাদটুকু পুড়িয়ে মাকে সে সোনা করল···। সেই মেয়ের চোখে রোজকার গোধূলি নতুন হয়ে দেখা দিল, বিশ্ব তার কাছে এত আপন হয়ে উঠল যে, বেচারীর মাছ কি পাখি হতেও ইচ্ছে করছিল···। ও কি, অশোকা,···তুমি কাঁদছ ?'

'চোখে জল আসছে, কেমন একটা কান্না পাচ্ছে···। এ-গল্প যেন কেমন—।'

'এ-গল্প বীজ থেকে গাছ হওয়ার। যতদিন বীজ মাটির মধ্যে ছিল কেউ দেখে নি, বীজ যখন গাছ হয়ে মাটির ওপর মাথা ঠেলে দাঁড়াল তখন সে অন্য প্রাণ। তার নতুন করে জন্ম হয়েছে।'

'আমার একারই কি এই নতুন জন্ম ?'

'আমি ঠিক জানি না। বোধ হয় সব মানুষেরই হয়।'

মনোহর তেলির দোঁহার প্রথম কলিটিতেই যদি গান শেষ হত, কথা ফুরত! কিন্তু তা ফুরোয় নি। গাছ হওয়ার পরও কথা ছিল : 'আজ গাছ হয়ে মাথা তুলেছি, গরু ছাগল আমায় মুড়িয়ে খেতে আসছে, ছেলেরা পাতা ছিঁড়ে পরখ করছে আমি বিষ না মধু, বড়রা দেখছে ভবিষ্যতে আমার গা থেকে ক' মন কাঠ হবে বিক্রির।'

'অশোকা!'

'ইস্, এমন করে ডাকলে—আমি চমকে উঠেছি। কী শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছ হাত!'

'কিছু না, চলো—ফিরি। আর ভাল লাগছে না।'

আমি অনেককে বলতে শুনেছি, কোনো এক সুন্দর দয়াময় পুরুষ এ জগৎ-সংসার সৃষ্টি করেছেন। অশোকাও বলত, ভগবানের হাতের নিখুঁত কাজ ছাড়া এমন কি হয়! আমি জানি না, আমি কখনও কোনো দয়াময় পুরুষের কথা ভাবি নি। বরং আমি অন্য কথা বহুবার ভেবেছি। যার কথা আমি

ভাবতাম জটিল জন্মসূত্রে আমি তার সঙ্গে জড়িত।...মাঝে মাঝে আজও আমি খুব অবাক হয়ে ভাবি, মানুষ কেন মনে করে না, অনাচারী কলুষ নিষ্ঠুর এক হীন ষড়যন্ত্র থেকে এই জগৎ-সংসারের জন্ম হয়েছে। আমরা পাপ থেকে জাত। আমাদের আদি এবং অন্তে এই পাপ ছাড়া আর কি আছে? ক্ষয়, মৃত্যু, আশাভঙ্গ, ব্যর্থতা, শোক—বংশপরম্পরায় পাপ আরও যে কত শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত। সহস্র পুত্রের পিতা এই আদি পুরুষ।...স্বেচ্ছায় কিনা জানি না, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম আমি আমার পুরুষানুক্রম রক্তের ঋণ শোধ করছিলাম।...অশোকাকে আমি দূষিত করছিলাম দিনে দিনে। ও আমায় পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করত, তার ধারণা ছিল এ-সংসারে আমি তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, ভাবত আমার ভালবাসা তার ভালবাসার মত নিখাদ।...আমার মনে পড়ছে না, কখনও কোনো কারণে ও আমায় সন্দেহ করেছে। অবশ্য করার মত কারণ রাখি নি। জন্মগত কিংবা বলা যায় বংশগতভাবে, আমরা আমাদের ছলাকলা ভাল করেই জানতাম। কখনও কখনও এই ছলাকলা নিজের কাছেই সত্য বলে মনে হত। মনে হত, আর ভয় হত।

'অশোকা?'

'কি?'

'কাল তুমি চলে যাবার পর আমার কি মনে হচ্ছিল জানো?'

'তোমার তো রোজই ওই এক কথা। আমি সব বুঝি মশাই।'

'বিশ্বাস না করলে আর কি করব বলো...।'

'ইস...মুখ যে অমনি মেঘলা হয়ে উঠল। একটুতেই এত লাগে তোমার। উহু, মেয়েদের মতন অত অভিমানী হলে পুরুষ মানুষদের চলে না।... কই দেখি, মুখটা তোল; তাকাও না আমার দিকে—তাকাও—। বাব্বা...আচ্ছা এই নাও...জরিমানা দিলাম।'

'এমনি করে তুমি আমায় আর কত কাল ভুলিয়ে রাখবে?'

'ছি, ও-কথা বলো না।...তোমাকে ভুলিয়ে রাখা আমার কাজ নয়; ও-সবে আমার বরাবরের ঘেন্না।'

'কিন্তু আমার যে আর ভাল লাগে না। যতক্ষণ তুমি থাক...বেশ থাকি —তুমি চলে গেলে আর যেন আগ্রহ পাই না।'

'মা বলছিল, চাকরি ছেড়ে দে। ছেড়ে দিতাম। মামার জন্যে পারি না।

মামী মারা যাবার পর মামা কেমন হয়ে গেছে দেখেছ। বাচ্চুকেও ওই একই রোগে ধরেছে। আমি চাকরি ছাড়লে সংসারই চলবে না—তো বাচ্চুর খরচ।'

'ও, ভাল কথা, তোমার জন্যে পঞ্চাশটা টাকা রেখেছি ওই ড্রয়ারের মধ্যে, যাবার সময় নিয়ে যেয়ো।'

'কত আর দেবে তুমি এ-ভাবে, আর দিও না।'

'কেন?'

'নাঃ, ভাল লাগে না।'

'আমি কি রাস্তার মানুষকে দাতব্য করছি?'

'করছ। আমার জন্যে হলে নিতে বাধত না; কিন্তু এ-টাকা যে আমার মা, মামা, বাচ্চুরাও খায়। ব্যাপারটা কেমন বেচাকেনার মতন নয় কি? ওরা এর পর তোমার কেনা হয়ে যাবে। এখনই তো ওরা…'

'আ, যেতে দাও ও-সব কথা। বাজে যত…।'

আসলে এগুলোই আমার কাজের। অশোকাদের সমস্ত পরিবারকে আমি জড়াচ্ছিলাম। চার পাশ থেকে ওদের আটকে ফেলা। বাস্তবিকই আমি কিনে নিচ্ছিলাম। আমাদের কোনো এক পূর্বপুরুষ মোহরের থলি মুঠোয় করে গাধার পিঠে চড়ে দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের আত্মা কিনতে বেরিয়েছিলেন। শুনেছি প্রায় সব আত্মাই তিনি কিনে নিতে পেরেছিলেন। আমরা জানি মানুষের শরীরের মাংস কিনতে নেই—তার আত্মাকেই কিনে নিতে হয়। সেটাই একমাত্র খরিদ।

'তোমার যে জ্বর হয়েছে দেখছি।'

'তেমন কিছু না, কাল একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। তুমি বরং অশোকা…'

'না লাগাই আশ্চর্য! কি দরকার ছিল তোমার রাস্তার মাঝখানে গায়ের শালটা আমায় দাতব্য করার?'

'তোমার যে শীত করছিল। তা ছাড়া তোমার গায়ে আমি যে জড়িয়ে থাকব চাদর হয়ে—এও কি কম সুখ!…'

'রসিকতা রাখো। ভাল লাগে না এ-সব আমার।'

'আমার কোন্‌টা যে তোমার ভাল লাগে অশোকা—আমি বুঝতেই পারি না।'

'থাক, বুঝতে হবে না। দুর ছাই—আমি আবার সঙ্গে করে শালটা আনলাম না আজ।'

'ভালই করেছ। ওটা তোমার গায়ে থাক।'

'পরের কথা পরে, এখন আমি কি দিয়ে তোমায় ঢাকা দি।'

'…বলব ?'

'বলো।'

'তুমি নিজেকে দিয়েই…'

'যাঃ—অসভ্য।'

সভ্যতাকে আমরা চিনি। বহু বছর ধরে এই সভ্যতাকে দেখে আসছি আমরা। পৃথিবী যখন অসভ্য ছিল, আমরা কম শিকার পেতাম। সভ্যতা যত বাড়ছে আমাদের শিকার সুলভ হচ্ছে।…অশোকার মা যেচে আমার বাড়িতে এসেছিলেন। মেয়ের জন্যে দুর্ভাবনার অন্ত নেই। বলেছিলেন বিয়েটা তুমি করে ফেল, বুঝলে! নয়তো ও-মেয়েও আর বাঁচবে না। ওর মামা মরছে মরুক, বাচ্চু মরবে—মরুক গে—অশোকাকে তুমি বাঁচাও। সংসারের ঘানি টেনে আর দু'দুটো যক্ষ্মা রুগীর পাশে পাশে থেকে ওটাও মরবে নাকি! কিসের দায় তার।…বিয়ের পর অশোকা এ-বাড়ি চলে এলে আমি বাঁচি। কি ভয়ে ভয়ে যে এখন আছি, বাবা!…অশোকা চলে এলে তার মা-ও আসবেন। ও-বাড়িতে বাঁচা যায় না।

'ব্যাপার কি, কাল যে এলে না।'

'পারলাম না।'

'কেন, আটকাল কোথায় ?'

'স্কুলের সেক্রেটারির বাড়িতে ডাক পড়েছিল।'

'হঠাৎ—'

'হঠাৎ নয়—, পড়ব-পড়ব করছিল। আমার নামে খুব লোকনিন্দে রটেছে। আমি নাকি খারাপ চরিত্রের মেয়ে…'

'তোমার মুখের ওপর এইসব কথা বলল লোকটা ?'

'বলল। অনেক বয়েস হয়েছে কিনা—বাপের বয়সী—কাজেই মুখে কিছু আটকাল না।'

'আশ্চর্য—! তা তুমি কি বললে ?'

'স্বীকার করে নিলুম। বললুম, যে-ভদ্রলোকের বাড়িতে আমি রোজ যাই, তিনি আমার স্বামী। বিয়ে হয় নি, হবে শীঘ্রি। সংসারে আমার পোষ্য তিনজন, তার মধ্যে দু'জন খুব খারাপ অসুখে ভুগছে। আমি ছাড়া তাদের গতি নেই। এক দায়িত্ব এড়িয়ে অন্য দায়িত্ব কি করে কাঁধে নি। বিয়েটা তাই পিছিয়ে যাচ্ছে।'

'এত কথা ওকে বলার কি দরকার ছিল।'

'অবস্থাটা যাতে বোঝেন ভদ্রলোক।'

'বুঝলেন?'

'না।'

'তবে?'

'চাকরিটা বোধ হয় গেল।'

মানুষের মত মূর্খ জীব আর নেই। সামান্য দূরদৃষ্টি এদের কেন যে থাকে না—প্রায়ই আমি ভাবি। ফাঁদে পড়ার পরও যারা অনর্থক ছুটোছুটি করে, ফাঁদ কেটে পালাতে চায়—তারা শেষ পর্যন্ত কি পায়! কিছুই নয়। শুধুমাত্র নিজেকে আরও অস্থির, ক্লান্ত, বিক্ষত করা ছাড়া তাদের কোনো লাভ হয় না। তবু এই মূর্খরা আমাদের সুন্দর করে পাতা শক্ত জাল ছিঁড়ে পালাবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। অশোকাকে দেখছিলাম মরিয়া হয়ে লড়ছে।

'বসন্তর টিকে দিয়ে বেড়ানো ঠিকে কাজটাও ফুরলো।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, পরশু থেকেই শেষ।'

'তবে—'

'তবে আর কি—দেখি! শ্রীপতি দর্জির সঙ্গে কথা হচ্ছিল; সেলাইয়ের কিছু কাজ দিতে পারে—'

'ক' টাকা হবে তাতে তোমার?'

'যতটা হয়—তারপর তো তুমি আছ।'

হ্যাঁ, আমি ছিলাম এবং থাকব। অশোকার জন্যে আমায় আরও কিছু সময় থাকতে হবে। শুনেছি, আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে লেখা আছে মানুষকে যখন অন্ধ করতে হয়—তখন এক চোখ নয়, দু'চোখই কানা করে দিতে হয়। অল্প

পাপীদের কাছে বিবেকের টান ভয়ঙ্কর। পুরো পাপীরা নিশ্চিন্ত। তাদের দু'চোখই কানা।

'শ্রীপতির চালচলন খুব খারাপ।'

'মদ-ফদ খায় শুনেছি।'

'কাল রাত্তির ন'টার পর আমাদের বাসায় গেছে আমার পাওনা টাকা দিতে। ভরভর করছে মদের গন্ধ। পাঁচটা টাকা বেশি দিয়েই, এমন মাতলামি শুরু করল! পাজি লোক একটা—!'

'শয়তান।'

'আমারও তাই মনে হল।...ওর কাজ-টাজ আর আমি করে দেব না। কত আর নীচে নামা যায় বল।'

'আমারও এ-সব পছন্দ নয়, অশোকা। দর্জি মুচি ঝি...কত আর নামবে তুমি!'

বঁড়শিতে গাঁথা মাছ একটাকে ডাঙায় তোলার মধ্যে মজা নেই। পৃথিবীতে আমাদের জন্যে কিছু মজা থাকা দরকার। লখিন্দরকে বিয়ের আগেও আমরা দংশন করতে পারতাম। তবু বাসর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। কেন? মজার জন্যে। বেহুলাকে স্বামীর পাশে ঘুমুতে না দিলে মজা জমত না। এক পা আগে পরে নিয়েই তো নিয়তির খেলা।

'সুরেশবাবুর স্ত্রী কি বললেন, জান?'

'কি?'

'ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানিয়ে দিলেন, আমাকে আর রাখবেন না।'

'কেন?'

'আমাদের বাড়িতে যে-রোগ সেটা বড় ছোঁয়াচে। আমার শাড়ি জামা হাঁচি কাশির সঙ্গে নাকি রোগটা তাঁর বাড়িতে ছড়াতে পারে।...ওঁর ছোট মেয়েটা—ডলি ক'দিন ধরে খুব কাশছে।'

'—অশোকা—?'

'বলো।'

'এ-ভাবে আর কতদিন চালাবে?'

'আর নয়।...এখন তাই ভাবি। মামা কাল আমার হাত জড়িয়ে ধরে

যখন কাঁদছিল তখনই বুঝতে পেরেছি, এ-ভাবে আর চলবে না। বাচ্চুটা ক'দিন থেকে আর কথা বলতেই পারছে না, এত দুর্বল। মা তো প্রায়ই কল্যাণকাকাকে চিঠি লিখছে আজকাল। মাঝে মাঝে টাকা আসতে দেখি মার নামে।'

'উপায় কি অশোকা—!'

'না, উপায় আর নেই। সবই বুঝতে পারি।···আগে এতটা হবে আমি ভাবি নি। একসময়ে কল্যাণকাকা মার লুকনো জিনিস ছিল, আমিই টেনে বের করলাম। এখন আর মা-র লজ্জা নেই। মামী মারা গেল, মামাকে প্রায় সর্বস্বান্ত দেখাচ্ছিল, রোগের সেবা করে করে অসম্ভব ক্লান্ত রুগ্ন—মামাকে সে-সময় সংসার টানার ভার থেকে একটু আরাম দিতে চেয়েছিলাম—মামা বরাবরের মতন ভার ছেড়ে দিল।···বাচ্চু···না, তার আর দোষ কিসের?···এমন করে চার পাশ থেকে আমি জড়িয়ে পড়ব ভাবি নি। আমার কপাল··· ।'

অশোকা এতদিন পরে কপালের কথা ভাবছে। আমি অবাক হয়ে ভাবি, ও কেন আমাদের কথা ভাবে না—আমরা যারা কপাল তৈরি করেছি। জীবনের ব্যর্থতাকে আমরা তাসের মত ভেঁজেভুজে ছড়িয়ে দি। মানুষ চিরকাল ভাবে যে, বাজি-মাতের গোলাম টেক্কা টানছে, কিন্তু আসলে তারা খেলা-হারের ফক্কা তাস টেনে নিচ্ছে। আমাদের এই জাদুর খেলা ওরা যদি বুঝত।···

'মৃণালকে তুমি চেন, অশোকা?'

'নতুন যে ডাক্তার হয়ে এসেছে এখানে, ডিসপেনসারী খুলেছে?'

'হ্যাঁ, আমার জানাশুনো। ওর সঙ্গে দেখা করো। খুব দেরি করো না যেন, আজকালের মধ্যেই যেও।'

'হঠাৎ তার কাছে পাঠাচ্ছ যে—?'

'ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। হয়তো তোমার কোনো উপকারে আসতে পারে।'

'চাকরি জুটিয়ে দেবে?'

'তাও দিতে পারে।···হাসছ যে?'

'এমনি। কিছু না।···যাকগে, তোমার ডাক্তার বন্ধু চাকরি জুটিয়ে না দিলেও ওষুধপত্রটা অন্তত ধারে দিতে পারবে। ফণি ডাক্তার তো আমায়

দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। দোষ কি তার—প্রায় আশি টাকা পায় এখনও।'

'আমায় তো বল নি।'

'না, আর কত বলব।

অশোকাকে শেষ কথাটা বলতে আসতে হবে জানতাম। আমার ছকের মধ্যে সে অনেক দিন হল বাঁধা পড়ে গেছে। এই নিষ্ঠুর গোলকধাঁধায় সে ঘুরবে আর ঘুরবে, প্রতিবার তার মনে হবে এবার বাইরে যাওয়ার পথ একটা পেয়েছে। অথচ প্রতিবারই শেষ পর্যন্ত ছুটে গিয়ে দেখবে তার পথ বন্ধ। আবার ফিরবে, আবার ঘুরবে, আবার ছুটে যাবে, ফিরে আসবে আবার। অশোকাও এল।

'এই যে, এসো অশোকা—, অনেক দিন পরে…'

'—অ-নে-ক দিন। সত্যি আজকাল আর পারি না। সারাদিন দুপুর রাত…'

'রাতেও থাকতে হয় ?'

'না। তবে আটটা ন'টা পর্যন্ত তো বটেই, যতক্ষণ বাচ্চাগুলো না ঘুমোয়।'

'মৃণাল ডাক্তার তোমায় খুবই বেঁধে ফেলেছে তা হলে।'

'হ্যাঁ। তোমার বন্ধুর বাড়িতে থাকতে এবার আমার ভয় হচ্ছে।'

'কেন, দুর্ব্যবহার করছে নাকি কিছু ?'

'দুর্ব্যবহার! না, দুর্ব্যবহার আর কি…রান্নাঘর থেকে একদিন শোওয়ার ঘর পর্যন্ত হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল।'

'ছি ছি অশোকা, কি যা-তা বলছ! মৃণালের দু'টি ছেলেমেয়ে আছে।'

'বউ তো নেই।'

'তাতে তোমার কি এল গেল।'

'আমার কিছু আসছে—কিছু যাচ্ছে। মাইনে যখন দেন ভদ্রলোক আমার হাত বাড়াতে ভয় হয় না, কিন্তু তার ওপরও যখন কিছু দেন ভয় হয়। তুমি ছাড়া ওটা আর কারুর কাছ থেকে নিতে চাই নি। অথচ এখন আমার হাত আমাতে নেই। অন্য কারুর হয়ে গেছে। শোনো, আমি অনেক ভেবেছি। আর আমি পারছি না। মা যেখানে খুশি চলে যাক, বাচ্চুটা মরবেই, মামা হাসপাতালের দরজায় গিয়ে ধরনা দিক। আমি কিছু

জানি না।...এবারে নিজের জন্যে একটু স্বস্তি শান্তি আমার দরকার।...
এখন বলো, কবে আমি আসব ?'

অশোকার দিকে পুরো, ভরা-চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, যা চেয়েছিলাম অবিকল তেমনটি হয়েছে সে। ঘা খাওয়া, মার খাওয়া, ক্লান্ত, ব্যর্থ, অবিশ্বাসী, ভীরু স্বার্থপর সেই মানুষ। হেরে গিয়েছে অশোকা। তার চোখে করুণ আবেদন ভিক্ষুকের সেই দাও-দাও হাত বাড়ান। কী আশ্চর্য, অশোকার বয়স কত বেড়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোনো মাধুর্য নেই কোথাও, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, শুষ্ক, অসুস্থ। অতি কষ্টে যেন প্রাণান্ত পরিশ্রম করে বুকের মধ্যে একটি নিশ্বাস নিচ্ছে এবং ফুসফুসটাকে কোনো রকমে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছে। অশোকার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছিল, হয়তো অন্তরে হাহাকার করে উঠতে চাইছিলাম, কিন্তু আমার সাধ্য ছিল না পিতৃপুরুষের সঙ্গে শঠতা করি। অশোকার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে বললাম, 'এখন এ-সব কথা না তোলাই ভাল অশোকা, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তোমায় রোগে ধরেছে, বুড়োটে হয়ে গেছ তুমি। আয়নায় একবার নিজেকে দেখ, আমি বাড়িয়ে বলছি না।' অশোকা বিশ্বাস করল না। সে আমায় ভালবাসে, এবং বিশ্বাস করে আমি তাকে ভালবাসি। আমার সততা সহানুভূতি একনিষ্ঠতায় তার তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। সে অবিশ্বাসের হাসি হাসল। দমকা হাসি। উড়িয়ে দেওয়া হাসি। কিন্তু অশোকা আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে একসময় বুঝতে পারল, বিশ্বাস করল। তার ফস্ করে জ্বলে ওঠা হাসির বারুদ ফুরলো। তারপর দুর্বল ম্লান হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ম্লানতর হল। শেষে নিভে গেল। পোড়া কাঠির মতন পুড়ে গেল অশোকা।

মনোহর তেলির দোঁহার গানটি আমার কানে ভাসছিল। অন্ধকার হয়ে গেছে। কুয়াশা ঘন হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। অশোকা হারিয়ে গেল।

সুধাময়

অ ঙ্গ পা লি

রমাপদ চৌধুরী

মাস আষ্টেকের একটি ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো সবিতা। ফিরে আসতে হলো। এক যুগ পরে। হিসেবে হয়তো বেশি দিন নয়, দেড় বছর কি আরো কম সময়। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময়টুকুর মধ্যেই ঘটে গেল কত পরিবর্তন।

কালো আকাশের অন্ধকার চিরে হঠাৎ একদিন আগুন জ্বলে উঠেছিল দিকে দিকে। আর চীৎকার। রক্তপায়ীদের কোলাহল আর অসহায় মানুষের আর্তনাদ ভেসে উঠেছিল আকাশে বাতাসে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সবিতার। হঠাৎ-জাগা চোখে ভয় নেমেছিল ওর। বাবা মা ভাই বোন সকলের মুখের ওপর দেখতে পেয়েছিল ও শঙ্কিত বিস্ময়ের ছাপ! ধোয়া চাদরের মতো ফ্যাকাশে মুখে অপেক্ষা করেছিল ওরা। অপেক্ষা, অপেক্ষা। তারপর। পশুর মতো চোখে আর প্রেতের মতো শরীর নিয়ে এগিয়ে এসেছিল তারা। সেই ছায়া-কালো-কালো মানুষগুলো। বাইরে শুধু অন্ধকার আর কালির বৃষ্টি, কিন্তু বৃষ্টির রিমঝিম রিমঝিম ছাপিয়ে ভেসে আসছিল ক্রুদ্ধ জনতার ম'দো রক্তের চীৎকার। ওরা এগিয়ে এলো। কারো হাতে মশাল, কেউ বা কৃপাণপাণি। তারপরও কি যেন ঘটেছিল। ভাল করে মনেও পড়ে না সবিতার! হয়তো বা চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল ও। বোবা আর বোকা চোখ চেয়ে অসহায় দৃষ্টি মেলে দেখছিল। রক্ত আর রক্ত।

বাবা, মা, ভাই, বোন। কতদিন, কত কর্মহীন বিষণ্ণ দুপুর কাটিয়েছে ও ভেবে ভেবে, কত-না নিঘুম রাত! তারা কি বেঁচে আছে? সবিতার জীবন থেকে অন্তত মুছে গেছে তারা। কে জানে, ওকে বাদ দিয়েই হয়তো নানা রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে ওদের সংসার। বংশের সাদা ফুটফুটে পাখনাটার ওপর যে কালির চিহ্ন পড়েছিল সেটুকু মুছে ফেলে আবার হয়তো সংসার গড়ে তুলেছে ওরা। সবিতাকে ভুলে গেছে। সবিতাও ভুলতে চেষ্টা করেছিল। ওদের। কি হবে মিথ্যে দুঃখ করে। ব্যর্থ অনুশোচনায়। হঠাৎ একদিন ও আবিষ্কার করলে, মাতৃত্বের স্নিগ্ধাবেশে ওর দেহ ভরে উঠেছে। চোখে মধুময় ক্লান্তি। অবাঞ্ছিত, অযাচিত হতে পারে। স্নেহ আর ভালবাসা নয়, ঘৃণা আর

বিদ্বেষের বিনিময়ে পাওয়া সন্তান। তবু। সব অপরাধ যেন ক্ষমা পেল সবিতার কাছে। ওর আপন দেহের রক্তমাংসে-গড়া সন্তানকে বুকের দুধ দিয়ে বড় করে তোলবার চেষ্টা করলে ও, স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো।

এমন সময় ডাক এসে পৌছলো। পুলিসের সাহায্যে কারা যেন উদ্ধার করলো ওকে।

তারপর।

আট মাসের শিশুটিকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো সবিতা।

ক্লান্ত বিষণ্ণ দেহ নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সবিতা। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। পাথরের মূর্তির মতো।

ধুলো উড়িয়ে ঝড়ের মতো সশব্দে চলে গেল পুলিসের গাড়িখানা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একবার চোখ তুলে তাকালো ও মা-র মুখের দিকে। পরক্ষণেই মাথাটা ঝুঁকে পড়লো ওর, চোখ নিবদ্ধ হলো পায়ের দিকে। মুখ তুলতেও কেমন এক অস্বস্তি।

—আয়।

ছোট্ট একটি অভ্যর্থনার ডাক। হয়তো আন্তরিক, হয়তো বা উপায়হীন। সবিতা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। আরেকবার চকিতে চোখ তুলে তাকালো। হ্যাঁ, মা-র চোখে চাপা কান্নার অশ্রু।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো মা-র শরীরের বেশবাসের দিকে তাকিয়ে। নেই ? বাবা নেই ? দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা টিপে টিপে একটু এগিয়ে গেল সবিতা।

কপাটে ঠেস দিয়ে ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে আছে ছোট বোন কবিতা। এগার বছর বয়সের মেয়ে, কিছুই চেনে না, কিছুই বোঝে না, তবু কেমন এক অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে ওর চোখে। ওর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হাসলে সবিতা।

কথা খুঁজে পাচ্ছে না ও। কি বলবে, কি-ই বা প্রশ্ন করবে ? তার চেয়ে একেবারে চুপচাপ থাকা ভাল। কথা বললেই তো পাশ থেকে একটা কথাই খোঁচা দেবে। মনে পড়বে, মনে পড়িয়ে দেবে ওর অতীতের গ্লানির দিন-গুলোকে।

মা বললে, বোস এখানে। আর নয়তো যা, কলঘর থেকে হাতমুখ ধুয়ে আয়। জিরিয়ে নে একটু। আমি জলখাবারের ব্যবস্থা করি গে।

নিজের মনেই হাসল সবিতা। উত্তর দিল না। লজ্জা আর অস্বস্তি ওর

একার নয়। মা ওর চোখের সামনে থেকে সরে যেতে চায়, সরে থাকতে চায়।

মা চলে যেতেই কবিতাকে কাছে ডাকলে ও।

মৃদু হেসে ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলো।—কেমন আছিস ?

কবিতা ঘাড় নাড়লে, অর্থাৎ ভালই।

—দাদা ?

ছোট্ট একটি কথা। কি অর্থ ওর ? যে-কোনো অর্থ ধরতে পারে কবিতা। দাদা কোথায়, দাদা কেমন আছেন ! কিংবা, দাদা আছেন কি ?

চমকে চোখ তুললে কবিতা। সবিতা বিষণ্ণ হাসি হাসলে।—ও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার প্রশ্ন করলে, বকু ? বকুও নেই ?

—ছোড়দা কলেজে গেছে।

যাক। আছে তা হলে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো সবিতা। জোর করে হাসলে, খুশিতে নেচে ওঠবার চেষ্টা করলে। মিলেমিশে যেতে হবে। ঠিক আগের দিনের মতোই। হয়তো অস্বাভাবিক মনে হবে ওর ব্যবহার, চোখে লাগবে। তবু, মাঝখানের দেয়ালটা সরিয়ে ফেলতে হবে। দূরে দূরে থাকলে দূরের মানুষ হয়ে যাবে ও। সে আরো কষ্টকর, অসহ্য।

হাসিখুশী মুখে কোলের শিশুর গাল টিপে আদর করলে সবিতা, চুমু খেলো।

হাসতে হাসতে বললে, ড্যাবড্যাব করে দেখছিস কি দুষ্টু ? চিনিস, একে চিনিস তুই ?

কবিতাও হেসে হাত বাড়ালে। ওর কোলে ছেড়ে দিলো ও ছেলেটাকে। তারপর ছেলেকে আদর করতে করতে কবিতাকে জড়িয়ে ধরলো। যেন ওর ছেলেকেই আদর করছে সবিতা। বাঁ হাতটা কবিতার কাঁধের ওপর দিয়ে গিয়ে শিশুর চুলে বিলি দিতে শুরু করলে। কবিতার পিঠের ওপর বুকের চাপ পড়লো ওর। কবিতা বুঝলো না। ছোট ছেলেপিলে দেখলেই মেতে ওঠে ও। এ তো দিদির ছেলে ! সবিতার কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছিল, খুব ইচ্ছে করছিল কবিতাকে জড়িয়ে ধরতে। বুকের কাছে টেনে আনতে চায় ও কবিতাকে। এতদিন পরে আবার আপন করে, অন্তরঙ্গভাবে ফিরে পেয়েছে ও ছোট্ট বোনটিকে ! খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে তাই।

হঠাৎ মা-র পায়ের শব্দে মুখের হাসিটা ওর থমকে গেল। চট করে ছেলেকে

কোলে তুলে নিলো ও। এত রঙ, এত রসিকতা, এত আনন্দ হয়তো মা-র চোখে দৃষ্টিকটু লাগবে।

মা এসে দাঁড়ালো একটু পরেই।

শিশুর দিকে হাত বাড়িয়ে কবিতা বললে, কি সুন্দর চোখ দুটো, দেখো মা। কেমন দুষ্টুমির হাসি দেখছো?

খুশির ছোঁয়াচ লাগলো হয়তো, মাও হাসলো।

কবিতা জিগ্যেস করলে, কত বয়স হলো দিদি এর?

সবিতা উত্তর দিলো না প্রথমবারে। মা-র সামনে ওর কেমন এক অস্বস্তি।

কবিতা আবার প্রশ্ন করলে।

উত্তর এলো, শুকনো উত্তর।—আট মাস।

—ও মা। মাত্র আট মাস! কি ভারী বাবা, কোলে রাখা যায় না। কেমন নাদুসনুদুসটি হয়েছে, না মা? আমি ভেবেছিলাম এক বছর দেড় বছর হবে।

মা বা দিদির কাছ থেকে কোনো কথা যে শুনতে পেল না ও, কবিতার সেদিকে লক্ষ্যই নেই। ও কথার পর কথা বলে চলেছে।

—কি নাম রেখেছো দিদি?

—নাম নেই। শুকনো গলায় উত্তর দিলো সবিতা।

অর্থাৎ নাম যেটা আছে, সেটা বলা চলে না।

কবিতা এদিকে বিস্ময়ে চোখ গোল করলে, নাম দাও নি এখনো? কেমন হাসিখুশি দেখছো মা। আচ্ছা, কি নাম দেবে বল তো? হয়েছে, ও-বাড়ির বৌদি নাম দিয়েছে হাসি, এর নাম দেবো খুশি। খিলখিল করে হেসে উঠলো কবিতা।

তারপর শিশুর দিকে তাকিয়ে বললে, হাসির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো বুঝলে খুশি? রঙ টুকটুকে দেখতে। কাল আনবো, দেখো।

সবিতা গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করছিল। তবু পারলে না। ক্রমে ক্রমে একটা হাসি ফুটে উঠছিল ওর চোখে।

মা বললে, যা সবি, হাত-মুখ ধুয়ে আয়।

কবিতা হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বলল, কেমন দিদিমা বাপু তুমি, নাতিকে কোলে নিলে না সেই থেকে!

মা হেসে হাত বাড়ালো।

কলঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল সবিতা। দোরের আড়াল থেকে ফিরে তাকিয়ে দেখলে, মা কোলে নিলো ওকে।

সবিতার বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল। ঘুঙুরের বোল ফুটলো বুকের মধ্যে।

স্নান সেরে এসে সবিতা দেখলে খুশি তখনো মা-র কোলে। কবিতা কাড়াকাড়ি করছে, কিন্তু না, মা কিছুতেই দেবে না।

ঠোঁট টিপে টিপে হাসলে সবিতা। চোখ ভরে, প্রাণ ভরে দেখলে।

মাকে ওর ভয় ছিল। মা-র শুচিবাই ওর অজানা নয়। তাই আশঙ্কা ছিল। পুলিস যখন ওকে উদ্ধার করতে যায়, হাত-পা ধরে অনুনয় করেছিল ও। বলেছিল, আমি তো বেশ সুখেই আছি, ফিরে যেতে চাই না। আর, আর ফিরে গেলেই বা মা-বাবা আমাকে ফিরে নেবেন কেন? আমার জাত নেই, ধর্ম নেই। আমি তাঁদের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে গেছি।

ওরা শোনে নি। আইন—আইনের দোহাই পেড়েছিল। মা-বাবা গ্রহণ না করলেও, অনাথ আশ্রম আছে সে ভরসা দেখিয়েছিল।

সে কথা ভেবে সবিতার হঠাৎ মনে হলো মাকে সে চিনতো না। আজই প্রথম চিনলো যেন।

মানুষ কত বদলে যায়। সবিতা ভাবলে। মনে পড়লো ছোটবেলার কথা। ইস্কুল থেকে ফিরে কাপড় না ছাড়লে মাকে ছুঁতে পেত না ও, ঘরের জিনিসপত্তরে হাত দিতে পেত না।

সবিতা এবার মুখ খুললো।—একটু চা করে দিবি কবি?

মা ফিরে তাকালো।—বোস্, খাবার নিয়ে আসছি।

মা চলে গেল খাবার আনতে।

বিকেলের রোদ কমে এসেছে তখন। রাতের ছায়া নামছে ধীরে ধীরে। বই বগলে বকু ফিরে এলো।—দিদি, তুই?

—হঁ্যা, আমি। সবিতা হাসলে। বললে, ভূত ভেবেছিলি বুঝি?

বকুও হাসলো। বললে, আমরা ভেবেছিলাম, তুই মরে গেছিস।

—তা হলেই ভাল হত, না?

—দূর। মরে কোনো আরাম নেই।

সবিতা হেসে বললে, পড়াশুনা করছিস আজকাল, না আগের মতোই?

বকু উত্তর দিলে, এ তো আর ইস্কুল নয়। কলেজে ভরতি হয়েছি। না পড়লে চলে?

—তাই বুঝি? সবিতা হাসলে।

কবিতা ফোড়ন কাটলে, পড়ে না ছাই। শান্তদার সঙ্গে আড্ডা দেয় দিনরাত।

—দিই তো দিই। কবিতাকে ভেংচি কেটে বই রাখতে গেল বকু।

আর জলযোগ সেরে বারান্দার ডেকচেয়ারটাতেই শুয়ে পড়লো সবিতা। সারাদিনের ক্লান্তি আর অবসাদে সারা শরীর টনটন করছে। তাছাড়া ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলে সবিতা। চোখ বুঁজে পড়ে থাকতে থাকতে ঘুমে ঢলে পড়লো।

সন্ধ্যা নামলো। বাতাস থামলো। তারাজ্বলা অন্ধকারের আকাশে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো চাঁদ। কৃষ্ণচূড়ার ডালপালার ফাঁকে কোথায় একটা কাক বসে পাখা ঝটপট করছে। চিঁচিঁ শব্দ তুলে কয়েকটা চামচিকে উড়ে গেল।

সবিতা শুনতে পেল না। দেখতে পেল না। ঘুমের ঘোরে ওর মাথাটা কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে।

বার কয়েক এসে ফিরে গেল কবিতা আর বকু। বসে বসে গল্প করবার সাধ ওদের। অনেক অনেক কথা শোনবার আছে। বলবার আছে। দেড়টা বছর যেন একটা যুগ। কত কি ঘটে গেল, কত কি বদলে গেল। সেসব কি শুনবে না ওরা, বলবে না ? কিন্তু। না, শ্রান্ত দেহমন সবিতার। ঘুমুক ও। ঘুম ভাঙাবে না ওরা। ঘুম তো ভাঙবেই, নিজের থেকেই জেগে উঠবে একসময়।

কি একটা শব্দে চোখ খুললে সবিতা। উঠে বসলো।

রাত ঘন হয়ে এসেছে। নির্জন নিশ্চুপ রাত। সামনের রাস্তাটার দিকে তাকালে সবিতা। দূরের আর অদূরের বাড়িগুলোর দিকে। আকাশের দিকে।

চাঁদের গায়ে কুয়াশার মতো স্বচ্ছ মেঘের ওড়না। নীচের রাস্তাটা চকচকে ইস্পাতের মতো পড়ে আছে নির্জন। এবাড়ি-ওবাড়ির দু-একটা জানালায় এখনো আলো জ্বলছে।

উঠে দাঁড়ালো সবিতা। গলাটা শুকিয়ে গেছে।

ও নিজেই কি গিয়ে জল গড়িয়ে নেবে ? না, কবিতাকে ডাকবে ?

হালকা পায়ে একটু পায়চারি করলে সবিতা। বারান্দাতেই খুশি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। বুকটা শিরশির করছে যেন। দুধ খাওয়ানো হয় নি খুশিকে। নাকি, বোতলের দুধ খাইয়েছে ওরা।

ঘরগুলো অন্ধকার। ভেতরের উঠোনে একফালি আলো।

আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতর পা বাড়ালে ও।

খানিকটা এসেই থমকে দাঁড়ালো। অন্ধকারে কপাটের আড়ালে।

ভিজে কাপড়ে মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর বকু।

বকু বললে, এমনি অসুখ তোমার, আবার এত রাতে চান করলে ?

মা লজ্জিত হয়ে বললে, কি করবো বল্। সারাটা দিন ছেলেটাকে নিয়ে মাখামাখি করলাম।

—করলেই বা। অবোধ্য অভিমান বকুর গলায়।

মা মুখে বললে, কোলে করে মানুষ করছে বলে তো আর আমাদের ছেলে নয় বাপু।

পিয়াপসন্দ্

আর একটি মানুষ

সমরেশ বসু

. . . .

ও এখন সাজছে। ও একটু সিনেমায় যাবে। যদিও আজ রবিবার এবং সকাল বেলা থেকেই সবাই রোজগারের ফিকিরে ঘুরতে যাবে। তবু, তার পরেও সারাদিন হাতে থাকবে। বেলা দশটার এ শো'টা ও দেখে আসবে। কারণ রাত্রে ওর অসুবিধা হয়। নানান রকমের অসুবিধা। শোবার জায়গায় এসে অন্য কেউ হয়ত শুয়ে থাকবে। জায়গা দখলের চেয়েও, ওর সঙ্গে শোবার মতলবেই আগে এসে শুয়ে প'ড়ে থাকার ভান করে। তা' ছাড়া যতই বেলা গড়িয়ে সন্ধেয় যায়, ততই রাস্তার মানুষ গাড়ি ঘোড়া, সব যেন কেমন বেসামাল হয়ে পড়তে থাকে। ওকে লক্ষ্য করে না। প্রায় চাপা দিতে আসে। লোকেরা মাড়িয়ে দেয়।

আর তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। অন্ধকারে ওকে চোখে না পড়ারই কথা। আর অন্ধকারেও যাদের অব্যর্থ নজর ওর দিকে পড়ে, তারা ওর গায়ে হাত দেয়। বেড়ালের মত, চোখ-পিট্‌পিট, কান-নাড়ানো সেই সব মানুষেরা, পাতের থেকে মাছ ছোঁ মেরে তুলে নেওয়ার ভঙ্গিতে, মুহূর্তে নখ শানিত ক'রে ওর বুকে থাবার ঝাপটা মেরে যায়।

ছুটি সে হাতে গলিয়ে নিল। কারণ, হাতের ভর দিয়েই সে চলে হেঁচড়ে হেঁচড়ে। প্রস্তুত সে, প্রায় মহারানীর মত বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে দেখল তিন-জনকে। আবার বলল, আ ম'লো, এ মুখপোড়া তিনটে সরে না কেন ? সরবি তোরা, বেরুতে দিবি আমাকে একটু ?

গায়ক বলল, আর তা' পরে দুফুরে যখন তোর খিদে পাবে, খেতে দেবে কে শুনি ?

ল্যাটপেটে বলল, ক'টা ভাতার আছে তোর, শুনি ? রগুড়ে বলল, ওটি কম না বাবা। হাজার হাজার আছে। তা সে খেতে দিক আর না দিক।

বেঙি এবার আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল, মরারা নিজের ভাবনা ভাবগে যা। আমার ভাতারের চিন্তা তোদের করতে হবে না। কপালে জোটে খাব। না হয় না খাব। তোদের কাছে হাত পাততে যাব না। ব'লে সে তিনজনকে ধাক্কা দিয়েই প্রায় বেরিয়ে এল। তারপর বলল, এই বেড়াটা কেউ ঢেকে দিস তো। নইলে আবার গরু, কুকুর এসে ঢুকবে। সেটাও প্রায় হুকুমের মত শোনাল। এবং হাতের কাচের চুড়ি ঝনঝনিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে সে চ'লে গেল প্লাটফরমের ওপর দিয়ে।

লোকের চাউনি তাকে তার অনাগত মাতৃত্বের অনুভূতিকে বাড়িয়ে দেয়। স্টেশনের বাইরে রিকশাওয়ালারা তার পিছনে লাগে। চীৎকার শোনা যায়, এই বেঙি, আয় বিনাপয়সায় চাপাব তোকে।

বেঙি কোন দিকে ফিরে তাকায় না। হেঁচড়ে হেঁচড়ে সিনেমা হলের সামনে চ'লে যায়। মেয়েদের কাউন্টারের কাছে গিয়ে, পয়সা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ একে তাকে খোশামোদ করতে হয়। কারণ কাউন্টারে ওর হাত যায় না।—অ বাবু, আমাকে একটা পাঁচ আনার টিকেট দেন না।

বাবুর কিছুই যায় আসে না। মেয়েদের একেবারে যায় আসে না। তারা বেঙির দিকে তাকিয়ে আরও বিতৃষ্ণা বোধ করে। পায়ে ধরলেও টিকেট কেটে দেয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকেট কাটা হয়-ই। এবং কোন পুরুষই সেটা কেটে দেয়।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে পারে না। তাই মেয়েদের সঙ্গে বসা হয় না ওর। গেটকীপার ওকে ফার্স্টক্লাসের মেঝেতে বসতে অনুমতি দেয়। বেঙি খুব মনোযোগ দিয়ে সিনেমা দেখে। দেখে, ও হাসে কাঁদে এবং রাগও করে। বেরিয়ে এসে কথাগুলি বলবার জন্য লোক খোঁজে। লোক মানে, ওর সঙ্গীদেরই

খুঁজে বেড়ায়। যে-সব সঙ্গীরা ওকে সব সময় ঘিরে থাকে। যারা ওকে ঘিরে পেখম খোলে, নাচে, রাগ করে, তোষামোদ করে, যারা খেতে দেবে না ব'লেও শেষ পর্যন্ত খেতে দেয়।

কারণ স্টেশনের মৌচাকটা এখন ওকে ঘিরেই। যত মধু সঞ্চিত হচ্ছে ওর জন্যেই। ওরই জঠরে এখন শতশত আগন্তুক সন্তানেরা। নানান দেহে অপেক্ষা ক'রে আছে। রাজারা সব মহারানীর চক্রে নতমুখে অপেক্ষমাণ।

আর এই মহারানীত্ব রক্ষা করবার, ওর অবচেতনের, ওর এই প্রায় অর্ধেক দেহের মাতৃত্বের প্রার্থনা ও ধ্যানমগ্নতা রক্ষা করবার জন্য সারারাত ওকে প্রত্যাখ্যানের লাঠি নিয়ে বসে থাকতে হয়।

—এই, ছ্যাখ কুত্তা, গায়ে হাত দিবি তো খুন করব। যা, যা বলছি। ডাকব রেল পুলিসকে ?

কুকুরের মতই তখন ছায়া হয়ে স'রে যায় ওর পাশ থেকে। ও দেখে হাঁস-মুরগীর খোঁয়াড়ের আশেপাশে শেয়ালেরা দল বেঁধে ঘুরছে। ওকে সারারাত তাড়া দিতে হয়। ব'সে থাকতে হয় লাঠি নিয়ে। আচমকা এক-একটা ছায়াকে গায়ের ওপর এসে পড়তে দেখে, চীৎকার ক'রে উঠতে হয়। সেই চীৎকার শুনে প্রহরী আসে। এবং সে আসে কিন্তু পালায় না। অধিকার-বোধেই সে মা হবার লক্ষণগুলিকে পীড়ন করে, কিন্তু বেঙিকে মাতৃত্ব দিতে তার ঘৃণা হয়।

পীড়নের ব্যথায় বেঙি নীরবে অভিশাপ দেয়। প্রতিবাদ করতে সাহস করে না।

তবু একদিন সেই গর্জিত ধারা বর্ষায়। যেদিন বেঙিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল বাতিঘরের পিছনে। কিন্তু ও মরে নি, রক্তটা ওর মাতৃসংবর্ধনার। প্রায় মৃত্যুর মত একটা উল্লাস! ও মানুষ চিনতে পারে নি। তার চেহারা দেখতে পায় নি। শুধু একটা কঠিন থাবায় তুলে নিয়ে গিয়ে একজন ওকে নিষ্ঠুরের মত একটা আজন্ম-অনাস্বাদিত, তীব্র আনন্দদায়ক ব্যথা দিয়ে গেছে। আর সেই আনন্দের পুষ্টি ও ব্যথার শুষ্কতা, যুগপৎ ওর দেহে দ্রুত কাজ করতে লাগল। এইবার ও বাঘিনীর মত সতর্ক হল। এইবার ও মানুষের দিকে আরো তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। মানুষের মা হতে চলেছে ও। তাই ওকে পৃথিবীটার মত পাগল মনে হতে লাগল। ও খেঁকী হয়ে উঠল, কারণ নিজেকে ও আরো বেশী ভালবাসতে লাগল।

বেঙি সকলের কাছে হাত পেতে বলে এখন, বাবু পেটে আমার ছেলে, ছুটি পয়সা দেন বাবু।

তারপরে মানুষটা ক্রমেই অনুভূতিময় জগতের দিকে ধাবিত হল। এই অনুভূতির ডাকটা পিতার আহ্বানের মত। ধাওয়া করে আসাটা পরশুরামের কুঠারের মত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল, বাতিঘরের বারান্দায় উথালিপাথালি ক'রে মরছে বেঙি। মাঝে মাঝে চীৎকার করছে। মানুষের মা'টা তার গা থেকে মা হবার আগের সব জড়-সাজগুলি খুলে ফেলেছে। বেঙির মনে হল, তার ভেতরে কে যেন কাঁদছে। মাথা কুটছে। নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে।

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে আলো খুঁজল। আলো খুঁজতে খুঁজতে সে প্লাটফরমের ওপরে চলে এলো। আলো আর মানুষ দেখে তার যন্ত্রণা যেন একটু স্তিমিত হল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই মানুষটা আবার এই মরজগতে আসবার জন্যে বেঙির নাড়ি ছিঁড়তে লাগল। মরজগতে তখন বাতাস বইছে। আকাশে তারা। আর রাত্রির নিস্তব্ধতা নেমেছে। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে গয়া-প্যাসেঞ্জারটা এলো।

মিছে ঝামেলা থেকে আইন রক্ষার জন্য, গয়া-প্যাসেঞ্জারের একটি ফার্স্ট-ক্লাসের কামরা খোলা হল। ফ্যান খুলে, বাতি জ্বালিয়ে, তার মধ্যে তুলে দেওয়া হল বেঙিকে। দিয়ে, লক্ ক'রে দেওয়া হল ছু'দিক থেকে।

বেঙি চীৎকার ক'রে উঠল মাটির স্পর্শের জন্য, একটা কিছু ধরতে চাইল প্রাণপণে। তার মনে হল একটা অসহ্য যন্ত্রণা তাকে শূন্যে তুলে নিচ্ছে। কিন্তু বিরাট একটা ভার তাকে আঁকড়ে রয়েছে। তারপরেই সহসা সে মরণোন্মুখ সাপের মত কুঁকড়ে উঠল। কারণ একটি কুঠার তাকে যেন কোপাচ্ছে। তাকে বিদীর্ণ করছে। পরমুহূর্তেই ছুটি সুন্দর হাত তাকে জড়িয়ে ধরল। যেন বলল,—'লক্ষ্মী মা আমার বেঙি, একটু শান্ত হ। একটু ধৈর্য ধর। তুই মানুষের মা হচ্ছিস।'

বেঙি একটা চীৎকার শুনতে পেল কচি গলার। মানুষের প্রথম সাড়া। বেঙি জোর ক'রে চোখ মেলে তাকাল। দেখল, ছুটি লাল মাংসল ছোট ছোট পা, শূন্যে লাফিয়ে উঠছে।

চোখ থেকে সহসা রক্ত পড়ল বেঙির। বেঙি মারা গেল।

ভবিষ্যতে হয়তো গয়ার পথে পথে ঘোরা কোন ভিখিরী, একদিন ঘুরতে ঘুরতে গয়ার প্রেতলোকে যাবে। গিয়ে তার নিজের মা-বাবার কথা ভাববে। ভাববে আমারও মা-বাবা ছিল। আমার পিণ্ড পাবার জন্য হয়তো তারা আজো এখানে আছে। এই প্রেতলোকে। মা! তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ! বাবা! তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে।

সুবর্ণা

লেখক-পরিচিতি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: জ. ১৮৯৮, লাভপুর, বীরভূম। রবীন্দ্র-পরবর্তী কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বকে নানা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে সম্মানিত করেছেন; সম্প্রতি ভারত-সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দিয়েছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ব'লে একদা বাংলা দেশের গ্রাম, মফস্বল ও জন-জীবনের যে-প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন, তারই চিহ্নস্বরূপ নিরাসক্ত ও সহজ লাবণ্যের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর গল্পের মধ্যে ক্ষুধার্ত নীতিবোধ ও সংঘাতময় সজীবতা লক্ষ করা যায়। ছোটোগল্পের বই: রসকলি, তিন শূন্য, শিলাসন, বিস্ফোরণ, প্রেমের গল্প, শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বনির্বাচিত গল্প প্রভৃতি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়: জ ১৮৯৯, জৌনপুর। শিক্ষা: কলকাতা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়; বি এ, বি এল। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ বিচিত্র। সমকালীন জীবনের টুকরো ও তুচ্ছ ঘটনা কিংবা জটিল মানসকে নিয়ে তিনি নিগূঢ় তাৎপর্যের অবতারণা করেন। ছোটোগল্পের বই: ব্যুমেরাং, ব্যোমকেশের কাহিনী, ব্যোমকেশের ডায়েরি, জাতিস্মর, বিষকন্যা, কানু কহে রাই, হসন্তী, শ্রেষ্ঠ গল্প প্রভৃতি।

বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়): জ. ১৮৯৯, মনিহারি, পূর্ণিয়া। শিক্ষা: পাটনা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; এম. বি., বি. এস। বিষয়বস্তু, ভাবনা ও প্রকরণের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বনফুলের ক্ষুরধার ঔৎসুক্য। তাঁর প্রায় কোনো রচনাই পূর্ববর্তী রচনার অনুসরণ কিংবা প্রতিভাস নয়। ছোটোগল্পকে যে যুগপৎ ছোটো ও গল্প হ'তে হয়, সে-বিষয়ে তিনি বোধ করি অতিশয় সচেতন। ছোটোগল্পের বই: শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বনির্বাচিত গল্প, দূরবীন প্রভৃতি।

মনোজ বসু: জ. ১৯০১, ডোঙ্গাঘাটা, যশোহর। শিক্ষা: কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়; বি.এ। মূলত রোমান্টিক, এবং সেই কারণেই দেশপ্রেম, জাতীয় আন্দোলন, দেশীয় ঐতিহ্য, লৌকিক চেতনা ও কিংবদন্তী তাঁর রচনার মূল উপজীব্য। তাঁর সাবলীল ভাষার লাবণ্য ও শিল্পসৌকর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছোটোগল্পের বই: বনমর্মর, নরবাঁধ, শ্রেষ্ঠ গল্প, খদ্যোত, কিংশুক, মায়াকন্যা প্রভৃতি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: জ. ১৯০৩, নোয়াখালি। শিক্ষা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; এম. এ., বি. এল। আগে ছিলেন রোমান্টিক, ভাষা ছিলো সংকেতময় ও উপমানির্ভর, এবং সেই সঙ্গে মফস্বল ও নাগরিক জীবনের

বহুবিধ সূক্ষ্ম অনুভূতি। পরবর্তীকালে আরো বাস্তব হ'লো তাঁর রচনা, নিচু শ্রেণীর কর্মচারী, ব্রাত্য চাষাভুষোরা ভিড় ক'রে এলো দলে-দলে, মাঠ, বস্তি, ঘিঞ্জিবাড়ি, মাধুর্য ও কদর্যতা—যা-কিছু নিয়ে বাংলা দেশ। ছোটোগল্পের বই : কাঠখড় কেরোসিন, হাড়ি মুচি ডোম, এক অঙ্গে এত রূপ, স্বাদু-স্বাদু পদে-পদে, একরাত্রি, শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বনির্বাচিত গল্প, প্রেমের গল্প প্রভৃতি।

প্রে মে ন্দ্র মি ত্র : জ ১৯০৪, বারাণসী। বহু প্রতিষ্ঠান আগেই প্রেমেন্দ্র মিত্রকে যে-সব স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ভারত-সরকার প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী'। তাঁর ছোটোগল্পের ভিতর এমন একটি গভীর ও জটিল রহস্যবোধ জড়িয়ে আছে, যার প্রধান নির্ভর নাগরিক জীবনের সূক্ষ্ম কতগুলি অনুভূতি ও চেতনা ; দ্বিধা, সংশয়, পাপবোধ, শূন্যতা, ভীরুতা, মৃত্যুচেতনা—এই-সব একযোগে তাঁর গল্পের ভিতর কুয়াশা-সংকেত ও গভীর ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে রাখে। প্রকরণকলা সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ছোটোগল্পের বই : বেনামি বন্দর, পুতুল ও প্রতিমা, ধূলিধূসর, সপ্তপদী, জলপায়রা, ক্বচিৎ কখনো, শ্রেষ্ঠ গল্প প্রভৃতি।

অ ন্ন দা শ ঙ্ক র রা য় : জ. ১৯০৪, ঢেঙ্কানল, উড়িষ্যা। শিক্ষা : পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও লণ্ডন ; বি এ, আই. সি এস। অত্যন্ত সপ্রতিভ ও পরিশীলিত রচনা। উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছড়া—এই-সবও তাঁর মনীষার স্বাক্ষর বহন করে। এবং কখনোই তা পুরোনো বুলির মাছি তাড়ায় না ব'লে তাঁর স্পর্শবোধ, সংবেদনা ও তারুণ্যে বিস্মিত না হ'য়ে উপায় থাকে না। ছোটোগল্পের বই : প্রকৃতির পরিহাস, মনপবন, কামিনীকাঞ্চন, রূপের দায় প্রভৃতি।

স তী না থ ভা দু ড়ী : জ. ১৯০৬, পূর্ণিয়া। শিক্ষা : পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ; এম. এ, বি. এল। রচনার পরিমাণ কোনোক্রমেই বিপুল নয়, কিন্তু কিছুতেই পরের মুখে ঝাল খায় না ব'লে সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনার সান্নিধ্যে এলে দেখা যায় পাঠকের পক্ষে পরম লাভজনক এক সতেজ ও সহজ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা ক'রে আছে। তাঁর ছোটোগল্প এমন সব দুঃখ দর্প দীনতা দুর্দশা ও দুরাশাকে উদ্ঘাটিত ক'রে দেয়, মমতা ও করুণার স্পর্শ-বিচ্যুত হ'লে তা হয়তো নিষ্ঠুর ও নির্দয় হ'য়ে উঠতো—কিন্তু, তা নয় ব'লে কোমল বিষণ্নতা ছড়ায়। ছোটোগল্পের বই : অপরিচিতা, গণনায়ক, পত্রলেখার বাবা, জলভ্রমি প্রভৃতি।

প্র বো ধ কু মা র সা ন্যা ল : জ. ১৯০৭, কলকাতা। বহু তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয় প্রবোধকুমারের রচনায় এমন লালিত্যপূর্ণভাবে পরিবেশিত হয় যে তাঁকে 'শেষ রোমান্টিক'দের অন্যতম রূপে অভিহিত করা যায়—উপরন্তু চাপা চাঞ্চল্য ও অধিজ্যতাবশত তাঁর কথকতা পাঠকদের সহজেই উৎকণ্ঠ

ও কৌতূহলী ক'রে তোলে। তাঁর কোনো-কোনো গল্পের চরিত্র যাযাবর-মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়েও এমনি এক বলিষ্ঠ জীবনভঙ্গির পরিচয় দেয়, যার ফলে কাহিনীর মেরুদণ্ড কোনো অবস্থাতেই নুয়ে পড়ে না। ছোটোগল্পের বই : নওরঙ্গী, স্বনির্বাচিত গল্প, গল্প-সংগ্রহ প্রভৃতি।

বুদ্ধদেব বসু. জ ১৯০৮, কুমিল্লা। শিক্ষা. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; এম এ। কবিত্বমণ্ডিত, লাবণ্যময়, সুকুমার, বিশ্লেষণধর্মী—এই-সব বিশেষণের অন্তরালে তাঁর গল্প এমন এক তীব্র জগৎকে ধ'রে রাখে যার পূর্ণ পরিচয় দেয়া হয়তো তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত। ভাষাকে দিয়ে তিনি এমন সব অসাধ্য সাধন করতে চান, যা প্রতিটি পংক্তিকে দূরগামী, সাংকেতিক, উদ্দীপ্ত ও আবেগময় না ক'রে পারে না। তাঁর কথাশিল্পের আরেকটি আকর্ষণ কলকাতা, যা তাঁর রচনায়—কেবলমাত্র আবহ বা পিছনের পর্দা হিসেবে নয়—কোনো জীবন্ত নগররূপে উপস্থিত। ছোটোগল্পের বই : রেখা-চিত্র, অভিনয় অভিনয় নয়, ফেরিওলা, চার দৃশ্য, একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু, হৃদয়ের জাগরণ, গল্পসংকলন, শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বনির্বাচিত গল্প প্রভৃতি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: ১৯০৮-১৯৫৬। বিবিক্ত, নিষ্ঠুর, নিরাসক্ত, বৈজ্ঞানিকপ্রতিম, দূরবর্তী, অথচ তীব্র ও প্রচণ্ডভাবে ইন্দ্রিয়ময়—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথকতার ঠিক সেই স্থানের অধিকারী, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতায় যেখানে জীবনানন্দ দাশ। প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে জগদীশ গুপ্ত ছাড়া আর-কোনো পূর্বজ গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাকর্মে ছায়া ফেলেন নি। ছোটোগল্পের বই : অতসী মামী, প্রাগৈতিহাসিক, ভেজাল, বৌ, ফেরিওলা, হলুদপোড়া, আজ কাল পরশুর গল্প, শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বনির্বাচিত গল্প প্রভৃতি।

আশাপূর্ণা দেবী : জ. ১৯০৯, কলকাতা। মানব-মনের সূক্ষ্ম সমস্ত সংঘাত আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় এমন তীব্র ও নিরাসক্তভাবে প্রকাশিত, যার ফলে তাঁর রচনা এক রুক্ষ ও পুরুষালি জগৎকে উন্মোচিত ক'রে দেয়—যাদের কোনো মহিলার লেখনীপ্রসূত ব'লে বিশ্বাস হ'তে চায় না। মনস্তত্ত্বের যে-প্রখর বোধের উপর তাঁর শক্তিমত্তা প্রতিষ্ঠিত, তা অনেকের পক্ষে ঈর্ষাযোগ্য। ছোটোগল্পের বই : সোনালি সন্ধ্যা, শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বনির্বাচিত গল্প প্রভৃতি।

সুবোধ ঘোষ : জ ১৯০৯, হাজারিবাগ। প্রথম আবির্ভাবের সময়ে সুবোধ ঘোষ আমাদের সামনে যে-জগৎকে উন্মোচিত করেন তা ছিলো হতাশ, নিশ্চেতন, দয়ামায়াবর্জিত ও অতিশয় শুষ্ক ; কিন্তু মহৎ শিল্পী ব'লেই তাঁর ভাবনার পরিমণ্ডল ক্রমশ ব্যাপ্ত হ'লো ; হিংস্রতা থেকে স'রে এলেন সদ্ধর্মে ; ক্ষমা বিনতি ও অহিংসায় আস্থা ও আশ্রয় পেলেন। ছোটোগল্পের বই : পরশুরামের কুঠার, শুক্লাভিসার, ফসিল, জতুগৃহ, থিরবিজুরি, ভারত-প্রেম কথা, কুসুমেষু, চিত্তচকোর, শ্রেষ্ঠ গল্প প্রভৃতি।

জ্যো তি রি ন্দ্র ন ন্দী : জ ১৯১২, কুমিল্লা। শিক্ষা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; বি. এ। কালো ও অযৌক্তিক গহ্বর— যার নাম মনুষ্যহৃদয়, যেখানে বিকার বিক্ষেপ ব্যাধি ও ক্ষয় কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে—তার প্রতি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি, খেদ ও প্রচণ্ড নীতিবোধ বাংলা কথাশিল্পের ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিকোণ উন্মোচিত করেছে। ছোটোগল্পের বই : শালিক কি চড়ুই, বন্ধুপত্নী, ট্যাক্সিওয়ালা, মহিষী, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর প্রভৃতি।

বি ম ল মি ত্র : জ. ১৯১২, কলকাতা। শিক্ষা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এম. এ। মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের প্রতি অফুরন্ত কৌতূহল ও মমতার বোধ বিমল মিত্রর ছোটোগল্পের প্রধান অবলম্বন; তাঁর গল্প বলার ভঙ্গির ভিতর আঙ্গিকের জটিলতাবর্জিত এমন একটি সারল্য লুকিয়ে থাকে, যার অন্তরঙ্গতা ও অপরিসীম আকর্ষণে যে-কোনো পাঠকের অভিভূত না হয়ে উপায় থাকে না। ছোটোগল্পের বই : রানীসাহেবা, পুতুলদিদি, কাহিনী-সপ্তক, এক রাজার ছয় রানী, শনি রাজা রাহু মন্ত্রী প্রভৃতি।

প্র তি ভা ব সু : জ ১৯১৫, হাসাড়া, ঢাকা। পুরুষের ধূমল পথের দিকে প্রতিভা বসুর কোনো আসক্তি নেই, এটাই তাঁর রচনার বড়ো বৈশিষ্ট্য; সেইজন্যই তাঁর ভাষা এমন গুঞ্জন করে ও লাবণ্য ছড়ায়; তাঁর সংলাপের ভিতর থাকে আটপৌরে ভঙ্গি—বহু তুচ্ছ ও সাধারণ প্রসঙ্গ ও মান-অভিমান, কিন্তু তার মধ্যেই, যেন প্রায় অগোচরে, প্রতিষ্ঠিত হয় পারিবারিক আবহাওয়া, কি দম্পতিদের মিলন-বিরহ, অথবা অভ্যুদয় ঘটে ভীরু, লাজুক ও কুণ্ঠিত প্রেমের। ছোটোগল্পের বই : বিচিত্র হৃদয়, সুমিত্রার অপমৃত্যু, মাধবীর জন্য, মেঘলা দুপুর, স্বনির্বাচিত গল্প, প্রেমের গল্প প্রভৃতি।

ন রে ন্দ্র না থ মি ত্র : জ. ১৯১৬, সদরদি, ফরিদপুর। শিক্ষা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; বি. এ। মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থতা-সার্থকতা আশা-হতাশা আনন্দ-বিষাদ এবং প্রতিদিনের পথের ধুলোয় যে-সব ক্ষুদ্র তুচ্ছ ও অতি-সাধারণ উপকরণ ছড়িয়ে থাকে, সূক্ষ্ম শিল্পিতার দ্বারা নরেন্দ্র মিত্র তাকে অভিনব ও অসাধারণ ক'রে উপস্থাপিত করেন। সাধারণ লোকের মনস্তত্ত্বই তাঁর বিষয়, এবং যাকে বাস্তবতা বলে তাকেও তিনি কখনো অবহেলা করেন নি। ছোটোগল্পের বই : কাঠগোলাপ, ধূপকাঠি, বসন্তপঞ্চম, শ্রেষ্ঠ গল্প প্রভৃতি।

না রা য় ণ গ ঙ্গো পা ধ্যা য় : জ ১৯১৮, বালিয়াডিঙি, দিনাজপুর। শিক্ষা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; এম. এ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তারাশঙ্করের মতো যেমন ব্রাত্য অন্ত্যজ ও গ্রামবাসীদের নিয়ে লিখেছেন, তেমনি সূক্ষ্ম, শীলিত ও নাগরিক ব্যর্থতা ও বেদনার দিকেও তাঁর সমান অনুরাগ। আর এই-সব আগ্রহ ও উৎসাহ তাঁর মনের কান্তিময় তারুণ্যেরই ইঙ্গিত দেয়। ছোটো-গল্পের বই : ট্রফি, ভাঙা বন্দর, উর্বশী, শুভক্ষণ, শ্রেষ্ঠ গল্প প্রভৃতি।

লেখক-পরিচিতি

সন্তোষকুমার ঘোষ: জ. ১৯২০, রাজবাড়ী, ফরিদপুর। শিক্ষা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; বি. এ.। প্রকরণগত নানা পরীক্ষা যেমন সন্তোষকুমার ঘোষের রচনাকে পুনরাবৃত্তি থেকে সাত হাত তফাতে রাখে, তেমনি চিন্তার দিক থেকেও তিনি কদাচ ঝকঝকে পেয়ালায় ঠাণ্ডা চা ঢালেন না— বরং সংকেত, প্রতীক ও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বহুমুখী ও সংগোপন ইঙ্গিতের ব্যবহারে তিনি তাঁর প্রতিটি গল্পকেই এমনভাবে উপস্থাপিত করেন, যা তাদের শানিত, সতেজ ও দুঃসাহসী ক'রে তোলে। ছোটোগল্পের বই: চীনে মাটি, পারাবত, চিররূপা, কড়ির ঝাঁপি, শ্রেষ্ঠ গল্প প্রভৃতি।

বিমল কর: জ. ১৯২১, টাকি, চব্বিশ পরগনা। শিক্ষা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; বি. এ। ছোটোগল্প যে আজকের দিনে তথাকথিত আখ্যান বা কাহিনীর মুখাপেক্ষী নয়, বরং তা যে শুধুমাত্র কোনো সংকট বা বহু বিদৃশ ও অসংলগ্ন চিন্তাকে কোনো-এক শূন্যতার বোধে ভারাক্রান্ত ক'রে জটিল স্রোতের মতো বইয়ে দেবার উপায়—বিমল করের রচনাবলি এই ধারণারই পোষণ ও সমর্থন করতে চায়। ছোটোগল্পের বই: কাচঘর, পিঙ্গলার প্রেম, সুধাময় ইত্যাদি।

রমাপদ চৌধুরী: জ. ১৯২২, খড়্গপুর। শিক্ষা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; এম এ। বুদ্ধি, দীপ্তি, স্পর্ধা, দাহ আর সুবিন্যস্ত কাহিনী—এই-সব বৈশিষ্ট্য ছিলো রমাপদ চৌধুরীর রচনায়, যখন 'পূর্বাশা'য় তাঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিলো। পরবর্তীকালে বিষয়ের ও প্রকরণের বৈচিত্র্যের সঙ্গে অন্য কতকগুলি আকর্ষণ যুক্ত হওয়ায় তাঁর রচনা পাঠকের কৌতূহলকে আরো সজাগ ও প্রত্যাশান্বিত ক'রে রাখে। ছোটোগল্পের বই: দরবারী, আপন প্রিয়, পিয়াপসন্দ, কখনো আসেনি, মুক্তবন্ধ, চন্দনকুঙ্কুম প্রভৃতি।

সমরেশ বসু: জ ১৯২৩, রাজনগর। দুঃসাহস একদিক থেকে সমরেশ বসুরও অবলম্বন—সম্ভবত তারুণ্যের তা-ই অভিজ্ঞান। এমন-সব প্রসঙ্গ ও উপকরণ নিয়ে তিনি তাঁর ঘটনাবহুল শিহরনমণ্ডিত গল্প রচনা করেন, যা কখনো-কখনো নির্মম বাস্তবতার অমোঘ উদাহরণ ব'লে মনে হয়। আবর্ত, হিংস্রতা, আতঙ্ক—এ-সব উপাদান তাঁর গল্পে এক অশিথিল, সংঘাতময় শিল্পব্যঞ্জনায় সমুপস্থিত, বিষয়বৈচিত্র্য বা পটভূমির বিস্তারেও তারা সহজে তাদের স্বভাব পাল্টায় না। ছোটোগল্পের বই: অকাল, পসারিনী, ষষ্ঠ ঋতু, তৃষ্ণা, সুবর্ণা, জোয়ার ভাটা প্রভৃতি।